ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয়

দ্বিতীয় খণ্ড

এল. এস. এস. কুমার, লেঃ কঃ এ. সি. আগরওয়ালা ডাঃ এইচ. আর. আরাকেরি, এম. জি. কামাথ, বি. চক্রবর্তী, ডাঃ আর্ল. এন. মুর সহযোগী—ডাঃ রয়. এল. ডোনাহু

ভারতের
কৃষি-ব্যবস্থার
পরিচয়

ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয়

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয়

দ্বিতীয় খণ্ড

এল. এস. এস. কুমার
ডীন, সরকারী কৃষি কলেজ, কেরালা

লেঃ ক. এ. সি. আগরওয়ালা
অধ্যক্ষ (অবসরপ্রাপ্ত), পশু চিকিৎসা কলেজ, রাজস্থান

ডঃ এইচ. আর. আরাকেরি
কৃষি যুগ্ম-অধিকর্তা, মহীশূর সরকার

এম. জি. কামাথ
উৎপাদন বিশারদ, খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়, নূতন দিল্লী

বনবিহারী চক্রবর্তী
জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

ডঃ আর্ল. এন. মূর
হাঁস-মুরগী পালন বিষয়ক উপদেষ্টা, কানসাস রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়
ইউ. এস. এ. আই. ডি.'র ভারতস্থ সহযোগী

ডঃ রয়. এল. ডোনাহু
মৃত্তিকা ও সার বিষয়ক পরামর্শদাতা, ফোর্ড ফাউণ্ডেশন, নূতন দিল্লী
প্রাক্তন মৃত্তিকা উপদেষ্টা, কানসাস রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়—ইউ. এস. এ.
আই. ডি.র' ভারতস্থ সহযোগী

প্রকাশক :

অরুণকুমার পুরকায়স্থ
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

মূল্য ঃ তিন টাকা

মুদ্রক ঃ

সমীর কুমার বসু
হরিহর প্রেস
৯৩।২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

Published by :
SRIBHUMI PUBLISHING CO.
79, Mahatma Gandhi Road, Calcutta.

This book is translated and adapted from the English book AGRICULTURE IN INDIA, *written by L. S. S. Kumar, Lt.-Col. A. C. Aggarwala, Dr. H. R. Arakeri, M. G. Kamath and Dr. Earl N. Moore in collaboration with Dr. Roy L. Donahue and published by Asia Publishing House, Bombay, suiting the syllabus of West Bengal Secondary Education Board.*

মুখবন্ধ

ভারতে যেখানে কৃষিই কোটি কোটি জনগণের জীবিকার প্রধান অবলম্বন, সেখানে কৃষির প্রচণ্ড সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা খুবই সুখের বিষয়। বিভিন্ন বিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক লিখিত এই পুস্তকের খুবই প্রয়োজন ছিল।

বহুমুখী বিদ্যালয়গুলিতে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ রচনা করা হইয়াছে। উদ্ভিদের গঠন ও তাহার কার্য এবং সাধারণভাবে কৃষি রসায়নতত্ত্ব ছাড়া ভারতের বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের মৃত্তিকা ও ফসল সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কেও এই গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। গো-মহিষাদি, মেষ ও ছাগল, হাঁস-মুরগী, মাছ, মক্ষিকা-পালন, বন ও বন্য প্রাণী সম্পর্কেও এই পুস্তকে আলোচনা করা হইয়াছে।

ভারতে জমির উপর যথেষ্ট চাপ থাকা সত্ত্বেও জমির প্রধান চাহিদাগুলি মিটাইয়া কৃষির আশানুরূপ উন্নতি করা যায়। চাহিদাগুলি হইল: (১) পর্যাপ্ত সেচজল সরবরাহ, (২) বন্যা নিয়ন্ত্রণ, (৩) জমিতে যথাযথ সার প্রয়োগ, (৪) জোত একত্রীকরণ।

দেশে পর পর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ রূপায়ণের ফলে ভারতের কৃষি সম্পর্কে প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের প্রয়োজন আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতি বৎসর ভারতের কৃষকগণ জমি হইতে ৮০ লক্ষ টন বৃক্ষখাদ্য অপসারণ করে, কিন্তু মাত্র ২০ লক্ষ টন জমিকে ফিরাইয়া দেয়। জমির উর্বরতা বজায় রাখিতে হইলে ৬০ লক্ষ টনের এই ফাঁক পূরণ করিতে হইবে।

পরিমিত সার প্রয়োগ ও সবুজ সারের চাষ করিয়া ভারতের যে কোন প্রকার জমির উন্নতি সাধন করা যায়। খাদ্য ও অর্থকরী ফসল উৎপাদনে সারের ভূমিকা সম্পর্কে ভারতের প্রায় সকল কৃষকই অবহিত। সারের চাহিদা অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়ায় স্থির করা হইয়াছে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে

৩,৬০,০০০ টনের স্থলে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ১০,০০,০০০ টন নাইট্রোজেন (N) ৬৭,০০০ টনের স্থলে ৪,০০,০০০ টন ফসফেট P_2O_5 ও ২,০০,০০০ টন পটাশ (K_2O) ব্যবহার করা হইবে।

পৃথিবীর যে কোন বৃহৎ দেশ অপেক্ষা জল বেশি থাকা সত্ত্বেও ভারতে জলের ঘাটতি একটি সমস্যা বিশেষ। অপ্রচুর সেচ ব্যবস্থাই এজন্য দায়ী। নদী দিয়া যে পরিমাণ জল প্রবাহিত হয় তাহার এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র সেচের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং সাম্প্রতিক কালে এই জল ক্ষেতে ব্যবহার করার কাজে যথেষ্ট অগ্রগতি হইলেও ইহার আরও উন্নতির অবকাশ আছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে ভারতের নদীসমূহের মধ্য দিয়া যে পরিমাণ জল প্রতি বৎসর প্রবাহিত হয় তাহা ভারতের উপর সমভাবে বিস্তৃত করিয়া দিলে সমগ্র দেশ ২০ ইঞ্চি জলের নিচে ডুবিয়া থাকিবে।

ব্যাপকভাবে লিখিত এই অতি-প্রয়োজনীয় পুস্তকটির মুখবন্ধ লিখিয়া দিতে আমি অতিশয় আনন্দ বোধ করিতেছি। আমি আশা করি শিক্ষক ও ছাত্রগণ ছাড়া সাধারণ কৃষকগণও এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া সবিশেষ উপকৃত হইবেন।

পি. এস. দেশমুখ
ভারত সরকারের প্রাক্তন কৃষি মন্ত্রী
ও
ভারত কৃষক সমাজের সভাপতি

নূতন দিল্লী
১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২।

কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন

এই গ্রন্থ প্রণয়নে যাঁহারা সহায়তা করিয়াছেন, ভারতীয় ও মার্কিন গ্রন্থকারগণ তাঁহাদের সহযোগিতা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই পুস্তক প্রণয়নে নানা ভাবে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন :

শ্রীভাস দেব, প্রাক্তন আণ্ডার সেক্রেটারী, ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ, নূতন দিল্লী ; শ্রী জে. পি. এল. গুঁই, আই. সি. এস., কৃষি সচিব, অন্ধ্রপ্রদেশ ; ডঃ জর্জ মণ্টগোমারী, দলপতি, কানসাস রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়-ইউ. এস. এ. আই. ডি.-ভারত দল, নূতন দিল্লী ; শ্রী জে. রঘোথম রেড্ডি, কৃষক, বিধান পরিষদের সভ্য, অন্ধ্রপ্রদেশ কৃষক সমাজের সহ-সভাপতি, হায়দারাবাদ ; ডঃ ই. আর. টাউয়ার্স, প্রাক্তন দল নায়ক, মাধ্যমিক শিক্ষা সূচী, ওহায়ো রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়—ইউ. এস. এ. আই. ডি.—ভারত দল, নূতন দিল্লী ; মেরিল. কে. লুথার, উক্ত দলের কৃষি শিক্ষা বিশারদ ; শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষি উপ-অধিকর্তা, পূর্ব অঞ্চল, কল্যাণী, পশ্চিমবঙ্গ ; এবং কেরালা রাজ্যের ত্রিবান্দ্রাম কৃষি কলেজের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক ডঃ টি. সি. জোসেপ ; উদ্ভিদ শারীরবৃত্তি বিশারদ শ্রী এম. রমানাথ মেনন ও কীটতত্ত্বের লেকচারার শ্রীরেঙ্গা আয়ার।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-অধিকার ও মহীশূর সরকার তাঁহাদের দুইজন কর্মচারীকে এই পুস্তক প্রণয়নে অংশ গ্রহণে অনুমতি দিয়াছেন ; এজন্য গ্রন্থকারগণ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

ভারতে কারিগরি সহযোগিতা মিশনের নিম্নলিখিত উপদেষ্টাগণ মূল গ্রন্থের অংশবিশেষ সযত্নে পরীক্ষা করিয়া গ্রন্থকারগণের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন : ডঃ ই. হিক্সন, প্রাক্তন কৃষিশিক্ষা উপদেষ্টা ; আরমিন আর. গ্রুনওয়াল্ড,

প্রাক্তন মৃত্তিকা উপদেষ্টা ; ডঃ. এল. এম. হাফ্‌ফ্‌, চাষ-বিষয়ক উপদেষ্টা ; ডব্লিউ. এস. স্পীয়ার, প্রাক্তন মৃত্তিকা সংরক্ষণ উপদেষ্টা ; রবার্ট এইচ. ইঙ্গল্‌, প্রাক্তন সার উপদেষ্টা ; ডঃ. গুলবার্ট. আর. মুহর, মৃত্তিকা পরীক্ষা উপদেষ্টা ; এম. এইচ. টেইলর, মৃত্তিকা সংরক্ষণ উপদেষ্টা ও জর্জ নেইরিম, কৃষি সম্প্রসারণ উপদেষ্টা। ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণও মূল গ্রন্থের কোন কোন অধ্যায় দেখিয়া দিয়া গ্রন্থকারগণকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন : সৈয়দ এস. হাসমী, অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষি উপ-সচিব ; ডাঃ কে. সি. নাইক, ভারতীয় কৃষি শিক্ষা পরিষদের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও শ্রী রায় পৃথ্বিরাজ, অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন কৃষি অধিকর্তা।

গ্রন্থকারবৃন্দ

সূচীপত্র

চিত্র তালিকা

চিত্র	পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

রাসায়নিক সার, জৈব সার ও সবুজ সার

Fertilizers, Manures, and Green Manures

ভারতে সকল লোকের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপন্ন না হওয়ার প্রধান কারণ এদেশে একর পিছু শস্যের ফলন ও পশু পিছু পশুজাত দ্রব্যের উৎপাদন পৃথিবীর মধ্যে নিম্নতম। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগের অভাব, আর্দ্র আবহাওয়া, অপ্রচুর সেচজল, অনাবৃষ্টি, নিকৃষ্ট বীজ, রোগ, কীটশত্রু, আগাছা, অনুর্বর মাটি ইত্যাদি বহু কারণ নিম্ন ফলনের জন্য দায়ী। অনুর্বর জমি এবং কি করিয়া ইহাকে উর্বর করা যায় সে সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হইতেছে।

রাসায়নিক সার, জৈব সার ও সবুজ সারের যথাযথ প্রয়োগে ভারতের যে কোন জমিকে উর্বর করিয়া তোলা যায়। কোন মাটিতে কেবল নাইট্রোজেন ঘটিত সারের প্রয়োজন, কোন মাটিতে ফসফোরস ঘটিত সার প্রয়োগ আবশ্যক ; কিন্তু নাইট্রোজেন ও ফসফোরস ঘটিত সার, যেমন অ্যামোনিয়ম সালফেট ও সুপার ফসফেটের যুক্ত প্রয়োগে প্রায় সকল মাটিতেই অধিকাংশ ফসল সাড়া দেয়। পটাশঘটিত সার প্রয়োগেও কোন কোন মাটিতে সাড়া পাওয়া যায় (চিত্র নং ১ ও ২)।

পশুজাত সার মাটিতে জৈব পদার্থ সরবরাহ করে এবং জৈব পদার্থ মাটির গঠন উন্নত করে এবং উদ্ভিদ বৃদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য বহু উপাদান সরবরাহ করে। মাটির উন্নত গঠন বজায় রাখার জন্য অনেক সময় সবুজ সারের চাষ করা হয়। শিম্বিগোত্রীয় উদ্ভিদ ব্যতীত অন্যান্য সবুজ সার নূতন কোন অপরিহার্য উপাদান সরবরাহ করে না, তবে মৃত্তিকাস্থ উপাদানগুলি আরও

গ্রহণযোগ্য করিয়া তোলে। শিম্বিগোত্রীয় সবুজ সার অবশ্য মাটিতে নাইট্রোজেন যোগ করে।
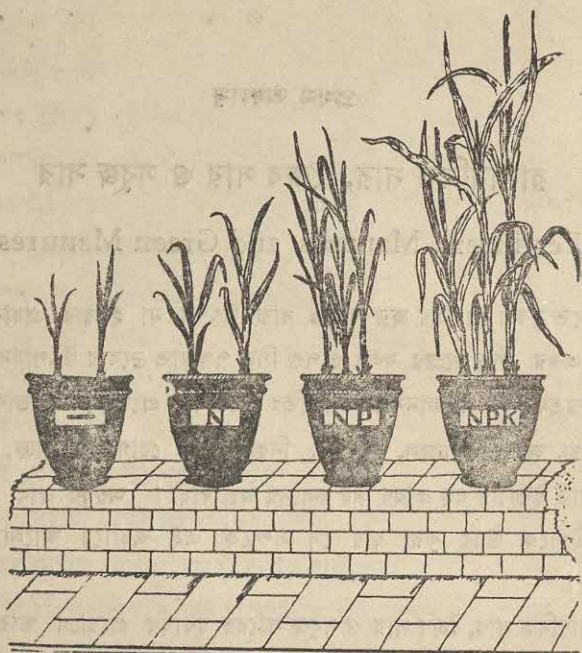
চিত্র নং ১। সার প্রয়োগে জোয়ারের বৃদ্ধি।—সার বিহীন। N : নাইট্রোজেনঘটিত সার। NP : নাইট্রোজেন+ফসফোরাস। NPK : নাইট্রোজেন+ফসফোরাস+পটাশ ঘটিত সার [SHUMAN হইতে পুনরঙ্কিত]।

উদ্ভিদের অপরিহার্য মৌলসমূহ
(Essential Elements for Plants)

ষোলটি মৌলের উপস্থিতি ব্যতিরেকে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ঘটিতে পারে না। এ সকল মৌলের নাম তাহাদের উৎস সহ নিম্নে তালিকায় প্রদত্ত হইল।

উদ্ভিদ বৃদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য পোষক মৌলসমূহ ও তাহাদের উৎস

বায়ু ও জল হইতে	মাটি, রাসায়নিক সার ও জৈব সার হইতে		
	প্রধান পোষক মৌল সমূহ	গৌণ পোষক মৌল সমূহ	কণ-পোষক মৌল সমূহ (micro-nutrients)
কার্বন	নাইট্রোজেন*	ক্যালসিয়ম	লৌহ (iron)
হাইড্রোজেন	ফসফোরস	ম্যাগনেশিয়ম	জিংক
অক্সিজেন	পটাশিয়ম	সালফার	বোরন
			কপার
			ম্যাঙ্গানিজ
			মলিব্‌ডেনম
			ক্লোরিন

দেখা যাইতেছে যে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বায়ু ও জল হইতে উদ্ভিদ গ্রহণ করে এবং অবশিষ্ট তেরটি অপরিহার্য পোষক মৌল মাটি, রাসায়নিক সার ও জৈব সার হইতে উদ্ভিদ সংগ্রহ করে। মুখ্য পোষক মৌল সমূহ হইল নাইট্রোজেন, ফসফোরস ও পটাশিয়ম। এ তিনটি মৌল উদ্ভিদ বহুল পরিমাণে ব্যবহার করে; এজন্যই সকল সুষম সারের মাধ্যমে এ তিনটি মৌল সরবরাহ করা হয়। গৌণ পোষক মৌলসমূহ হইল ক্যালসিয়ম, ম্যাগনেশিয়ম ও সালফার; এ তিনটিও উদ্ভিদ বহুল পরিমাণে কিন্তু মুখ্য মৌলসমূহ হইতে কম পরিমাণে ব্যবহার করে। অন্যান্য অপরিহার্য পোষক মৌলসমূহ অতি সামান্য পরিমাণে আবশ্যক হয় বলিয়া ইহাদিগকে কণ-পোষক (micro-nutrients) মৌল বলা হয়। কণ-পোষক মৌল সমূহ হইল আইরণ, জিংক, বোরণ, কপার, ম্যাঙ্গানিজ, মলিব্‌ডেনম ও ক্লোরিন।

বৃদ্ধির জন্য ষোলটি অপরিহার্য মৌলের সবগুলিই প্রতিদিন উদ্ভিদের প্রয়োজন হয়। উদ্ভিদ কোন কোন মৌল বহুল পরিমাণে এবং কোন কোন মৌল সামান্য পরিমাণে ব্যবহার করে। যেমন উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন শোষণ করে, কিন্তু কপার অতি সামান্য পরিমাণে শোষণ করে। বস্তুত এই প্রক্রিয়া আরও

* শিম্বিগোত্রীয় উদ্ভিদ কিছু পরিমাণে নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডল হইতে সংগ্রহ করিতে পারে; অন্যান্য উদ্ভিদ কেবল মাটি হইতেই নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে।

জটিল; কারণ যে কোন উদ্ভিদ, যেমন তুলা, তাহার বৃদ্ধির বিভিন্ন অধ্যায়ে অপরিহার্য মৌলসমূহ বিভিন্ন পরিমাণে গ্রহণ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় তুলা চারা অবস্থায় সামান্য পরিমাণে যোলটি মৌলই শোষণ করে; দ্রুত বর্ধনশীল অবস্থায় বহুল পরিমাণে সকল মৌলই এবং বিশেষ করিয়া অধিক নাইট্রোজেন শোষণ করে; সর্বশেষে ফল ধারণ কালে উদ্ভিদের অধিক ফসফোরসের আবশ্যক হয় কারণ বীজে প্রচুর ফসফোরস থাকে।

অধিকাংশ মাটিতেই অপরিহার্য মণিক পদার্থগুলির ভাণ্ডার এতই শূন্য যে ফসলের ফলন বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক ও জৈব সার ও কম্পোস্টের ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন।

যোলটি অপরিহার্য মৌলের প্রত্যেকটি মাটিতে বিভিন্ন পরিমাণে উপস্থিত থাকে। কোন এক সময়ে যে কোন একটি মৌলের আপেক্ষিক সরবরাহ স্বল্পতম হইয়া পড়িলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি সীমিত হইয়া যায়। যেমন এক সপ্তাহে যদি জোয়ারের পাঁচ একক নাইট্রোজেনের প্রয়োজন হয় এবং মাত্র তিন একক পাওয়া যায়, তবে নাইট্রোজেনের এই স্বল্পতা হেতু শস্যের ফলন সীমিত হইয়া পড়ে (চিত্র নং ২)। ফলন বাড়ানোর যে সমস্যা, তাহার সমাধান হইল যে মৌলের স্বল্পতা হেতু ফলন বাড়িতেছে না তাহা নির্ণয় করিয়া তাহাকে সাররূপে জমিতে
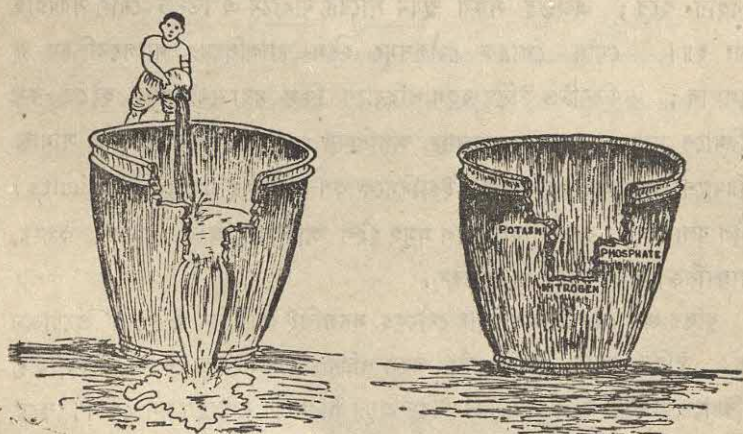
চিত্র নং ২। বামে পাত্রের নিম্নতম বিন্দু পাত্রের ধারণক্ষমতা সীমিত করিতেছে। অনুরূপভাবে (ডাইনে) যে কোন একটি বৃক্ষ খাদ্য মৌলের স্বল্পতম সরবরাহ হেতু শস্যের ফলন সীমিত হইয়া পড়ে।

প্রয়োগ। সারের চাহিদা আরও সঠিকভবে নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে মৃত্তিকা নমুনা পরীক্ষার জন্য নিকটবর্তী মৃত্তিকা পরীক্ষাগারে পাঠানো উচিত। *

নাইট্রোজেন-ঘটিত বিভিন্ন সার
(Kinds of Nitrogen Fertilizer)

ভারতে অতি পরিচিত নাইট্রোজেন-ঘটিত সারগুলি হইল অ্যামোনিয়ম সালফেট, ক্যালসিয়ম অ্যামোনিয়ম নাইট্রেট, অ্যামোনিয়ম সালফেট নাইট্রেট, ইউরিয়া প্রভৃতি রাসায়নিক সার এবং খইল, কসাইখানার উপজাত দ্রব্য, মাছের গুঁড়া, পাখির সার, নর্দমার আর্বজনা ইত্যাদি।

ইহাদের মধ্যে অ্যামোনিয়ম সালফেট সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং ইহা ভারতেই তৈয়ার হয়। ইহাতে শতকরা ২০·৬ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে।

ক্যালসিয়ম অ্যামোনিয়ম নাইট্রেটে শতকরা ২০·৬ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। প্রথমে অ্যামোনিয়ম নাইট্রেট তৈয়ার করিয়া তাহাকে প্রশমনের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ না অম্ল-না ক্ষারীর করার জন্য পর্যাপ্ত ক্যালসিয়ম কার্বনেট (চুনাপাথর) যোগ করিয়া ক্যালসিয়ম অ্যামোনিয়ম নাইট্রেট প্রস্তুত করা হয়। ভারতের নাঙ্গাল ও রাউড়কেল্লাতে এই সারের কারখানা আছে।

অ্যামোনিয়ম সালফেট নাইট্রেটে শতকরা ২৬ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। বিহার রাজ্যের সিন্ধ্রিতে এই সার তৈয়ারি আরম্ভ হইয়াছে।

কঠিন নাইট্রোজেন-ঘটিত সারের মধ্যে ইউরিয়াতেই নাইট্রোজেন সর্বাধিক পরিমাণে থাকে—শতকরা ৪৬ ভাগ। মাটিতে প্রয়োগ ছাড়া ইউরিয়া গাছের পাতাতেও ছিটানো যায় এবং পাতার ভিতর দিয়া ইহা শোষিত হয়। অন্যান্য নাইট্রোজেন-ঘটিত সার এভাবে প্রয়োগ করা যায় না কারণ তাহাতে পাতা পুড়িয়া যায়। ইউরিয়া এখন ভারতেই প্রস্তুত হইতেছে।

ভারতে অন্যান্য যে সকল নাইট্রোজেন-ঘটিত রাসায়নিক সার মাঝে মধ্যে পাওয়া যায়, সেগুলি হইল অ্যামোনিয়ম ক্লোরাইড—শতকরা ২৪ ভাগ নাইট্রোজেন, সোডিয়ম নাইট্রেট শতকরা ১৬ ভাগ নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়ম

* মৃত্তিকা পরীক্ষা সম্পর্কে পরীক্ষাগারের ঠিকানা সহ আরও তথ্য অষ্টম অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে।

নাইট্রেট—শতকরা ১৫ ভাগ নাইট্রোজেন ; পটাশিয়ম নাইট্রেট—শতকরা ১০ ভাগ নাইট্রোজেন ; ক্যালসিয়ম সায়ানামাইড (Cyanamide)—শতকরা ২০ ভাগ নাইট্রোজেন ; অনার্দ্র (anhydrous) অ্যামোনিয়া শতকরা ৮২ ভাগ নাইট্রোজেন ; ও অ্যামোনিয়ম ফসফেট শতকরা ২১ ভাগ পর্যন্ত নাইট্রোজেন।

ভারতে সার হিসাবে খইল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। প্রধান যে সকল খইল ব্যবহৃত হয় সেগুলি হইল চীনাবাদামের খইল—শতকরা প্রায় ৭.৩ ভাগ নাইট্রোজেন ; রেড়ির খইল শতকরা ৪.৩ নাইট্রোজেন ও নিমের খইল শতকরা ৫.২ ভাগ নাইট্রোজেন। এ সকল ছাড়া তুলাবীজ, সূর্যমুখী, নারিকেল, তিসি, তিল, সরিষা প্রভৃতির খইলও ব্যবহৃত হয়।

কসাইখানার আবর্জনার মধ্যে প্রধানত শুষ্ক রক্ত, মাংসের ছাঁট ও ছোট ছোট হাড় থাকে। এই সকল আবর্জনা হইতে প্রস্তুত সারে শতকরা ৫ হইতে ১০ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে।

মাছের গুঁড়ায় শতকরা ৭ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে এবং মাছ হইতে তৈল নিষ্কাশনের পর যাহা পড়িয়া থাকে তাহা হইতে বা মানুষের চাহিদার অতিরিক্ত আস্ত মাছ হইতে মাছের গুঁড়া তৈয়ার হয়।

পাখির সার বাদুড় বা অন্য পাখির বিষ্ঠা বিশেষ (bat guano or bird guano) এবং ইহাতে শতকরা ১৬ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। ভারতে কোন কোন গুহাতে বাদুড় বাস করে ; ঐ সকল স্থান হইতে ঐ সার সংগৃহীত হয়।

ভারতের কোন কোন স্থানে নর্দমার ময়লা সাররূপে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে নর্দমার ময়লা উন্মুক্ত চৌবাচ্চায় শোধন করিয়া সেচ জলের সহিত জমিতে প্রয়োগ করা হয়। অন্যান্য স্থানে মানুষের মল (night soil) কম্পোস্ট করিয়া জমিতে প্রয়োগ করা হয়।

নাইট্রোজেন-ঘটিত সার প্রয়োগ
(Applying Nitrogen Fertilizers)

অ্যামোনিয়ম সালফেট, ক্যালসিয়ম অ্যামোনিয়ম নাইট্রেট, অ্যামোনিয়ম সালফেট নাইট্রেট ও ইউরিয়া প্রভৃতি রাসায়নিক সার সম্পূর্ণরূপে জলে দ্রবনীয়। অর্থাৎ এ সকল রাসায়নিক সার আর্দ্র মাটিতে প্রয়োগ করিলে

ইহারা মৃত্তিকার জলে দ্রবীভূত হয় এবং মৃত্তিকার জলের সহিত প্রবাহিত হয়।* খইল ও অন্যান্য জৈব সার তাহাদের প্রযুক্ত স্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারে না।

নাইট্রোজেন-ঘটিত সার সাধারণত কর্ষিত জমির উপরে ছড়াইয়া দেওয়া হয় এবং পরে হ্যারো বা মই চালাইয়া মাটির উপরিস্তরে মিশাইয়া দেওয়া হয়। জৈব সারের বেলায় এ পদ্ধতি অতিশয় সন্তোষজনক কিন্তু রাসায়নিক সারের বেলায় ইহা সুপারিশ করা হয় না। আবার বীজ বপনের সময়ও এ সার ছড়ানো বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ তাহাতে চারা আহত হইতে পারে (চিত্র নং ৩)।

সারিতে ফসল রোপণের দুই একদিন পূর্বে খাতের (furrow) মধ্যে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিয়া তাহা মাটির সহিত মিশাইয়া দেওয়া যায়। বীজবপন যন্ত্রের সাহায্যে ইহা বীজের একপার্শ্বে বীজ অপেক্ষা সামান্য নিচু স্তরে প্রয়োগ করাও যায়। দেশী লাঙ্গলের সাহায্যে অনুমোদিত অবস্থানে রাসায়নিক সার অনায়াসে প্রয়োগ করা যায়। অগ্রভাগে ফানেলযুক্ত দুইটি বাঁশের নল লাঙ্গলের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। সার প্রয়োগের নলের মুখ দেশী লাঙ্গলের নিচে এবং বীজের নলের মুখ হইতে এক পার্শ্বে প্রায় দুই ইঞ্চি দূরে এবং সামান্য অগ্রভাগে স্থাপন করিতে হইবে। এইভাবে সার বীজ অপেক্ষা গভীরতর স্তরে এবং বীজের এক পার্শ্বে প্রযুক্ত হইবে।

নাইট্রোজেন-ঘটিত রাসায়নিক সার প্রয়োগের সময় দুইটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে:

(১) মাটিতে নাইট্রোজেন জমা থাকে না ;

(২) সার প্রয়োগের পর উদ্ভিদ দ্রুত তাহা শোষণ করিয়া ফেলে।

এই সমস্যা দুইটির প্রকৃষ্ট সমাধান হইল, যে কোন ফসলের বৃদ্ধি কালে

---

* অ্যামোনিয়ম ঘটিত যৌগের বেলায় এই সাধারণ নিয়ম খাটে না। অ্যামোনিয়ম সম্পূর্ণরূপে জলে দ্রবনীয় বটে, কিন্তু কর্দম ও হিউমাস কণিকার গাত্রে ইহা আবদ্ধ হইয়া যায় এবং তথা হইতে নড়িতে পারে না। উষ্ণ ও আর্দ্র মাটিতে ব্যাকটিরিয়া সত্বর অ্যামোনিয়মকে নাইট্রেটে পরিবর্তিত করে এবং নাইট্রেট মৃত্তিকার দ্রবণের সহিত প্রবাহিত হয়।
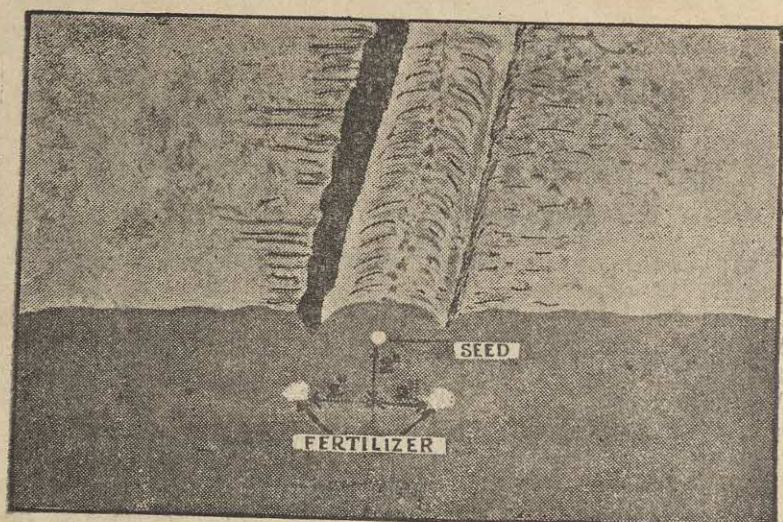
চিত্র নং ৩। সারের আদর্শ অবস্থান হইল বীজের এক বা উভয় পার্শ্বে দুই ইঞ্চি দূরে এবং বীজের দুই ইঞ্চি নিচে।

[NATIONAL PLANT FOOD ASSOCIATION: এর সৌজন্যে]।

তাহার আবশ্যকীয় রাসায়নিক সার দুই বা তিন ভাগে ভাগ করিয়া দুই বা তিন বারে প্রয়োগ করা।

ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও মিশরে ধানের উপর বিভিন্ন পরীক্ষায় জানা যায়, ধানের সর্বোচ্চ ফলন পাইতে হইলে মাটির উপরিতল হইতে দুই হইতে চার ইঞ্চি নিচে অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রয়োগ করিতে হইবে। ধানের খেতে অনুমোদিত গভীরতায় অ্যামোনিয়ম সালফেট বা অ্যামোনিয়ম-ঘটিত অন্য সার প্রয়োগ করিয়া অনেক সময় শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ ফলন বাড়িয়াছে।

অ্যামোনিয়ম ঘটিত নাইট্রোজেনের এই বর্ধিত কার্যকারিতার কারণ হইল এই যে ধান খেতের ½ ইঞ্চি উপরিস্তরে রাসায়নিক ও জৈবিক জারণ ঘটে। এই জারক স্তর অ্যামোনিয়মকে নাইট্রেটে এবং নাইট্রেটকে গ্যাসীয় নাইট্রোজেনে পরিবর্তনে সহায়তা করে। গ্যাসীয় নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলে চলিয়া যায়। অ্যামোনিয়ম-ঘটিত নাইট্রোজেনকে দুই বা চার ইঞ্চি নিচে প্রয়োগ করিলে ইহা অ্যামোনিয়মরূপেই থাকে এবং ধান গাছ তাহা ব্যবহার করে এবং বায়ুমণ্ডলে চলিয়া গিয়া ইহার অপচয় ঘটে না।

(উপরে) ধান রোপণের পূর্বে জমি লাঙ্গল দ্বারা কাদা করিয়া সমতল করা দরকার।

(নীচে) পাঞ্জাবের কুলু উপত্যকার পাহাড়ের ঢালু জমিতে ধানের চাষ।

নরম কাদা মাটিতে আঙ্গুলের সাহায্যে পুঁতিয়া ধানের চারা রোপণ করা হয়। উপরে সাধারণ রোপণ পদ্ধতি এবং পার্শ্বে জাপানী রোপণ পদ্ধতি বা সারিতে রোপণ পদ্ধতি দেখা যাইতেছে (অন্ধ্র প্রদেশ)।

নাইট্রোজেনঘটিত রাসায়নিক সার ধানের জমিতে ছড়ানো হইতেছে। [সাধারণতঃ সম্পূর্ণ পরিমাণ ফসফোরস ও পটাশঘটিত সার অর্ধেক পরিমাণ নাইট্রোজেনঘটিত সার জমি তৈয়ারীর শেষ পর্যায়ে এবং নাইট্রোজেনঘটিত সারের অবশিষ্ট অর্ধাংশ রোপণের ৩০ হইতে ৪৫ দিন পরে প্রয়োগ করা হয়। সাম্প্রতিক সুপারিশ অনুসারে নাইট্রোজেনঘটিত সারের দুই-তৃতীয়াংশই জমি তৈয়ারীর শেষ পর্যায়ে প্রয়োগ করা উচিত] (অন্ধ্র প্রদেশ)।

নাইট্রোজেন ঘটিত সারের উপযোগিতা
(Response to Nitrogen Fertilizers)

ভারতের সর্বত্র কৃষকের খেতে পরিচালিত পরীক্ষাসমূহের ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পুরাতন পলিজ মাটিতে (old alluvial soils) ধানে নাইট্রোজেনঘটিত সার প্রয়োগে সর্বাধিক সাড়া পাওয়া গিয়াছে; সারবিহীন জমি অপেক্ষা ৮৫৯ পাউণ্ড ধান বেশি পাওয়া গিয়াছে। ইহার পর সাড়ার ক্রমাবনতি অনুক্রমে মাটিগুলিকে সাজাইলে নিম্নরূপ দাঁড়ায়ঃ কৃষ্ণবর্ণ মাটি, লাল মাটি, লাল কাঁকর-যুক্ত মাটি এবং লাল ও কৃষ্ণবর্ণ মাটির মিশ্রণ। উপকূলবর্তী পলিজ মাটি, বদ্বীপ অঞ্চলের ও লাবণিক মাটি, নূতন পলি মাটি, লাটেরাইট মাটি এবং লাল ও হল্‌দে মাটিতে সাড়া খুব কম পাওয়া যায়। একর পিছু ১৫০ পাউণ্ড অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রয়োগে সারবিহীন জমি অপেক্ষা ধানের গড় ফলন ৫১৪ পাউণ্ড বাড়িয়াছে।

প্রতি পাউণ্ড অ্যামোনিয়ম সালফেটের মূল্য ০·১৫ টাকা ধরিলে এবং প্রতি পাউণ্ড ধানের মূল্য ০·১২ টাকা ধরিলে, সারে ২২·৫০ (১৫০ × ০·১৫ টাকা নিয়োগ করিয়া ধানে ৬১·৬৮ (৫১৪ × ০·১২) টাকা ফেরত পাওয়া যায়। অর্থাৎ অ্যামোনিয়ম সালফেটে ১৲ টাকা নিয়োগ করিয়া ধানে ২·৭৪ টাকা ফেরত পাওয়া যায়।

প্রতি একর জমিতে ১৫০ পাউণ্ড অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রয়োগ করিয়া একর পিছু গড়ে ১৫৫ পাউণ্ড বাজরা, ৪১২ পাউণ্ড রাগি (ragi) ও ২৮৯ পাউণ্ড গমের বর্ধিত ফলন পাওয়া গিয়াছে।

কেবল নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রয়োগেই অধিকাংশ ফসলের ফলন বাড়ে বটে, তবে নাইট্রোজেনের সঙ্গে সুপারফসফেট প্রয়োগ করিলে সাধারণত ফলন আরও বাড়িয়া যায়। যেমন একর পিছু ১৫০ পাউণ্ড অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রয়োগে ধানের ফলন গড়ে ৫১৪ পাউণ্ড বৃদ্ধি পায়। ঐ একই পরীক্ষায় ১৫০ পাউণ্ড অ্যামোনিয়ম সালফেট এর সহিত একর পিছু ২০০ পাউণ্ড সুপার ফসফেট প্রয়োগ করাতে ধানের ফলন ৭৮৯ পাউণ্ড বাড়িয়া গেল অর্থাৎ সুপার ফসফেট প্রয়োগ হেতু একর প্রতি ২৭৫ পাউণ্ড বেশি ফলন পাওয়া গেল।

বাজরাতে ১৫০ পাউণ্ড অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রয়োগে ১৫৫ পাউণ্ড ফলন বাড়ে নাইট্রোজেনের সহিত ২০০ পাউণ্ড সুপার ফসফেট প্রয়োগ করাতে ফলন ৩৬৩ পাউণ্ড বাড়িয়া গেল অর্থাৎ সুপার ফসফেট হেতু একর প্রতি ২০৮ পাউণ্ড ফলন বৃদ্ধি ঘটিল।

উক্ত পরীক্ষা সমূহ এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিচালিত আরও বহু পরীক্ষার ফলাফল হইতে জানা যায়, গড়ে পাঁচ পাউণ্ড অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রয়োগে গমের ৮ পাউণ্ড ফলন বৃদ্ধি আশা করা যায়। এক পাউণ্ড অ্যামোনিয়ম সালফেটের দাম টা ০.১৫ ন.প. হইলে পাঁচ পাউণ্ডের দাম পড়ে টা. ০.৭৫ ন.প.। এক পাউণ্ড গমের দাম টা. ০.১৭ ন.প. হইলে বর্ধিত আট পাউণ্ড গমের মূল্য দাঁড়ায় টা. ১.৩৬ ন.প.। কাজেই অ্যামোনিয়ম সালফেট হিসাবে টা ০.৭৫ ন.প. খরচ করিয়া গমে টা. ১.৩৬ ন.প. ফেরত পাওয়া যায়।

ইউরিয়া নাইট্রোজেন ঘটিত সার হিসাবে এদেশে নূতন। অ্যামোনিয়ম সালফেটে যত নাইট্রোজেন থাকে ইউরিয়াতে তাহার দ্বিগুণেরও অধিক থাকে। পাউণ্ড পিছু নাইট্রোজেনের মূল্য বিবেচনা করিলে ইউরিয়া সবচাইতে সস্তা। ভারতের বিভিন্ন স্থানে নানা পরীক্ষায় সম্প্রতি জানা যায় যে পাউণ্ড প্রতি নাইট্রোজেনের হিসাব করিলে গম ও ইক্ষুতে ইউরিয়া অ্যামোনিয়ম সালফেটের মতই সমান কার্যকরী। তবে ধানে অ্যামোনিয়ম সালফেট অপেক্ষা ইউরিয়া সামান্য পরিমাণে স্বল্প কার্যকারী।

১৯৫৫-৫৬ সালের রবি (শীত) ঋতুতে ভারতের সর্বত্র জলসিক্ত গম ও ধানে সারের পরীক্ষা চালানো হয়। একর পিছু ১৫০ পাউণ্ড অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রয়োগে সারের খরচ বাদ দিয়া একর প্রতি গড়ে ২১.০০ মূল্যের অধিক ফলন পাওয়া যায়। ধানে একই পরিমাণ অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রয়োগে সারের খরচ বাদ দিয়া একর প্রতি গড়ে টা ৩০.০০ মূল্যের অধিক ফলন পাওয়া যায়।

এই সকল ফলাফল হইতে সুপারিশ করা যায় যে অ্যামোনিয়ম সালফেটের সরবরাহে ঘাটতি থাকিলে গম অপেক্ষা ধানে উহা প্রয়োগ করিলে অধিকতর লাভ হইবে।*

---

* The report of the results of Fertilizer Demonstrations in India. Rabi 1955-56, India Council of Agricultural Research, New Delhi 1959.

ফসফোরস-ঘটিত বিভিন্ন প্রকার সার

(Kinds of Phosphorus Fertilizers)

শতকরা ১৬ ভাগ ফসফেট যুক্ত সুপারফসফেটই ভারতের প্রায় সর্বত্র ফসফোরস ঘটিত সাররূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু রক ফসফেট (rock phosphate), হাড়ের গুঁড়া, বেসিক স্ল্যাগ (basic slag) প্রভৃতিও কিছু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

এদেশে ব্যবহৃত সুপারফসফেটের অধিকাংশই এদেশে তৈয়ার হয়। উত্তর আফ্রিকা হইতে আমদানিকৃত ফসফেটের সহিত সালফিউরিক অ্যাসিড মিশাইয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়। অ্যাসিডের সহিত বিকারের ফলে ফসফোরস ফসলের সহজলভ্য হয়। রক ফসফেট, চূর্ণ পশুর হাড়, বেসিক স্ল্যাগ প্রভৃতিও উত্তম ফসফোরস ঘটিত সার কিন্তু বাজারে সকল সময় পাওয়া যায় না।

ফসফোরস-ঘটিত সার প্রয়োগ

[Applying Phosphorus Fertilizers)

সুপারফসফেট মাটিতে যে স্থানে প্রয়োগ করা হয় সেস্থান হইতে সাধারণত নড়ে না। এজন্য সুপারফসফেট আর্দ্র মাটিতে বীজের সন্নিকটে প্রয়োগ করা উচিত। বীজ যদি বপন যন্ত্রের সাহায্যে বপন করা হয় তবে একই সঙ্গে সুপারফসফেটও প্রয়োগ করা যায়। নাইট্রোজেন ঘটিত রাসায়নিক সার অঙ্কুরোদ্গমনীয় বীজের ক্ষতি করে, সুপারফসফেট কিন্তু কোন ক্ষতি করে না।

অপর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে সুপারফসফেট মাটির সংস্পর্শে আসিলে শীঘ্রই উদ্ভিদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায় এবং সহজলভ্য হয় না। সেজন্য ইহা কখনও মাটির উপরে ছড়াইয়া প্রয়োগ করা উচিত নয়। সুপারফসফেট সর্বদাই বীজের সন্নিকটে ঘন করিয়া প্রয়োগ করা উচিত।

মাটি কর্তৃক ফসফেট 'বন্ধন' আরও হ্রাস করিবার জন্য কম্পোস্ট, খামার জাত সার বা খইলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সুপারফসফেট প্রয়োগ করা উচিত।

ফসফোরস-ঘটিত সারের উপযোগিতা
(Response to Phosphorus Fertilizer)

১৯৫৪-৫৫ সালের খরিপ খন্দে (গ্রীষ্মকালে) ধানের একর প্রতি ১৯০ পাউণ্ড সুপারফসফেট প্রয়োগ করিয়া সারা ভারতে পরীক্ষা চালানো হয়। সারের খরচ বাদ দিয়া ১২.০০ মূল্যের ধানের ফলন বৃদ্ধি পায়।*

১৯৫৫-৫৬ সালের রবি খন্দে (শীতকালে) জলসিক্ত গম ও ধানে একর প্রতি ১৯০ পাউণ্ড সুপারফসফেট প্রয়োগ করিয়া ভারতের সর্বত্র পরীক্ষা চালানো হয়। সার প্রযুক্ত জমিতে সারের খরচ বাদ দিয়া টা. ১৮.০০ মূল্যের গম ও টা. ২৩.০০ মূল্যের ধানের ফলন বৃদ্ধি পায়। †

কাজেই গম ও ধান উভয় ফসলেই সুপারফসফেট প্রয়োগ লাভজনক কিন্তু সুপারফসফেটের সরবরাহে ঘাটতি থাকলে ইহা ধানে প্রয়োগ করা অধিকতর লাভজনক।

বিহারের পুসায় পনর বৎসর ধরিয়া প্রতি বৎসর একর পিছু ২৫০ পাউণ্ড সুপারফসফেট প্রয়োগ করিয়া শতকরা ৯৩ ভাগ ফলন বৃদ্ধি পায় এবং একর প্রতি বাৎসরিক টা. ১৩.০০ লাভ হয়।

ভারতের অধিকাংশ মাটিতেই সুপারফসফেট প্রয়োগে সাড়া পাওয়া যায়। তবুও ইহা প্রয়োগের পূর্বে মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া ইহার চাহিদা নিরূপণ করা বাঞ্ছনীয়।

পটাশ-ঘটিত সার (Potassium Fertilizers)

পটাশ-ঘটিত দুইটি প্রধান সার হইল :

(১) মিউরিএট অফ পটাশ (Muriate of Potash) যা পটাশিয়ম ক্লোরাইড-ইহাতে শতকরা ৬০ ভাগ K_2O থাকে ;

---

* The Report of the Results of Fertilizers Demonstration Trials in India : Kharif, 1954-55, India Council of Agricultural Research, New Delhi, 1958.

† The Report of the Results of Fertilizer Demonstrations in India. Rabi, 1955-56, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, 1959.

(২) সালফেট অফ পটাশ (Sulphate of Potash) বা পটাশিয়ম সালফেট—ইহাতে শতকরা ৪৮ ভাগ K_2O থাকে।

কাঠের ছাইতে শতকরা পাঁচ ভাগ K_2O থাকে এবং ২০ হইতে ৫০ ভাগ চুন থাকে। কাজেই কাঠের ছাই প্রয়োগে মাটির পটাশ ও চুন-উভয়েরই ঘাটতি পূরণ হয়।

মিউরিএট অফ্ পটাশ, সালফেট অফ পটাশ ও কাঠের ছাই-এর পটাশ সহজেই জলে দ্রবনীয়। সেজন্য পটাশ ঘটিত সার বীজ বা চারার সন্নিকটে প্রয়োগ করা চলে না। সাধারণ লবণ ছিটাইয়া দিলে যেমন আগাছা মারা যায়, পটাশ ঘটিত সার অতি নিকটে প্রয়োগ করিলে ঠিক সেভাবে সকল উদ্ভিদ মারা যায়। এ বিষয়ে নাইট্রোজেন ও পটাশ ঘটিত সার উভয়েরই প্রকৃতি সদৃশ, অর্থাৎ উভয় শ্রেণীর সারই অধিক পরিমাণে অঙ্কুরমান বীজ বা কোমল চারার সন্নিকটে প্রয়োগ করা চলে না।

ভারতের বিভিন্ন প্রকার মাটিতে নাইট্রোজেন ও ফসফোরস অপেক্ষা পটাশিয়মের প্রাচুর্য অনেক বেশি। অবশ্য ফসলের ফলন যত বৃদ্ধি পায়, মাটিতেও পটাশের পরিমাণ তত হ্রাস পায়; কারণ ফসলের মাধ্যমে পটাশ জমি হইতে অপসারিত হয়। আবার বৃষ্টি বহুল অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার ফসলের চাষ করিলে পটাশ-ঘটিত সার প্রয়োগে অধিকতর সাড়া পাওয়া যায়।

উদাহরণ স্বরূপ, বিহারের চম্পারন জেলায় একর পিছু ২০০ পাউণ্ড অ্যামোনিয়ম সালফেট ও ৬০০ পাউণ্ড সুপারফসফেটের সহিত ১৩৫ পাউণ্ড মিউরিএট অফ পটাশ প্রয়োগে ২·২ টন ইক্ষুর অতিরিক্ত ফলন হয় এবং পটাশ ঘটিত সার হেতু একর প্রতি ৫৯·০০ টাকা লাভ হয়। একই পরিমাণ অ্যামোনিয়ম সালফেট ও সুপারফসফেটের সহিত বর্ধিত পরিমাণ একর পিছু ২৭০ পাউণ্ড মিউরিএট অফ পটাশ প্রয়োগে অতিরিক্ত ৪·৫ টন ইক্ষু পাওয়া যায় এবং একর প্রতি টা ১১৭·০০ লাভ হয়।

পটাশ-ঘটিত সার প্রয়োগে নারিকেল বেশ সাড়া দেয়। নারিকেল বৃক্ষ পিছু দুই পাউণ্ড মিউরিএট অফ পটাশ প্রয়োগে নারিকেলের ফলন বৃদ্ধি পায় এবং বৃক্ষের কয়েকপ্রকার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।*

* Dohn, C. M. "Coconut Cultivation" The Indian Coconut Committee, Indian Council of Agricultural Research N. Delhi 1955

নাইট্রোজেন ও ফসফোরস সহ পটাশ ঘটিত সার প্রয়োগে সুপারি গাছও সাড়া দেয়। প্রতি বৎসর একর প্রতি ৬০০ পাউণ্ড অ্যামোনিয়ম সালফেট, ২০০ পাউণ্ড সুপারফসফেট ও ৩০০ পাউণ্ড মিউরিএট অফ পটাশ সুপারি বাগানে প্রয়োগ করা উচিত।†

দক্ষিণ ভারতে চা-বাগানে সাধারণত প্রতি বৎসর একর পিছু ৬০০ পাউণ্ড অ্যামোনিয়ম সালফেট, ২০০ পাউণ্ড সুপার ফসফেট ও ১০০ পাউণ্ড মিউরিএট অফ পটাশ প্রয়োগ করা হয়।‡

কফি, ট্যাপিওকা (tapioca) এবং আলুও পটাশ ঘটিত সার প্রয়োগে সাধারণত সাড়া দেয়। তবে নির্দিষ্ট কোন ফসলের জন্য মাটিতে কত পরিমাণ পটাশ ঘটিত সার প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা পূর্বেই মৃত্তিকা পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করা উচিত।

গৌণ ও অপ্রধান মৌল (Secondary and Minor Elements)

গৌণ মৌল সমূহ হইল ক্যালসিয়ম, ম্যাগনেশিয়ম ও সালফার।

পোড়ানো বা চূর্ণ চুনাপাথর রূপে ক্যালসিয়ম এবং সময় সময় ম্যাগনেশিয়ম মাটিতে প্রয়োগ করা যায়। কাঠের ছাই ও গোবরের ছাইতে যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালসিয়ম, ম্যাগনেশিয়ম ও পটাশিয়াম থাকে।

বার্ষিক ৪০ ইঞ্চির অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে উঁচু ও উত্তম নিকাশী (Well-drained) মাটিতে ক্যালসিয়ম ও ম্যাগনেশিয়মের চাহিদা থাকে। অর্থাৎ সর্বোচ্চ ফলনের জন্য ভারতের নিম্নলিখিত অঞ্চল সমূহের মাটিতে চুন প্রয়োগ করা দরকার: কেরালা রাজ্য, মহারাষ্ট্র ও মহীশূর রাজ্যের পশ্চিম ঘাট পর্বত অঞ্চলে, পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার সমুদ্রোপকূল, আসাম, উত্তর বিহার, উত্তর প্রদেশ ও কাশ্মীর।

সালফার কখনও কখনও হলদে গুঁড়া ও মৌল অবস্থায় প্রয়োগ করা হয়, তবে সাধারণত জিপসাম (ক্যালসিয়ম সালফেট রূপেই সালফার প্রয়োগ করা হয়। ভারতে ক্ষারীয় কৃষ্ণ মৃত্তিকা সংশোধনে জিপসাম ব্যবহার করা হয়। (অষ্টম অধ্যায় দেখ)।

---

† "How to Cultivate Arecanut successfully", Indian Central Arecanuts Committee, Indian Council of Agricultural Research N. Delhi.

‡ De Jong, Peter, Guide to Manuring of Tea in South India" Potascheme, Bangalore Mysore State 1959

অপ্রধান মৌল সমূহ হইল কপার, বোরন ম্যাঙ্গানিজ, আইরণ, জিংক, মলিবডেনম, ও ক্লোরিন। ফসলের একর পিছু ফলন কম থাকিলে এই সকল মৌল সাধারণত মৃত্তিকাস্থ জৈব পদার্থের বিযোজন হেতু এবং মাটির মণিক পদার্থ হইতে সরবরাহ হয়। একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি পাইলে মাটি হইতে মুখ্য, গৌণ ও অপ্রধান মৌল সমূহের চাহিদাও সেই হারে বাড়িয়া যায়। মাটি হইতে অপ্রধান মৌল সমূহের সরবরাহ সকল সময় একরূপ থাকে না বলিয়া বিভিন্ন ফসলে অপ্রধান মৌল সমূহ প্রয়োগে ফলাফলও বিভিন্ন প্রকার হয়।

মহারাষ্ট্র রাজ্যের কিছু অঞ্চলে মাটিতে কপার প্রয়োগে ধানের ফলন শতকরা ৩৫-৮৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। কোয়েম্বাটোরের নিকটবর্তী অঞ্চলে ধান গাছে জিংক সালফেট স্প্রে করিয়া ফলন শতকরা ১০ হইতে ২৮ ভাগ বাড়িয়াছে।

কপার, জিংক ও ম্যাঙ্গানিজ গমের পাতায় স্প্রে করিয়া ও মাটিতে প্রয়োগ করিয়া নূতন দিল্লীর নিকটে গমের ফলন বৃদ্ধি পাইয়াছে। নূতন দিল্লী ও বাঙ্গালোরে (মহীশূর রাজ্য) কপার প্রয়োগে জোয়ারের ফলন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ম্যাঙ্গানিজ, জিংক ও বোরন প্রয়োগে মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাটে তূলার ফলন বৃদ্ধি পাইয়াছে।*

রাজস্থানে জিংক প্রয়োগে যব ছোলা প্রত্যেকের ফলন শতকরা ১৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। জিংক ও আইরণ প্রত্যেকেই গমের ফলন সামান্য বৃদ্ধি করে।

ভারতের সর্বত্র বহু লেবু বাগানে নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়ম, ম্যাঙ্গানিজ বা অপ্রধান মৌল জিংক, কপার আইরণ বা বোরন যে কোনটির অভাব লক্ষ্য করা যায়। এই অভাব পূরণের জন্য লেবু গাছের পাতায় একর প্রতি নিম্নলিখিত মিশ্রণ প্রয়োগ করা উচিত:

পদার্থ	পাউণ্ড
জিংক সালফেট (Zinc sulphate)	৫
কপার সালফেট (Copper sulphate)	৩
ম্যাগনেশিয়ম সালফেট (Magnesium sulphate)	২
ফেরাস সালফেট (Ferrous sulphate)	২

* Pannalal Javeri, "Trace Elements," Indian Farming, October 1959, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.

পদার্থ	পাউণ্ড
বোরিক অ্যাসিড বা বোরাক্স (Boric acid or borax)	১
পোড়ানো চুন (Lime, burned)	৯
ইউরিয়া (Urea)	১০
জল (Water)	১০০ গ্যালন **

খামারজাত সার, তৈলবীজের খইল ও কম্পোস্ট

(Farmyard Manure, Oilseed Cakes, and Compost)

গোবর, গোচোনা ও পশুকে শুইবার জন্য বিছানো খড় ইত্যাদি দ্বারা খামারজাত সার তৈয়ার করা হয়। চীনাবাদাম, রেড়ি, নিম, সরিষা ও তুলাবীজের খইল ভারতে সচরাচর ব্যবহৃত। খামারজাত সাধারণ সার অপেক্ষা এই সকল খইল পাঁচ গুণ নাইট্রোজেন, আড়াইগুণ ফসফোরস ও দ্বিগুণ পটাশিয়মে সমৃদ্ধ।† যে সকল পদার্থ হইতে কম্পোস্ট তৈয়ারি হয় সে সকল পদার্থের উপাদানের উপর (composition) কম্পোস্টের উপাদান নির্ভর করে।

খামারজাত সার তাজা অবস্থায় জমিতে প্রয়োগ করিলে ফলন যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। তাহা সম্ভব না হইলে উহা গর্তে বা স্তূপীকৃত করিয়া সংরক্ষণ করা যায়। বার্ষিক ৩০ ইঞ্চির কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে সার গর্তে সংরক্ষণ করা বাঞ্ছনীয়। তদধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে স্তূপীকৃত করিয়া সার সংরক্ষণ করা উচিত (চিত্র নং ৪ ও ৫)।

** Venkataratnam, "Proper Spacing in Citrus Orchards" Kisan, Volume VI No 2, Sept. 1959 Hyderabad Andhra Pradesh, India.

† যে সকল খইলের নাম করা হইল সেগুলিতে গড়ে শতকরা ৫·২ ভাগ নাইট্রোজেন (N), ১·৫ ভাগ ফসফোরস (P_2O_5) ও ১·৪ ভাগ পটাশিয়ম (K_2O) থাকে আর গোশালায় বিছানো খড় বাদ দিয়া তৈয়ারি খামারজাত সারে গড়ে শতকরা ১ ভাগ নাইট্রোজেন (N), ০·৬% ফসফোরস (P_2O_5) ও ০·৭ ভাগ পটাশিয়ম (K_2O) থাকে।

রাজ্যের সার-সম্পর্কিত সুপারিশ অনুসরণ করিয়া মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরের নিকটবর্তী গ্রাম চিলনাতে ধানের ফলন শতকরা ৫০ ভাগ এবং ৩০ পাউণ্ড K_2O সহ রাজ্য সুপারিশ অনুসরণ করিয়া শতকরা ৯১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

O—বিনা সারে একর প্রতি ৮০০ পাউণ্ড ধান।

N—একর প্রতি ৩০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন প্রয়োগে ৮৮০ পাউণ্ড ধান।

NP—একর প্রতি ৩০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন ও ৩০ পাউণ্ড P_2O_5 (সাধারণ রাজ্য সুপারিশ) প্রয়োগে ১৩৬০ পাউণ্ড ধান।

NPK—একর প্রতি ৩০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন, ৩০ পাউণ্ড P_2O_5 ও ৩০ পাউণ্ড K_2O প্রয়োগে ১৬৮০ পাউণ্ড ধান।

দ্রষ্টব্য : (১) N প্রয়োগের বেলায়, কাদানোর সময় অর্ধেক N এবং রোপণের চার সপ্তাহ পরে অবশিষ্ট অর্ধেক প্রয়োগ করা হয়। (২) P_2O_5 ও K_2O প্রয়োগের বেলায়, সম্পূর্ণ পরিমাণ P_2O_5 ও K_2O কাদানোর সময় প্রয়োগ করা হয় [Frank Shuman মহাশয়ের সৌজন্যে]
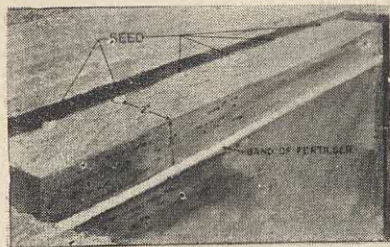
বীজের ২ ইঞ্চি পাশে ও ২ ইঞ্চি নীচে সার প্রয়োগ করা উচিত।

আগাছা দমন ও মাটিতে সুগম বায়ু চলাচলের জন্য ধান নিড়ানী যন্ত্র ব্যবহার করা হইতেছে (অন্ধ্রপ্রদেশ)।

বিহারের সাবৌরে কৃষি কলেজের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট গম ফসল।
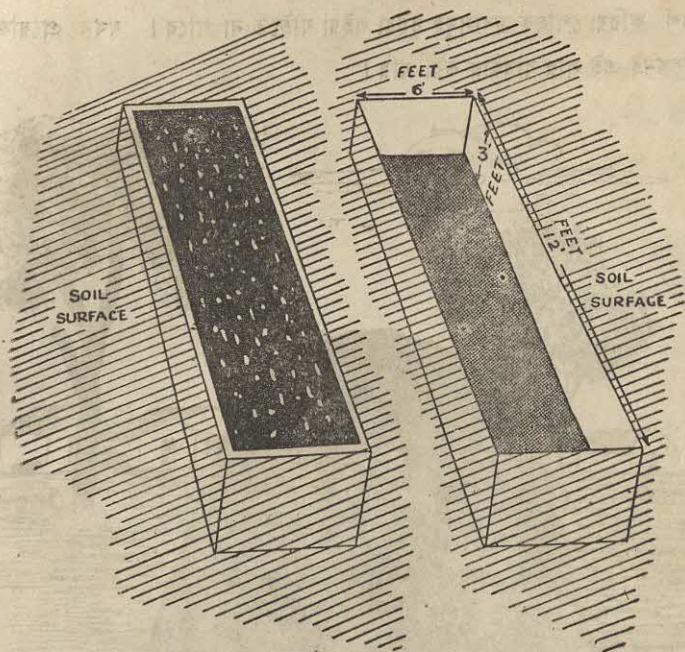
চিত্র নং ৪। বার্ষিক ৩০ ইঞ্চির কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে খামারজাত সার গর্তে তৈয়ার করা উচিত। [ARAKERI হইতে পুনরঙ্কিত]।

মাটিতে প্রয়োগ করিবার পূর্বে **গর্তে** সার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ছয় ফুট চওড়া, তিন ফুট গভীর এবং সমস্ত সার ধরিবে এরূপ লম্বা একটি গর্ত খুঁড়িতে হয়। গর্তের তলদেশে খড় বিছাইয়া দিতে হইবে। অতঃপর প্রতিদিন গোবর সহ আবর্জনা গর্তে ফেলিতে হইবে এবং মাটির পাতলা স্তর দ্বারা তাহা আবৃত করিতে হইবে। মাটির উপরিতলের গড়ানো জল গর্তে প্রবেশ করিতে দেওয়া চলিবে না। অতঃপর জমি তৈয়ার হইলে এই সার যে কোন সময় জমিতে ব্যবহার করা যায়।

স্তূপীকৃত করিয়া সংরক্ষণের পদ্ধতি হইল উত্তম জল-নিকাশী স্থানে প্রতিদিন গোশালার গোবর সহ আবর্জনা জমা করিতে হইবে। স্তূপটি গোলাকার হইবে এবং স্তূপের ব্যাস ছয় ফুট হইবে। স্তূপটি ছয় ফুট উচু হইলে ইহার উপরের অংশ কাদা দিয়া আবৃত করিতে হইবে, ইহার উদ্দেশ্য বৃষ্টির জল যাহাতে ভিতরে

প্রবেশ করিয়া পোষক দ্রব্যসমূহ ধুইয়া লইয়া যাইতে না পারে। যখন প্রয়োজন হয় তখনই এই সার ব্যবহার করা যায়।
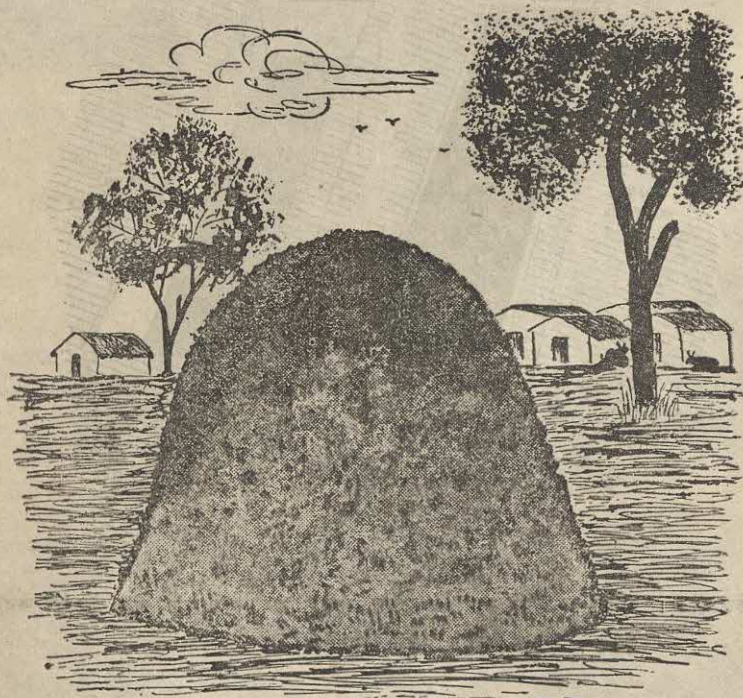
চিত্র নং ৫। বার্ষিক ৩০ ইঞ্চির অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে খামারজাত সার স্তূপ করিয়া তৈয়ার করা বাঞ্ছনীয়। [DONAHUE হইতে পুনরঙ্কিত]।

কম্পোস্ট তৈয়ার করিবার জন্য ছয় ফুট চওড়া, তিন ফুট গভীর এবং প্রয়োজন অনুসারে দীর্ঘ যাহাতে সকল জৈব আবর্জনা ধরিতে পারে, এরূপ একটি গর্ত খুঁড়িতে হইবে। গাছের পাতা, খড়, শহরের আবর্জনা বা ইক্ষুর আবর্জনা ছয় ইঞ্চি পুরু করিয়া গর্তের তলদেশে ছড়াইয়া পা দিয়া মাড়াইতে হইবে। অতঃপর তাহার উপরে দুই ইঞ্চি পুরু করিয়া খামারজাত সার ছড়াইয়া এক ইঞ্চি পুরু করিয়া মাটি দিয়া আবৃত করিতে হইবে। এইভাবে ভর্তি করিতে করিতে সারের স্তূপ ভূপৃষ্ঠ হইতে দুই ফুট উঁচু হইলে ছয় ইঞ্চি পুরু করিয়া মাটি দ্বারা তাহাকে ঢাকিয়া দিতে হইবে। চার মাসের মধ্যে ইহা ব্যবহারের উপযোগী হইবে এবং খামারজাত সারের ন্যায় কাজ দিবে।

খইলও খামারজাত সার বা কম্পোস্টের ন্যায় ব্যবহার করা হয়। তবে ইহা পোষক পদার্থে অধিকতর সমৃদ্ধ বলিয়া একর প্রতি ইহার পরিমাণ কম লাগে। সরিষার খইল, খামারজাত সার ও অ্যামোনিয়ম সালফেট এই তিন প্রকার সারের গমের ফলন বৃদ্ধির ক্ষমতা সম্পর্কে বিহারের পুসায় এক তুলনামূলক পরীক্ষা চালানো হয়। পনর বৎসর ধরিয়া পরিচালিত এই পরীক্ষায় প্রতি বৎসর একর পিছু একই পরিমাণ নাইট্রোজেন (N) হিসাবে একটি প্লটে কেবল অ্যামোনিয়ম সালফেট, অপর প্লটে কেবল সরিষার খইল এবং তৃতীয় প্লটে কেবল খামারজাত সার প্রয়োগ করা হয়। চতুর্থ প্লটে কোন রাসায়নিক বা জৈব সার প্রয়োগ করা হয় নাই।

সারবিহীন প্লট অপেক্ষা অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রযুক্ত প্লটে গমের ফলন শতকরা ৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়, খইল প্রযুক্ত প্লটে শতকরা ৯৩ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং খামারজাত সার প্রযুক্ত প্লটে শতকরা ১৪১ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

সবুজ সার ও সবুজ-পাতা সার
(Green Manure and Green-leaf Manure)

মাটিতে জৈব পদার্থ যোগ করিবার উদ্দেশ্যে যে ফসলের চাষ করা হয় তাহাকে সবুজ সার ফসল বলে। এক স্থান হইতে সবুজ পাতা সংগ্রহ করিয়া অন্য স্থানে জমিতে প্রয়োগ করাকে সবুজ-পাতা সার প্রয়োগ (green-leaf manuring) বলে। উভয় পদ্ধতিতেই জৈব পদার্থ যাহাতে সহজে বিযোজিত হয় সে উদ্দেশ্যে উহা কোমল অবস্থায় এবং শক্ত ও কাষ্ঠল হইবার পূর্বেই মাটির সহিত মিশাইয়া দেওয়া আবশ্যক। মাটিতে জৈব পদার্থ প্রয়োগ করিবার পরে তাহা বিযোজনের জন্য বীজ বপনের পূর্বে কয়েক সপ্তাহ সময় দিতে হইবে।

বিহারের পুসায় ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে এক স্থায়ী সার প্রয়োগ ও পর্যায়ক্রমে চাষের পরীক্ষায় জানা যায়, যে জমিতে অবিরাম তণ্ডুল জাতীয় শস্যের চাষ করা হয় তাহাতে ফলন সব চাইতে কম হয়। শস্য পর্যায়ে ডাল বা সবুজ সার ফসল অন্তর্ভুক্ত করিলে, বিশেষত ঐ ফসলে ফসফোরস-ঘটিত সার প্রয়োগ করিলে তণ্ডুল জাতীয় শস্যের ফলন যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পায় (চিত্র নং ৬)।

শন, ধইঞ্চা বক, মুগ, গুয়ার, বারসিম (berseem), খেসারী, মটর, মসুর, পিল্লিপেসারা প্রভৃতি অতি পরিচিত সবুজসার ফসল (চিত্র নং ৭)।
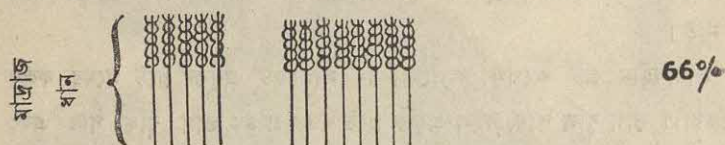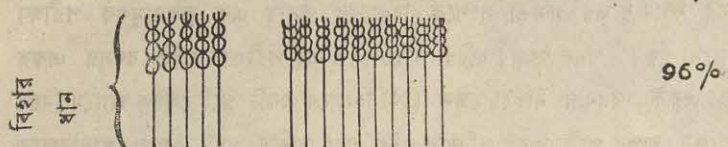
চিত্র নং ৬ সুপারফসফেট সহ সবুজ সার প্রয়োগ হেতু মাদ্রাজ ও বিহারে ধানের ফলন এবং উত্তর প্রদেশ, বিহার ও মধ্য প্রদেশে গমের ফলন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

[ICAR Pamphlet No 4 ; হইতে পুনরঙ্কিত]

1. পরিণত পত্রে তিনটি খণ্ড থাকে ; 2. পরিণত শিম্ব ; 3. কাচা শিম্ব ; 4. ফুল ;
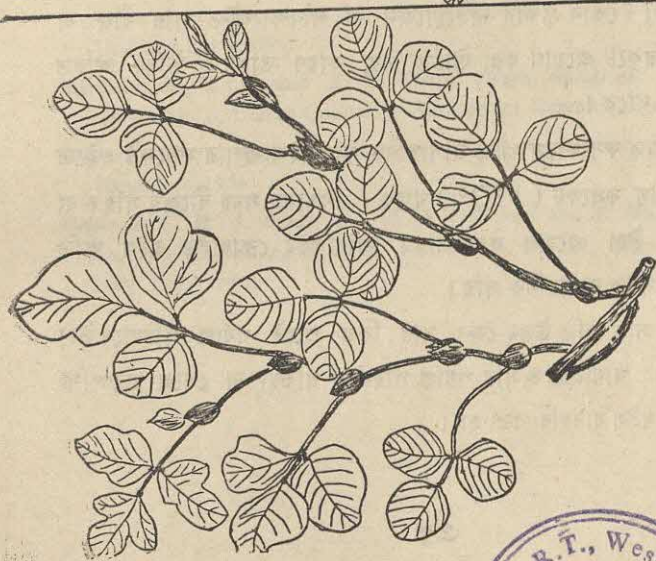
চিত্র নং ৭। পিল্লিপেসারা (Pillipesara—Phaseolus trilobus) ধানের সহিত পর্যায়ক্রমে চাষের উপযোগী উত্তম একটি সবুজ সার ফসল। আবার ইহা একটি উত্তম সবুজ পশুখাদ্য।

বামে : কোমল শাখা ; ডাইনে : পরিণত ফলবান শাখা।

[ROY L. DONAHUE মহাশয়ের সৌজন্যে।)
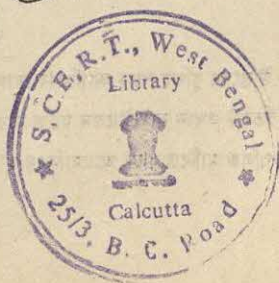
গ্লাইরিসিডিয়া (*glyricidia*), ধইঞ্চা, বন্য ফার্ণ, বনবৃক্ষের পাতা, গুয়ার, বন্য নীল, শন, চা গাছের ছাঁটা অংশ, সমুদ্রের আগাছা এবং জমির সাধারণ আগাছা সাধারণত সবুজ পাতা সার রূপে ব্যবহৃত হয়। একর প্রতি প্রায় ৫,০০০ পাউণ্ড সবুজ পাতা প্রয়োগ করিলে সাধারণত পরবর্তী ফসলের সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া যায়।

সবুজ সার ও সবুজ পাতা ব্যতীত ফসলের অবশিষ্টাংশ ও মাটিতে যথেষ্ট জৈব পদার্থ যোগ করে।

সংক্ষিপ্তসার

বৃদ্ধির জন্য সকল ফসলের ষোলটি মৌল আবশ্যক। নাইট্রোজেন ও ফস-ফোরস এই দুইটি অপরিহার্য মৌল প্রায়ই ফসলের উৎপাদনকে সীমিত করিয়া রাখে।

বর্তমানে অ্যামোনিয়ম সালফেট ভারতে অতি জনপ্রিয় নাইট্রোজেন ঘটিত রাসায়নিক সার। কোন প্রকার নাইট্রোজেন বা পটাশ ঘটিত সার বীজ বা চারার অতি সন্নিকটে প্রয়োগ করা উচিত নয়, কারণ তাহাতে উদ্ভিদ আহত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

অতি পরিচিত ফসফোরস ঘটিত রাসায়নিক সার হইল সুপার ফসফেট হইতে শতকরা ১৬ ভাগ ফসফেট (P^2O^5) থাকে। বপনের সময় বীজের সহিত বা বীজের নিকটে ইহা প্রয়োগ করা যায়। পটাশিয়ম ক্লোরাইড হইল অতি পরিচিত পটাশ ঘটিত রাসায়নিক সার।

খামারজাত সার অতি উত্তম জৈব সার কিন্তু প্রায়ই পর্যাপ্ত পরিমাণে ইহা পাওয়া যায় না। খামারজাত সার পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া না গেলে কম্পোস্ট ও তৈল বীজের খইল ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন

১। উদ্ভিদের বৃদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য ষোলটি উপাদানের নাম কর।

২। তিনটি প্রধান নাইট্রোজেন ঘটিত সার সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৩। পলিজ মাটিতে ধানে অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রয়োগে কিরূপ সাড়া পাওয়া যায় ?

৪। সুপার ফসফেট প্রয়োগ করিলে কোন ফসলে সাড়া পাওয়া যাইবে কিনা তাহা কি করিয়া নিরূপণ করিবে?

৫। জমিতে ব্যবহারোপযোগী না হওয়া পর্যন্ত খামারজাত সার সংরক্ষণের কোন একটি উত্তম পদ্ধতি সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

সহায়ক পুস্তক

Aiyer, A. K. Yegna Narayana, *Principles of Crop Husbandry in India,* The Bangalore Press, Bangalore, 1957

Arakeri, H. R., G. V. Chalam, P. Satyanarayana, and Roy L. Donahue, *Soil Management in India* Asia Publishing House, Bombay, Second Edition, 1962

Daji, J. A., *Manures and Manuring* Directorate of Extesion, Ministry of Food and Agriculture, New Delhi, 1955

Donahue, Roy L., *Our Soils and Their Management*—An Introduction to Soil and Water Conservation, The Interstate Danville *Illinois*, U.S.A. 1961

Green Manuring—Way to Better Crop Yields, *Information leaflet No, 5, Directorate of Extension*, Ministry of Food and Agriculture, New Delhi, Undated Publication

Mirchandani, T. J., and A. R. Khan, *Green Manuring* ICAR. Reveiw Series No. 6, Indian Council of Agriculture Research, New Delhi, 1955

Mudaliar, V. T. Subbiah, *Principles of Agronomy,* The Bangalore Press, Bangalore 1956

Ochse, J. J., M. J. Soule, Jr., M. J. Dijkman and C. Wehlburg, *Tropical and Subtropical Agriculture,* Volumes I and II, The Macmillan Co., New York. 1961

দ্বিতীয় অধ্যায়

জল ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ এবং শুষ্ক চাষ

(Water and soil conservation and dry Farming)

ভারতে মানুষ ও পশুর যথার্থ খাদ্য যোগান দিবার উপযোগী উর্বর জমির পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়।* জমির উপর এই চাপের ফলে অধিকাংশ জমি অতিরিক্ত কর্ষণ ও গোচারণ এবং তরু ও গুল্মাদির অতিরিক্ত বিনাশ হেতু অনুর্বর হইয়া পড়িয়াছে। জমির উপর পর্যাপ্ত গাছপালা না থাকায় বৃষ্টি সরাসরি মাটিকে আঘাত করে ; বৃষ্টির অতিরিক্ত জল মাটির উপর দিয়া গড়াইয়া যাইবার সময় মাটি ধুইয়া লইয়া যায় তাহাকে বাধা দিবার মত ফসলও সকল সময় জমির উপর থাকে না ; ফলে সাংঘাতিক রকম ভূমিক্ষয় হয়, মাটির ভিতরে স্বল্প জল প্রবেশ করে এবং মাটির উর্বরাশক্তির ক্রমাবনতি ঘটে (চিত্র নং ৮)।

কেন্দ্রীয় মৃত্তিকা সংরক্ষণ সংস্থা মোটামুটি হিসাব করিয়া দেখিয়াছে যে ভারতের প্রতি তিন একর জমির মধ্যে দুই একর জমি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অতি সত্বর সে সকল জমিতে জল ও মৃত্তিকাসংরক্ষণ প্রক্রিয়াসমূহ অবলম্বন করা

---

* নিম্নলিখিত সংখ্যাতত্ব হইতে মাটির উপর মানুষের চাপ অনুমান করা যায়। ১৯৫৬ সালে ভারতে প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ২৮৫ জন লোক বাস করিত ; কাশ্মীরে সর্বনিম্ন—প্রতি বর্গমাইলে ৪৮ এবং কেরালায় সর্বোচ্চ প্রতি বর্গমাইলে ৯২৮। ভারতে মাথাপিছু মোট জমির পরিমাণ ২·২ একর, চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ১·২ একর। মাটির উপর গৃহপালিত পশুর চাপ নিম্নলিখিত সংখ্যাতত্ব হইতে বুঝা যাইবে। ভারতের গৃহপালিত পশুর সংখ্যা হইল মোট জমির একর প্রতি ০·৪, গোচারণ ভূমির একর প্রতি ১১·০ এবং চাষযোগ্য জমির একর প্রতি ০·৮।

১৯৬২ সালের তথ্যে দেখা যায় যে ভারতের লোকসংখ্যা ৩৫·৭ কোটি হইতে বৃদ্ধি হইয়া ৪৪·০ কোটিতে পৌঁছিয়াছে ; পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা আড়াই কোটি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩ কোটি ৭০ লক্ষে পৌঁছিয়াছে ; কিন্তু মোট চাষযোগ্য জমি সামান্যই বাড়িয়াছে। কাজেই মাটির উপর জনসংখ্যার চাপ বাড়িয়াই চলিয়াছে।
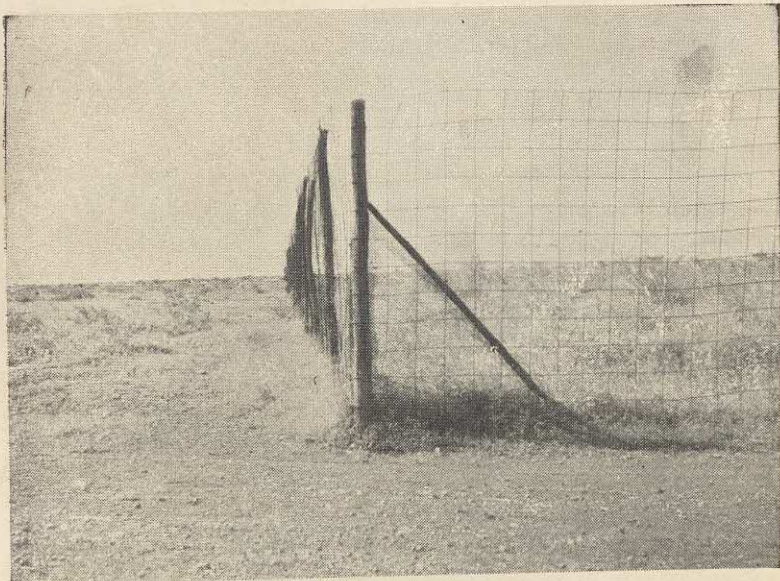
অপরিমিত পরিমাণে গরু না চড়াইলে তৃণভূমির ঘাস ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণে সক্ষম। পশু যাহাতে চরিতে না পারে সেজন্য দুই বৎসর ধরিয়া বেড়া দিয়া রাখিবার পর ঘাস পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে এবং এখন ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ ও পশুকে খাদ্য যোগান উভয়ই সম্ভব। (গুজরাট রাজ্য)

যথাযথ কীটনাশক ঔষধ যথাসময়ে প্রয়োগে ধান আক্রমণকারী কীটশত্রু নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কিভাবে রোগ ও কীটশত্রু নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সে সম্পর্কে জানিবার জন্য আপনার নিকটস্থ গ্রাম সেবকের সহিত যোগাযোগ করুন (অন্ধ্র প্রদেশ)।

মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরের নিকটস্থ সগদাগ্রামে গমে উই-এর আক্রমণ। মাটির সহিত যথাযথ কীটনাশক ঔষধ মিশাইয়া উই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। উই নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিশদ জানিবার জন্য আপনার নিকটস্থ গ্রামসেবকের সহিত যোগাযোগ করুন।

গরু হইতে শস্য রক্ষা করিবার জন্য নির্মিত দেয়ালের এই গর্তগুলিতে ইঁদুর বাস করে। কাজেই শস্য ইঁদুরের আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় না। এই ইঁদুর নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আপনার এলাকার গ্রামসেবক আপনাকে পরামর্শ দিতে পারেন। (রাজস্থান)

আবশ্যক। ইহা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কেননা ঐ তিন একর জমি হইতে তিনজন লোকের পর্যাপ্ত খাদ্য এবং তিনটি গৃহপালিত পশুর অধিকাংশ খাদ্য উৎপন্ন করিতে হইবে। উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে ভারতের উর্বরতম জমি হইতে এই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব, কিন্তু কর্ষিত ভূমির দুই তৃতীয়াংশই যদি ভূমিক্ষয়ের কবলে পড়ে, তবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ অসম্ভব। মাটি ও জল সংরক্ষণমূলক প্রক্রিয়াসমূহ অবলম্বন করিয়া এই সমস্যার আংশিক সমাধান করা যায়।
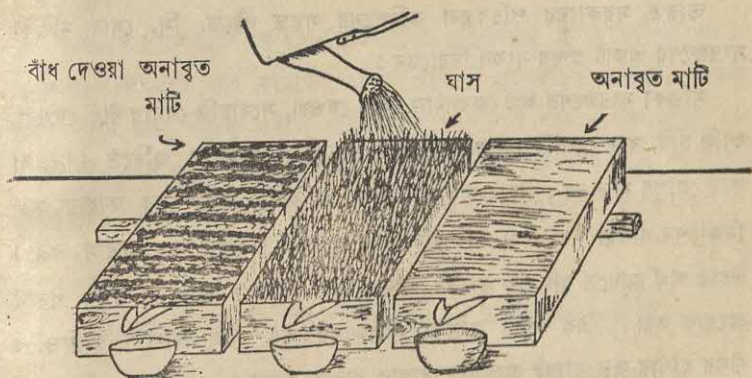
চিত্র নং ৮। ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণে বাঁধ ও ঘাসের প্রভাব এই মডেলে দেখানো হইয়াছে। বামে অনাবৃত মাটিতে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে, মধ্যে মাটি ঘাসে আবৃত, ডাইনে অনাবৃত মাটিতে কোন বাঁধ নাই। ঝারির সাহায্যে কৃত্রিম বৃষ্টি সৃষ্টি করা যায়।
[EVANS : হইতে পুনরঙ্কিত]

যত অর্থব্যয়ই করা হউক না কেন, কেবল কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের কর্মসূচী মাটি ও জল সংরক্ষণের প্রচণ্ড সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না; আবার কৃষকগণও একা এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিতে পারিবে না; সকলকে এক সঙ্গে এই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার সংরক্ষণ শিক্ষা প্রদান করিবেন এবং একাধিক রাজ্য জুড়িয়া অবস্থিত জল-বিভাজিকা নিয়ন্ত্রণ করিবেন; রাজ্য সরকার নিজ এলাকায় মাটি ও জল সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি করিবেন এবং কৃষক ও জমির মালিকগণ মৃত্তিকা ও জল সংরক্ষণ পদ্ধতিসমূহ, যেমন বাঁধ দেওয়া, জল সেচন ও জল নিষ্কাশন, ফালি চাষ (strip cropping) সমোন্নতি চাষ (contour tillage), সুষ্ঠু গোচারণ ব্যবস্থা, কার্যকরী

ফসল সূচী, এবং বনভূমির অনুমোদিত প্রথায় তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কার্য রূপায়ণে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের সহিত সহযোগিতা করিবেন।

মৃত্তিকা সংরক্ষণের সংজ্ঞা*
(Definition of Soil Conservation)

ভারত সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য শ্রীজে. সি. ঘোষ মৃত্তিকা সংরক্ষণের একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিয়াছেন :

মৃত্তিকা সংরক্ষণের অর্থ কেবলমাত্র বেড়া দেওয়া, সমোন্নতি রেখায় বাঁধ দেওয়া, ফালি চাষ, খাদ (gully) ভরাটকরণ অথবা ঢালু বা ক্ষয়প্রবণ জমিতে ঘাস বা গাছ রোপণ মাত্র নয় ; ইহার অর্থ জমি যদি অতিরিক্ত আর্দ্র হয় তাহার জল নিকাশের ব্যবস্থা করা, এবং জমি যদি অতি শুষ্ক হয় তাহাতে সেচ প্রয়োগ করা। ইহার অর্থ জমিতে যদি বৃক্ষ খাদ্যের অভাব হয় তাহাতে সার ও জৈব পদার্থ প্রয়োগ করা। এক কথায় মৃত্তিকা সংরক্ষণের অর্থ হইল জমিকে স্থায়িভাবে উর্বর রাখার জন্য যাহাই প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থা করা।

ভূমিক্ষয়ের কারণ (Causes of Soil Erosion)

জল বা বায়ুতাড়িত হইয়া মাটির এক স্থান হইতে অপর স্থানে গমনকে ভূমিক্ষয় বলে।

বৃষ্টির ফোঁটা অনাবৃত জমিকে আঘাত করিলে জমি হইতে মাটি আলগা হইয়া জলের সহিত কাদার সৃষ্টি করে তখনই জলতাড়িত ভূমিক্ষয় আরম্ভ হয়। কর্দমাক্ত জল মাটির স্বাভাবিক ফাটলের ভিতর দিয়া জমিতে শোষিত হইতে চেষ্টা করে ; কিন্তু ঐ সকল ফাটল কাদায় ভর্তি হইয়া যায় বলিয়া শোষিত হয় না। এই কর্দমাক্ত জল আর কোথাও যাইতে পারে না বলিয়া জমির উপর দিয়া ঢালের দিকে গড়াইয়া চলে এবং নালা বা নদীতে গিয়া পড়ে। এই গমন

* Presidential Address at the Fifth Annual Session of the Soil Conservation Society of India on 26 November, 1956, Journal of Soil and Water Conservation in India, Volume 5, Number 2, January 1957.

পথে জমির উপর ছোট বড় অসংখ্য খাদের সৃষ্টি হয়। জমি যত বেশি ঢালু হয় এবং জলের পরিমাণ এবং জমির ঢাল যখন কমিয়া যায়, কর্দমের অধিকাংশ পলি নালার বা নদী বা জলাধার ও সরোবরের তলায় জমা হয়। ফলে অনাবৃত ভূমি, নিকৃষ্ট তত্ত্বাবধানে স্থিত গোচারণ ভূমি ও বনভূমির উপরি স্তরের উর্বর মাটি অপসারিত হয় এবং নালা ও নদীর গভীরতা কমিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জলবহন ক্ষমতাও কমে: জলাধার ও সরোবরের উপযোগিতা হ্রাস পায়।

অনাবৃত বেলে মাটি শুষ্ক হইলে এবং প্রবল বায়ুতাড়িত হইয়া বালির দানাগুলি একে অপরকে ঘর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে বায়ুতাড়িত ভূমিক্ষয় আরম্ভ হয়। ধূলি ঝঞ্ঝা আরম্ভ হইলে মাটির সূক্ষ্মতর পলিও বায়ুতাড়িত হইয়া বহু মাইল দূরে নীত হয়। ফলে মাটির উর্বর উপরি অংশ অপসারিত হয়, খামারের উর্বর জমি বালির নীচে চাপা পড়ে এবং সাংঘাতিক ধূলিঝঞ্ঝার সৃষ্টি হয়।

বিভিন্ন প্রকার ভূমিক্ষয় (Kinds of Soil Erosion)†

মাটির উপর দিয়া প্রবাহিত জল ও বায়ু সর্বদাই কিছু মাটি বহন করে।

নিচের শিলাস্তর হইতে যে হারে মাটি সৃষ্টি হয় সেই হারে যদি জমির উপরিস্তরের মাটির ভূমিক্ষয়ের প্রভাবে অপসৃত হয় তবে কোন ক্ষতি হয় না। ইহাকে **ভূতত্ত্বীয় ক্ষয়** (geological erosion) বলে। কিন্তু মানুষ অতিরিক্ত পরিমাণে জঙ্গল কাটিয়া ফেলিয়াছে, গোচারণ ভূমিকে অতিরিক্ত ব্যবহার করিয়াছে এবং জমি অতিরিক্ত কর্ষণ করিয়াছে। এই সকল কারণে ভূতপূর্ব আবৃত মাটি বর্তমানে অনাবৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং সজোর বৃষ্টির ফোঁটা ও প্রবল বায়ুর কবলে পড়িয়াছে। ফলে মাটির উপরিস্তর স্বাভাবিকভাবে যে হারে অপসারিত হয় তাহা অপেক্ষা অনেক দ্রুত হারে অপসৃত হইতে থাকে। ইহা **মনুষ্যসৃষ্ট ক্ষয়**; **জল-তাড়িত ক্ষয়** (water erosion) ও **বায়ু-তাড়িত ক্ষয়** (wind erosion) এই দুই ভাগে ইহাকে ভাগ করা যায়।

† Adapted from : Arakeri, H. R., G. V. Chalam, P. Satyanaryana, and Roy L. Donahue, Soil Management in India, Asia Publishing House, Bombya, Second Edition, 1962

জল-তাড়িত ক্ষয়

জল সাধারণত দুই প্রকারে ভূমি ক্ষয় করে: (১) অনাবৃত মাটিতে বৃষ্টিকণার সবেগে পতন (২) ঢালু জমিতে কর্দমাক্ত জলের প্রবাহ-জনিত ক্ষয়। স্থির জলে একখণ্ড পাথর ফেলিলে জল যে ভাবে ছিটকায় বৃষ্টির ফোঁটা পড়িলে মাটিও অনুরূপভাবে ছিটকায়। ঘন্টায় প্রায় কুড়ি মাইল বেগে বৃষ্টির ফোঁটা মাটিতে নামিয়া আসে। বৃষ্টির একটি মাত্র ফোঁটার আঘাতে মাটি প্রায় দুই ফুট উঁচুতে এবং পাঁচ ফুট দূরে ছিটকাইয়া পড়িতে পারে। বৃষ্টির সহস্র সহস্র ফোঁটার অবিরত ও অপ্রতিহত আঘাতে অনাবৃত মাটি হইতে তরল কাদার সৃষ্টি হয়। এই কাদা প্রবেশ করিয়া কেঁচোর গর্ত উদ্ভিদমূল জাত গর্ত, ফাটল ও অপেক্ষকৃত বড় মৃত্তিকারন্ধ্র সমূহ বন্ধ করিয়া দেয়। কাজেই মাটির অভ্যন্তরে কম জল প্রবেশ করে। ইহার অর্থ বৃষ্টিপাত কালে যেহেতু স্বল্পতর জল মাটিতে প্রবেশ করে, সেইহেতু অধিকতর জল মৃত্তিকাকণিকাসহ মাটির উপর দিয়া গড়াইয়া চলে।

বৃষ্টির ফোঁটা পতনের ফলে মাটি ছিটকানো, চাদরের ন্যায় ক্ষয়ের (*sheet erosion*) প্রধান কারণ। মাটির উপরে মোটামুটি অবিচ্ছন্ন একটি একটি পাতলা চাদরের ন্যায় মাটির অপসারণকে *sheet erosion* বলে। এই প্রকার ভূমিক্ষয় এত ধীর-গতিতে হয় যে কৃষক বুঝিতেই পারে না।

কর্দমাক্ত জল যখন অসংখ্য অগভীর ছোট ছোট খাদ দিয়া প্রবাহিত হয় তখন ঝোরা ক্ষয় (*rill erosion*) 'এর সৃষ্টি হয়। মানুষের হাতের পাতার পিছনে বিড়াল আঁচড় কাটিলে যেরূপ দাগ পড়ে, ঝোরা ক্ষয়ের ফলেও মাটির উপরে অনুরূপ ছোট ছোট খাদের সৃষ্টি হয়।

এই সকল ছোট ছোট খাদের জল মিলিত হইয়া বড় খাদের (gully) সৃষ্টি করে। এই প্রকার ক্ষয়কে *gully erosion* বলে। গরুর গাড়ীর চাকার দাগ, মানুষ চলাচলের রাস্তা, গৃহপালিত পশুর গমনাগমনের পথ বা ইঁদুর ইত্যাদির গর্ত বরাবর গভীর খাদের সৃষ্টি হয়। sheet বা rill erosion অপেক্ষা gully erosion সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জমিকে যদি বৃষ্টির ফোঁটা অবিরাম আঘাত করিতে থাকে, কর্দমাক্ত জলের গতির প্রভাবে খাদ আরও গভীর হয় এবং জমি কৃষিকার্যের একান্তই অনুপযোগী হইয়া পড়ে।

বায়ু-তাড়িত ক্ষয়

সমুদ্র তীরে বালিয়ারি সমূহ বায়ুতাড়িত ভূতত্ত্বীয় ক্ষয়ের সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে যে বায়ুতাড়িত ক্ষয় হয়, তাহার কারণ জমির অতিরিক্ত ব্যবহার। যে সকল বেলে জমির উদ্ভিদ আবরণকে অতিরিক্ত পরিমাণে কাটিয়া ফেলা হইয়াছে ; বা গোচরণভূমিরূপে অতিরিক্ত ব্যবহৃত হইয়াছে বা জমি যদি অতিরিক্ত পরিমাণে কর্ষিত হয় তবে মাটি সহসা শুকাইয়া যায় এবং প্রবল বায়ু কর্তৃক তাড়িত হইয়া উড়িয়া যায়।

ফসল চাষের উপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে কোন তৃণাবৃত জমিতে লাঙ্গল চালাইলে দেখা যায় মাটির কণাগুলিকে ঘাসের শিকড় বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এই সকল মূল যখন পচিয়া যায় এবং জমির উপরিতল শুকাইয়া যায়, বায়ুর প্রবল তাড়নায় বিশেষত অনাবৃষ্টির সময় প্রবল বায়ুর সৃষ্টি হইলে, বেলে মাটি উড়িয়া যায়।

বায়ুর গতিবেগ যত তীব্র হয় এবং জমিকে শুকাইবার ক্ষমতা বায়ুর যত বাড়িয়া যায়, অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের মাটিও তত শুকাইয়া যায়। পূর্বে যে জল মৃত্তিকাকণাগুলিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিত বাষ্পীভবন হেতু তাহা সহসা নষ্ট হইয়া যায়। ফলে মৃত্তিকাকণাগুলি বায়ু তাড়নায় অনেকটা যেন বাছাই হইয়া উড়িয়া যায় :

(১) অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম ও উর্বরতর মৃত্তিকাকণাগুলি বায়ু তাড়িত হইয়া ধূলার মেঘ সৃষ্টি করে এবং বহু মাইল দূরে নীত হয় ;

(২) অপেক্ষাকৃত স্থূল কণাগুলি জমির উপর গড়াইয়া ঘাসের গোছায়, ফসলের অবশিষ্টাংশে বা বেড়ার গোড়ায় গিয়া জমা হয়।

ভূমিক্ষয়ের পরিণাম (Results of Soil Erosion)

ভূমিক্ষয়ের ফলে মাটির উর্বর উপরিস্তর অপসারিত হয় ; উর্বর জমির উপরে অনুর্বর বালি জমা হয়, জলাধার ভর্তি হইয়া যায়, এবং ভূনিম্নস্থ জলপীঠ (water table) আরও নিচে নামিয়া যায়। বিভিন্ন প্রকার ক্ষতি নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইতেছে।

১। **উর্বর মাটির ধৌতকরণ** (Washing away of productive soil)—ফসলের বৃদ্ধির পক্ষে মাটির উপরিস্তর খুবই গুরুত্বপূর্ণ; কারণ অধিকাংশ উদ্ভিদমূল এই স্তরে থাকে। উপরিস্তরের মাটি ধুইয়া চলিয়া গেলে অন্তর্মৃত্তিকার (subsoil) উর্বরতা কমিয়া যায়, উহা চাষ করিলে জমি ঢেলাপূর্ণ হয়—ফলে এইরূপ মাটিতে সন্তোষজনকভাবে ফসল উৎপাদন অপেক্ষাকৃত কঠিন ও ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়ে।

২। **উর্বর জমিতে বালি জমা** (Deposition of sand on productive fields)—নদীর নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলে পর্বত হইতে জলবাহিত স্থূলকণা দ্বারা উর্বর জমি আবৃত হওয়ার সর্বদাই ভয় থাকে। যে সকল অঞ্চলে বায়ু-তাড়িত ক্ষয় হয়, উর্বর জমি অনুর্বর বালি দ্বারা আবৃত হয় এবং সে জমি পুনরায় চাষের অনুপযোগী হইয়া পড়ে।

৩। **জলাধার ও সরোবর ভরাট হওয়া** (Silting of lakes and reservoirs)—সংরক্ষিত জল পানীয় জলরূপে, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচকার্যে ব্যবহারের জন্য জলাধার নির্মাণ করা হয়। জল বিভাজিকা অঞ্চলে যদি ভূমি ক্ষয় বন্ধ করা না হয় জলাধার ও সরোবর মাটি দ্বারা ভর্তি হইয়া যায়, ইহাদের জলধারণ ক্ষমতা ও উপযোগিতা হ্রাস পায়।

৪। **ভূগর্ভস্থ জলপীঠের নিম্নে নামিয়া যাওয়া** (Lowering of the underground water-table)—মাটির উপর দিয়া যদি অধিক পরিমাণ জল গড়াইয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে মাটির ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য জল অবশিষ্ট কমই থাকে। নিচের দিকে জলের অপেক্ষাকৃত স্বল্প অনুস্রবণের ফলে কূপসমূহে স্বল্প জল সরবরাহ হয়। কূপে জল কম থাকিলে জলসেচনও অনুরূপ হারে হ্রাস পায়, ফলে ফসলের ফলনও হ্রাস পায়।

জলতাড়িত ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ (Control of Water Erosion)*

জমির উপরে ফসল বা অন্যান্য কোন গাছপালা না থাকিলে মাটি ক্ষয়প্রবণ হইয়া পড়ে। অধিক জৈব পদার্থ, উর্বর ও আশানুরূপ গঠনবিশিষ্ট মাটি অপেক্ষা স্বল্প জৈব পদার্থ, স্বল্প উর্বর ও নিকৃষ্ট গঠনবিশিষ্ট মাটি সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

ঘাস ও শিম্বিগোত্রীয় উদ্ভিদ মূলগুচ্ছের সাহায্যে মাটি ধরিয়া রাখে।

* Arakeri, H. R., G. V, Chalam, P. Satyanaryan and Roy, L. Donahue, Soil Management in India, Asia Publishing House, Second Edition 1962.

পুরাতন মূল মরিয়া গেলে নূতন মূল তাহাদের স্থান অধিকার করে। ফসল অপসারণ করিলে মূলের কিছু অংশ এবং মাটির উপরিস্থিত কাণ্ডেরও কিছু অংশ মাটিতে থাকিয়া যায় ও জৈব পদার্থ গঠন করে। ফলে মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়িয়া যায়, মাটির ভৌত গঠন উন্নত হয় এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। কাজেই জীবিত ও মৃত উভয়প্রকার তৃণ ও শিম্বিগোত্রীয় উদ্ভিদ দ্বারা আবৃত থাকার ফলে মাটি বৃষ্টির ফোঁটার আঘাত ও মাটির উপরে গড়ানো জলের প্রভাবে ক্ষয়ের হাত হইতে রেহাই পায়। এই সকল বৈশিষ্ট্যের জন্য ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণে ঘাস ও শিম্বিগোত্রীয় উদ্ভিদ খুবই উপযোগী।

মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি করিয়া, আস্তরণ সৃষ্টিকারী (sod-forming) ফসলের চাষ, সমোন্নতি চাষ ও ফালি চাষ করিয়া সমোন্নতি রেখায় বাঁধ দিয়া ও খাত ভরাট করিয়া জল-তাড়িত ভূমিক্ষয় নিবারণ করা যায়।

মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি (Increasing Soil Fertility)

মূলের উত্তম বৃদ্ধি এবং জমির উপরে ফসলের আবরণ বৃষ্টির ফোঁটার আঘাত হইতে জমিকে রক্ষা করে। জমি যত উর্বর হয়, ফসলের বৃদ্ধিও তত বেশি হয় এবং ভূমিক্ষয়ও তদনুপাতে হ্রাস পায়।

জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করিতে হইলে প্রথমে মাটি পরীক্ষা করা দরকার। এই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সারের যে সুপারিশ করা হয় তাহা অনুসরণ করিলে কম ব্যয়ে চরম ফলন পাওয়া যায়। ফলে যেমন ফসলের ফলন বাড়ে তেমনি ভূমিক্ষয়ও নিবারিত হয়।

আস্তরণ সৃষ্টিকারী ফসলের চাষ (Using Sod-forming Crops)

ঘাস, শন, লুসার্ন, বারসিম, চীনাবাদাম প্রভৃতি আস্তরণ সৃষ্টিকারী ফসল জল-তাড়িত ভূমিক্ষয়ের হাত হইতে জমিকে রক্ষা করে। ঐসকল ফসল থাকিলে প্রথমত বৃষ্টির ফোঁটা মাটিকে সরাসরি আঘাত করিতে পারে না এবং অধিক জল মাটিতে শোষিত হয়। দ্বিতীয়ত, এইসকল ফসল মাটিকে বাঁধিয়া রাখে বলিয়া জলের স্রোতে মাটি সহজে ধুইয়া যাইতে পারে না।

ফসল যত ঘন হয় বৃষ্টিকে বাধাদানও তত বেশি কার্যকরী হয়। ঘন বর্ধনশীল ফসলের মূলজনিত রন্ধ্রের ভিতর দিয়া জল সহজে মাটিতে প্রবেশ করে। ইহা ছাড়া উদ্ভিদমূল মাটির গঠন উন্নত করে এবং বৃষ্টিপাতকালে এই গঠন গলে না; ফলে অধিকতর জল মাটিতে শোষিত হয়। উদ্ভিদ মাটিতে কেঁচো এবং অন্যান্য উপকারী জীবের বংশবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে; এইসকল জীব মাটিতে যে সকল রন্ধ্রের সৃষ্টি করে তাহাদের ভিতর দিয়া জল সহজে শোষিত হয়।

ভূমিক্ষয়ের সম্ভাবনা যখন সর্বাপেক্ষা বেশি থাকে তখনই ফসল ঘনতম অবস্থায় থাকা উচিত। কারণ মহারাষ্ট্র রাজ্যে শোলাপুরের গবেষণা কেন্দ্রে লক্ষ্য করা গিয়াছে যে বর্ষাকালে অগাস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে মাটির উপরে যখন কোন ফসল থাকে না বেশির ভাগ ভূমিক্ষয় তখনই হয়। এই সময়ে মাটির উপরে দ্রুত বর্ধনশীল ও ঘন ফসল থাকিলে জল-তাড়িত ভূমিক্ষয় সাফল্যের সহিত নিবারণ করা যায়। শোলাপুর জেলার ২৪ ইঞ্চি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলের উপযোগী এপ্রকার দুইটি ফসল হইল চীনাবাদাম ও বন্য হুলগা (*Atylosia searabaeoides*)। বন্য হুলগা এ অঞ্চলের শিম্বিগোত্রীয় একপ্রকার লতাবিশেষ।

ভূমিক্ষয় নিবারণে শস্য পর্যায়ে আস্তরণ সৃষ্টিকারী ফসলের স্থান খুবই কার্যকরী। শোলাপুরে ১০ বৎসরের গবেষণার ফল হইতে একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। ভূমিক্ষয় নিবারণে কার্যকারিতা অনুসারে নিম্নলিখিত শস্য পর্যায় সমূহ উপর হইতে নিচে সাজানো হইল। উপরে লিখিত ফসল সর্বাধিক কার্যকরী এবং সর্বনিম্নে লিখিত ফসলের কার্যকারিতা সব চাইতে কম।

দেশীয় ঘাস (অকর্তিত)
চীনাবাদাম
পতিত (ফসল বিহীন)
দেশীয় ঘাস (কর্তিত)
বাজরা—তুর (খরিপ) (গ্রীষ্মকাল)
জোয়ার (রবি) (শীতকাল)

লক্ষ করিবার বিষয় এই যে রবি জোয়ারের ভূমি ক্ষয় নিবারণে ক্ষমতা সর্বাপেক্ষা কম, কারণ বর্ষাকালে অগাস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে যখন ভূমিক্ষয় সর্বাধিক

হয় তখন এই ফসল জন্মায় না। কিন্তু এই অঞ্চলে রবি জোয়ারের চাষই বেশি।

সমোন্নতি চাষ (Contour Cultivation)

জমি যে দিকে ঢালু তাহার আড়াআড়িভাবে সকল কর্ষণকার্য ও ফসল রোপণ করা উচিত। সমোন্নতি রেখায় বাঁধ দিয়া চাষ করিলে প্রত্যেক বাঁধের উপরে জলের গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং জল অধিকতর সমভাবে বিতরিত হয়। ফলে অধিকতর জল মাটিতে শোষিত হয়, ভূমিক্ষয় ও গড়ানো জলের পরিমাণ হ্রাস পায়, উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য অধিকতর জল পাওয়া যায় এবং ফলন বৃদ্ধি পায়। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৫৩ সালে উত্তর প্রদেশে লক্ষ্ণৌ জেলায় রহমান খেরা গবেষণা কেন্দ্রে জমির ঢালু দিকে এবং ঢালের আড়াআড়িভাবে ইক্ষুর চাষ করা হয়; দেখা গিয়াছে, ঢালের আড়াআড়িভাবে চাষ অপেক্ষা ঢালের দিকে রোপিত জমিতে ১২ গুণ অধিক ভূমিক্ষয় হইয়াছে এবং ৫ গুণ অধিক জল গড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া ঢালের দিকে চাষ করা জমি অপেক্ষা ঢালের আড়াআড়ি চাষ করা জমিতে আড়াইগুণ অধিক ফলন পাওয়া গিয়াছে।

ফালি চাষ (Strip Cropping)

ঢালের আড়াআড়ি এবং যথাসম্ভব সমোন্নত এক ফালি জমিতে ভূমিক্ষয় সাধক ফসল এবং তার পরের ফালিতে ভূমিক্ষয় রোধক ফসলের চাষকে ফালি চাষ বলে। এই প্রথায় চীনাবাদাম ও সয়াবীন (soyabean) ভূমিক্ষয় রোধক ফসল এবং জোয়ার ও বাজরা ভূমিক্ষয় সাধক ফসলরূপে চাষ করা হয়। একান্তভাবে (alternately) চাষ করিলে ভূমিক্ষয় সাধক ফসলের জমি হইতে ক্ষয়প্রাপ্ত মাটি ভূমিক্ষয় রোধক ফসলের জমিতে আসিয়া জমা হয়।

মহারাষ্ট্র রাজ্যে শোলাপুর মৃত্তিকা সংরক্ষণ গবেষণা কেন্দ্রে বাজরা ও তুর (উভয়েই ভূমিক্ষয় সাধক), চীনাবাদামের (ভূমিক্ষয় রোধক) সহিত ফালি চাষ করিয়া ভূমিক্ষয় অর্ধেক পরিমাণে হ্রাস করা সম্ভব হইয়াছে এবং একর প্রতি প্রায় পাঁচ হাজার পাউণ্ড চীনাবাদাম বেশি ফলিয়াছে।

সমোন্নতি রেখায় বাঁধ (Contour Bunding)

ভূমিক্ষয় নিবারণে সমোন্নতি রেখায় বাঁধ খুবই কার্যকরী। বাঁধ যাহাতে ভাঙ্গিয়া না যায় সেজন্য বাঁধের জলনিকাশী নালা বরাবর একটু ঢাল রাখিতে হয়। অতিরিক্ত জল বাহির হইবার জন্য পথ করিয়া দিতে হয়। মহারাষ্ট্র রাজ্যে এই প্রকার বহু বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। বেলে ও দোআঁশ মাটিতে এই প্রকার বাঁধ খুবই সফল হইয়াছে কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ এঁটেল মাটিতে সফল হয় নাই। নিম্ন বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলে সমোন্নতি রেখায় বাঁধ দিয়া শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ ফলন বৃদ্ধি আশা করা যায়।

বাঁধের প্রধান অসুবিধা হইল যে ইহা প্রায়ই ভাঙ্গিয়া যায়। বাঁধ একেবারে না থাকা অপেক্ষাও ভাঙ্গা বাঁধ অধিক ক্ষতিকারক, কারণ বাঁধের পিছনে যে জল জমা হয় তাহার ভূমিক্ষয় ক্ষমতা অনেক বেশি। নিম্নলিখিত যে কোন কারণে বাঁধ ভাঙ্গিতে পারে :

(১) যে প্রকার তীব্র বৃষ্টিপাত অনুমান করিয়া বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা অধিক তীব্র বৃষ্টি হইলে ;

(২) বাঁধের কোন নিম্ন অংশের ভূমি জলে সংপৃক্ত হইয়া দুর্বল হইয়া পড়িলে ;

(৩) দাঁড়ানো জল বাহির করিয়া দিবার জন্য কৃষক ইচ্ছাকৃত ভাবে বাঁধ কাটিলে ;

(৪) বাঁধে ইঁদুর ও অন্যান্য প্রাণী গর্ত করিলে ;

(৫) বাঁধের আড়াআড়িভাবে গো-মহিষ, ছাগলাদি চলাচল করিলে ;

(৬) বাঁধের আড়াআড়িভাবে গো-গাড়ী, মোটরযান বা লরি চলাচল করিলে ;

(৭) বাঁধের অতি নিকটে লাঙ্গল চালাইলে এবং সেইহেতু বাঁধ দুর্বল হইয়া পড়িলে ;

(৮) বাঁধ যথাযথ রক্ষণের ব্যবস্থা না হইলে (চিত্র নং ৯)।

খাদ সংস্কার (Reclamation of Gullies)

চাষের জমি ও তৃণভূমিকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষার জন্য খাদ

চিত্র নং ৯। মৃত্তিকা ও জল সংরক্ষণের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া কৃষকগণ নিজেরাই যখন বাঁধ নির্মাণ করিবে তখনই বাঁধ যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইবে।

[ROY L. DONAHUE মহাশয়ের সৌজন্যে]

সংস্কার করা দরকার। প্রথমে খাদের মধ্য দিয়া যে জল প্রবাহিত হয় তাহাকে খাদের মুখের উপরে বাঁধ দিয়া অন্য দিকে প্রবাহিত করিতে হইবে। তারপর খাদের মধ্যে ঘাসের চাপড়া, ঝোপঝাড় বা টুকুরা পাথরের সাহায্যে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে হইবে (চিত্র নং ১০, ১১)। অতঃপর খাদের খাড়া পার্শ্ব ও মুখ ঢালু করিয়া চাঁছিতে হইবে এবং ঝুরা মাটি বাঁধের উপরে দিতে হইবে। আশুবর্ধনশীল উদ্ভিদ, ঘাস, লতা ইত্যাদি বাঁধের ঝুরা মাটিতে এবং খাদের মুখে ও পার্শ্বে রোপণ করিতে হইবে। গো-মহিষাদি যাহাতে এই সকল উদ্ভিদ বিনাশ করিতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। জমি যদি উর্বর না হয়, উদ্ভিদের যথাযথ বৃদ্ধির জন্য খামারজাত সার, কম্পোস্ট, রাসায়নিক সার ইত্যাদি প্রয়োগ করিতে হইবে। এই সকল উদ্ভিদ বেশ বাড়িয়া উঠিলে জল অন্যদিকে প্রবাহিত করিবার জন্য যে বাঁধ দেওয়া হইয়াছিল তাহা কাটিয়া জল রক্ষিত খাদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে দেওয়া যায়।
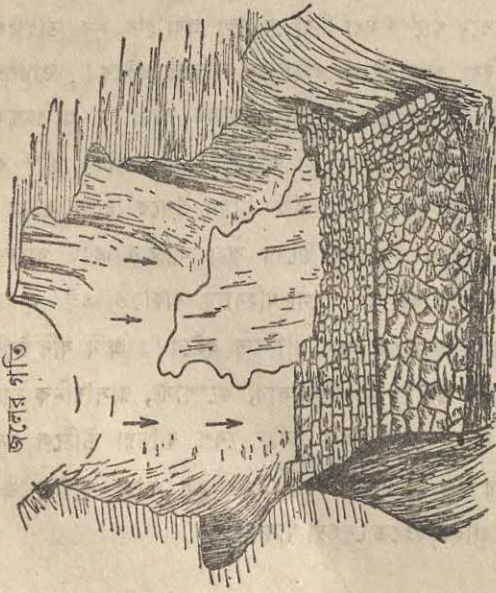
চিত্র নং ১০। প্রস্তর নির্মিত শিথিল বাঁধের সাহায্যে খাদ সংস্কার। বাঁধের এক ফুট বা তদধিক অংশ খাদের দুই দেওয়ালে ঢুকাইয়া দেওয়া আবশ্যক। খাদের জল যাহাতে বাঁধের মধ্যভাগ দিয়া প্রবাহিত হয় এবং বাঁধের দুই প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত না হয় সেজন্য বাঁধের মধ্যভাগ একটু নিচু করিয়া তৈয়ার করিতে হয়।

[USDA HANDBOOK No. 61, 1954 : হইতে পুনরঙ্কিত।]

খাদের মাথা ঢালু ও ঘাসের চাপড়া দ্বারা আবৃত

জলের গতি

প্রান্তজলের সম্ভাব্য উচ্চতা হইতে ন্যূনপক্ষে ৬" উপরে

ঘাসের চাপড়ার বাঁধের মধ্যাংশ খাদের তলদেশের সামান্য নীচে

উর্বরমাটির স্তর
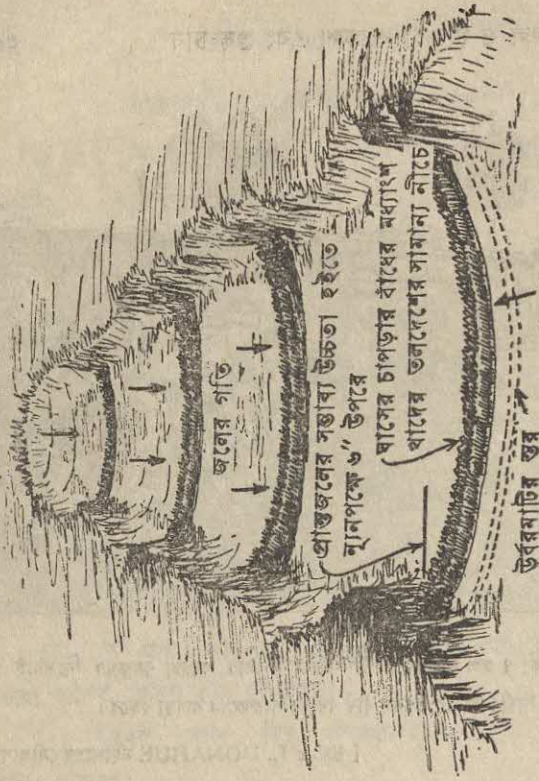
অগভীর খাদে স্থাপিত ঘাসের চাপড়া

চিত্র নং ১১। খাদের আড়াআড়িভাবে ঘাসের চাপড়ার বাঁধ দিয়া খাদ সংস্কার। বাঁধের মধ্যস্থল দিয়া জল প্রবাহের জন্য বাঁধের মধ্যভাগ সর্বদাই নিচু করিয়া তৈয়ার করিতে হয়।

[USDA HANDBOOK No. 61, 1954. হইতে পুনরঙ্কিত।

বায়ু-তাড়িত ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ (Control of Wind Erosion)*

রাজস্থানের বর্তমান মরুভূমির এক বৃহৎ অংশ এককালে বহু নদীসিঞ্চিত উর্বর ভূমি ছিল। ঘাস, গুল্ম ও বৃক্ষাদির অবিরাম বিনাশের ফলে একদা বৃক্ষাদি আবৃত এক বৃহৎ ভূমিখণ্ড বর্তমানে মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। প্রায়ই সেখানে প্রবল বায়ু তাড়নায় বালি উড়িয়া গিয়া রেল লাইন ও বাড়ীঘর আবৃত করিয়া ফেলে।

পশ্চিম ও উত্তর রেলওয়ে সংস্থা এবং রাজস্থানে যোধপুর মরুভূমি বনীকরণ (afforestation) ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ কেন্দ্র রেল লাইন বরাবর বালিকে সংযত করিবার জন্য একটি পরিকল্পনা করিয়াছেন।† ১৯৫৪ সালে বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ ও গুল্ম রোপণ করা হয় এবং গোমহিষাদির কবল হইতে বৃক্ষাদি বড় হইবার পূর্বে রক্ষার উদ্দেশ্যে ঐ অঞ্চলকে পাঁচ ফুট উচ্চ কাঁটা ঝোপের বেড়া দিয়া ঘিরিয়া রাখা হয়। শুষ্ক ঋতুতে যে দিকে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহার আড়াআড়িভাবে চার ফুট অন্তর লাইন করিয়া মাটির উপরে কাঁটা ঝোপ বসানো হয়। নিম্নলিখিত বৃক্ষ ও গুল্মাদি সাফল্যের সহিত রোপণ করা হয়ঃ

ঝন্দ (খেজরি) (*Prosopis spicigera*), মেসকুইট (*Prosopis juliflora*), বাবলা (*Acacia arabica*), ঝাউ (*Tamarix ai ticulate*), নিম (*Azadirachta indica*), পিপল (*Ficus religiosa*), কিউমত (*Acacia senegal*), কুল (*Zizyphus jujuba*), ফোগ (*Calligonum polygonaides*), আনওয়াল (*Cassia articulate*), ও খিম্প (*Leptadenia spartium*)।

প্রথম দুই বৎসর বেড়া দেওয়া ঝোপঝাড় বসানো ও বৃক্ষরোপণে মাইল পিছু বাৎসরিক ২৫০০ টাকা ব্যয় হয়। ইহার পর রক্ষণাবেক্ষণের বাৎসরিক খরচ পড়ে মাইল পিছু ১০০০ টাকা। রেললাইন হইতে বালি সরাইতে যে পরিমাণ ব্যয় হয়, লাইন বরাবর বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে তাহার

---

* Adopted from ; Prakash Mahendra, "Conservation of Shifting Sands Along Railway Lines in Rajasthan Desert," Journal of Soil & Water Conservation in India Vol. 6, No. 4, July 1957.

† In. 1959, renamed the Arid Zone Reserch Station.
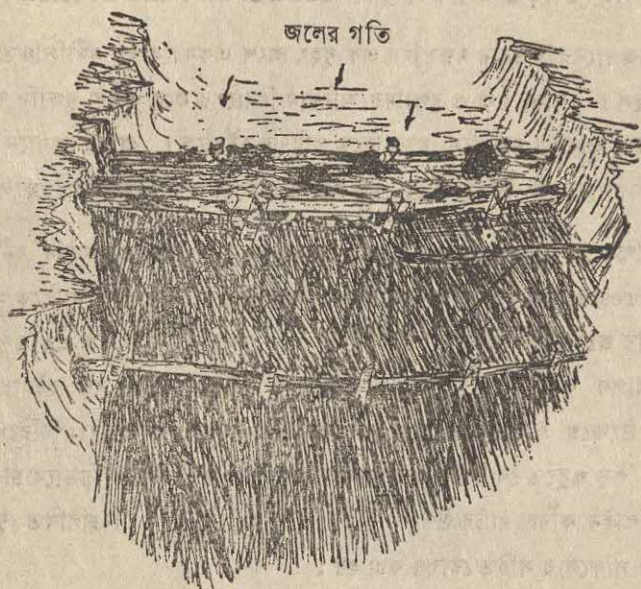
চিত্র নং ১২। বনভূমি অঞ্চলে ঝোপঝাড়ের আধিক্য থাকে। ঐ সকল অঞ্চলে ঝোপঝাড়ের বাঁধ তৈয়ার করিয়া খাদ সংস্কার করা যায়। বাঁধের মধ্যস্থল নিচু হইবে এবং উভয় প্রান্ত খাদের দেওয়ালের ভিতর অন্তত এক ফুট ঢুকাইয়া দিতে হইবে এই সকল ঝোপঝাড় পচিবার পর খাদ রক্ষণের জন্য যথাস্থানে ঘাস, গুল্ম ও বৃক্ষাদি রোপণ করিতে হইবে।

[USDA HANDBOOK No. 61, 1954, হইতে পুনরঙ্কিত]

অর্ধেকেরও কম খরচ পড়ে। ইহা ছাড়া বৃক্ষ ও গুল্মাদি হইতে পশুখাদ্য ও জ্বালানি পাওয়া যায়।

মৃত্তিকা ও জল সংরক্ষণের ফলাফল

(Practical Results of Soil and Water Conservation)

পাঞ্জাবে পাতিয়ালার নিকটে ১৯৩৬ সালে মৃত্তিকা সংরক্ষণের কাজ আরম্ভ

হয় এবং ১৯৪৭ সালের মধ্যে প্রায় ৪,০০,০০০ একর জমিতে মৃত্তিকা সংরক্ষণ প্রক্রিয়াদি অবলম্বন করা হয়। প্রক্রিয়াসমূহ হইল :

১। নিয়ন্ত্রিত গোচারণ ;

২। বৃক্ষাদি রোপণ ;

৩। নাতি ঢালু জমিতে সমোন্নতি রেখায় বাঁধ নির্মাণ ;

৪। খাদ, নালা ও খালে প্রতিবন্ধক বাঁধ নির্মাণ।

এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্বে জলপীঠ প্রতি বৎসর নয় ইঞ্চি করিয়া নামিয়া যাইতেছিল ; এখন তাহা প্রতি বৎসর ছয় ইঞ্চি করিয়া উপরে উঠিতেছে। যে সকল কূপ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল সেগুলিতে পুনরায় জল জমা হইতেছে। ভূমিক্ষয় জনিত যে মৃত্তিকা কণিকা নদী ও জলাশয়কে ভরাট করিয়া ফেলিত তাহা এখন যথাস্থানে থাকিয়া প্রয়োজনীয় বৃক্ষ, গুল্ম ও ফসল উৎপন্ন করিতেছে।*

শুষ্ক চাষ (Dry Farming)†

স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে সেচ ব্যতিরেকে ফসল উৎপাদনের প্রথাকে 'শুষ্ক চাষ' বলে। ঐ সকল অঞ্চলে বৎসরে সচরাচর ২০ হইতে ৪০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়।

প্রায়-বিশুষ্ক (semi arid) অঞ্চলে বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল ফসল উৎপাদনের প্রধান সমস্যা হইল দুষ্প্রাপ্য বৃষ্টির জল সংরক্ষণ এবং তৎসম্পর্কীয় অপর সমস্যা হইল ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ। উভয় সমস্যাই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ; কারণ মোট বৃষ্টিপাত যত কম হয়, ততই তাহা অনিশ্চিত ও অনিয়মিত হয়। প্রায় বিশুষ্ক শুষ্ক চাষ অঞ্চলে অনিয়মিত তীব্র বৃষ্টিপাত ও অনাবৃষ্টি উভয়ই অতি সাধারণ ব্যাপার।

---

* Singh, Balwant, "Forest Means Water", Journal of Soil & Water Conservation in India. Vol. 4, No. 3, April 1956.

† Adapted from ; Basu, J. K. The I. C. A. R. Silver Jubilee Souvenir 1929-54. I. C. A. R, New Delhi.

শুষ্ক চাষে সাফল্য লাভ করিতে হইলে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ অনুসরণ করা উচিত :

১। বিভিন্ন শুষ্ক ফসলের জন্য যথাযথ জমি নির্বাচন ; যেমন জোয়ারের জন্য হিউমাসে সমৃদ্ধ গভীর কৃষ্ণ মৃত্তিকা প্রশস্ত (চিত্র নং ১৩) ;

২। ভূমিক্ষয় হ্রাস ও গড়ানো জল নিয়ন্ত্রণের জন্য সমোন্নতি রেখায় বাঁধ নির্মাণ ;

৩। ভূমিক্ষয় হ্রাস ও অধিক বৃষ্টির জল মাটিতে শোষিত হইবার উদ্দেশ্যে সমোন্নতি চাষ ;

৪। ঐ অঞ্চলে উৎপন্ন ফসলের বীজ ব্যবহার ;

৫। একর পিছু বীজের হার হ্রাস ও ফসল অপেক্ষাকৃত দূরে দূরে রোপণ ;

৬। মৃত্তিকার গঠন উন্নয়ন, জলের অনুস্রবণ বৃদ্ধি ও বৃক্ষখাদ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে খামারজাত সার, কম্পোস্ট ও রাসায়নিক সারের প্রয়োগ ;
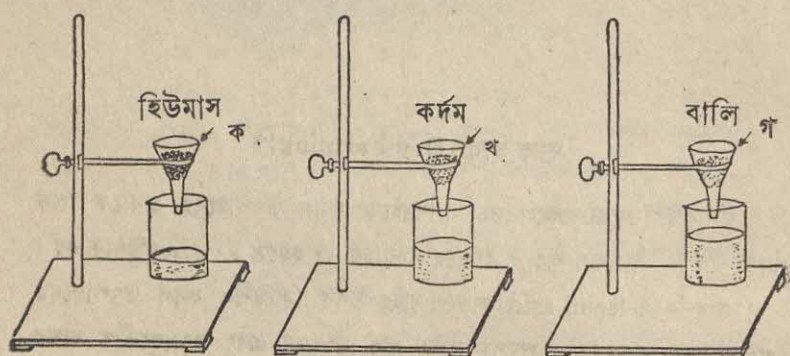
চিত্র নং ১৩। মৃত্তিকায় কর্দম ও জৈব পদার্থের পরিমাণের উপর মৃত্তিকার জলধারণ ক্ষমতা নির্ভর করে। উপরের প্রত্যেকটি ফানেলে একই পরিমাণ জল প্রয়োগ করা হইয়াছে ; কিন্তু ফানেল "ক"-স্থিত হিউমাস, ফানেল "খ"-স্থিত কর্দম অপেক্ষা বেশি জল ধরিয়া রাখিয়াছে এবং কর্দম আবার ফানেল "গ"-স্থিত বালি অপেক্ষা অধিক জল ধরিয়া রাখিয়াছে। শুষ্ক চাষ অঞ্চলে কৃষিতে সাফল্য অর্জন করিতে হইলে হিউমাসে (জৈব পদার্থে) সমৃদ্ধ এঁটেল মাটি নির্বাচন করিতে হইবে এবং জমিতে জৈব পদার্থ বজায় রাখিতে হইবে ; কারণ একমাত্র এই প্রকার জমিই দুইটি বৃষ্টির মধ্যবর্তী সময়ে ফসল বৃদ্ধির উপযুক্ত পরিমাণ জল ধরিয়া রাখিতে পারে [NARAYANAN হইতে পুনর্মুদ্রিত]।

৭। গড়ানো জল (run-off water) ও ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ভূমিক্ষয়সাধক ফসল, যেমন জোয়ারের সহিত ভূমিক্ষয়রোধক ফসল, যেমন চীনাবাদামের সমোন্নত জমিতে ফালি চাষ ;

৮। শস্য পর্যায় অনুসরণ ও জমি অনাবাদী রাখা, যেমন এক বৎসর তণ্ডুল শস্যের পরে শিম্বিগোত্রীয় ফসলের চাষ এবং পর বৎসর জমি অনাবাদী ফেলিয়া রাখা ; ইহাতে মৃত্তিকার জল ও উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।

১৯৫৭ সালে রাজস্থানের যোধপুরে মরুভূমি বনীকরণ ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। রাষ্ট্রসংঘের সাহায্যে ১৯৫৯ সালে এই কেন্দ্রকে আরও সম্প্রসারণ করা হয় এবং নাম পাল্টাইয়া 'বিশুষ্ক অঞ্চল গবেষণা প্রতিষ্ঠান' (Arid Zone Research Institute) নাম রাখা হয়। শুষ্ক চাষের বহু সমস্যা সম্পর্কে এই কেন্দ্রে অনুসন্ধান চালানো হয়।

ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ (Indian Council of Agricultural Research) কর্তৃক অনুমোদিত কো-অর্ডিনেটেড স্কীমের আওতায় ১৯৩৩ সাল হইতে ১৯৪৩ সালের মধ্যে মহারাষ্ট্র রাজ্যের শোলাপুরে এবং মহীশূর রাজ্যের হাগারি, বিজাপুর ও রাইচুরে শুষ্ক চাষ ও মৃত্তিকাসংরক্ষণ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গবেষণা চালানো হয়। স্কীমের মেয়াদ শেষ হইয়া যাওয়ার পরেও মহারাষ্ট্র রাজ্যে গবেষণা চালাইয়া যাওয়া হয় এবং বহু মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিশ্বভারতীতে, গুজরাটের সৌরাষ্ট্রে এবং বিন্ধ্য প্রদেশেও অনুরূপ গবেষণা কার্যে হাত দেওয়া হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

প্রয়োজনীয় মনুষ্য খাদ্য ও পশু খাদ্য উৎপাদনের উপযোগী উর্বর জমির পরিমাণ ভারতে পর্যাপ্ত নয়। প্রতি তিন একরে প্রায় দুই একর জমি ভূমিক্ষয়ের ফলে অনুর্বর হইয়া পড়িয়াছে। ভূতত্ত্বীয় ক্ষয় বন্ধ করা সম্ভব নয়, কিন্তু মনুষ্য-সৃষ্ট জল ও বায়ু তাড়িত ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে।

জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করিয়া, আস্তরণসৃষ্টিকারী ফসলের চাষ, সমোন্নতি চাষ ও ফালি চাষ করিয়া, সমোন্নতি রেখায় বাঁধ দিয়া ও খাত সংস্কার করিয়া জল

তাড়িত ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মাটির উপরে ঝোপঝাড় বসাইয়া ও মরু অঞ্চলের উপযোগী বৃক্ষ রোপণ করিয়া বায়ু-তাড়িত ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে সেচবিহীন চাষের প্রথাকে শুষ্ক চাষ বলে। সমোন্নতি রেখায় বাঁধ নির্মাণ ভূমিক্ষয় রোধক ও অনাবৃষ্টিরোধক ফসল নির্বাচন ও সমোন্নত জমিতে ফালি চাষ প্রভৃতি শুষ্ক চাষের অনুমোদিত প্রথা।

প্রশ্ন

১। ভারতে ভূমিক্ষয় কত গুরুতর ?

২। মৃত্তিকা সংরক্ষণের সংজ্ঞা কি ?

৩। একটি উত্তম ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিস্তারিত বর্ণনা কর।

৪। বায়ুতাড়িত ক্ষয় কি করিয়া নিঃন্ত্রণ করা যায় ?

৫। শুষ্ক চাষ অঞ্চলের অনুমোদিত প্রথাসমূহ কি কি ?

সহায়ক পুস্তক

Donahue, Roy L., *Our Soil and Their Management—An Introduction to Soil and Water Conservation*, The Interstate, Danville, Illinois, U. S. A. Second Edition, 1961

Foster, Albert B, *Approved Practices in Soil Conservation*, The Interstate, Danville, Illinois, U. S. A., 1955

Godkary, D. A., *A Manual on Soil Conservation*, Bulletin No. 191, Department of Agriculture, Maharashtra State 1956

Stallings, J. H., *Soil : Use and Improvment*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1957.

United States Department of Agriculture, "*A Manual on Conservation of Soil and Water*," Handbook No. 61, 1954, Washington, D, C.

তৃতীয় অধ্যায়

সেচ ও জল নিষ্কাশন

(Irrigation and Drainage)

সেচ বা জলসেক (**Irrigation**)

ফসলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে মাটিতে জল প্রয়োগ করাকে সেচ বা জলসেক বলে। ভারতে কৃষকগণ প্রায় দুই হাজার বৎসরের অধিককাল ধরিয়া তাহাদের ফসলে জলসেচন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক অধিকাংশ পদ্ধতিই বিশেষ কার্যকরী ছিল না। অধিকতর জমি সেচের আওতায় আনয়ন এবং একর পিছু ফলন বৃদ্ধি করিতে হইলে নিম্নলিখিত দশটি সুপারিশ অনুসরণ করা আবশ্যক :

(১) **জলের সুবিধা**—সেচের জল সরবরাহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে খাল, কূপ ও জলাশয়ের সংখ্যা ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(২) **জলের অপচয়**—জলের উৎস হইতে ফসলের জমি পর্যন্ত জল বহন কালে জলের অপচয় হ্রাস করিতে হইবে।

(৩) **জল উত্তোলন**—শক্তি, ফসল ও মাটি অনুসারে সর্বোত্তম জল উত্তোলন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) **সেচ পদ্ধতি**—জলের সরবরাহ, ফসল, মাটি ও জমির ঢাল অনুসারে সর্বোত্তম জল সেচন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে।

(৫) **জল প্রয়োগ**—যথা সময়ের ব্যবধানে প্রয়োজন অনুযায়ী জল প্রয়োগ করিতে হইবে।

(৬) **বহুফসলের চাষ**—সেচ জলের অভাব না থাকিলে একই জমিতে প্রতি বৎসর দুই বা ততোধিক ফসলের চাষ করিতে হইবে।

(৭) **ফসলের জাত**—উৎকৃষ্টতম জাতের চাষ করিলে নিকৃষ্টতম জাত অপেক্ষা ফলন প্রায় দ্বিগুণ হয়।

(৮) **পর্যাপ্ত সার প্রয়োগ**—উদ্ভিদ দেহে শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ জল ও ৫ ভাগ খণিক পদার্থ থাকে। সেচ প্রয়োগে ফসলের সারের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অধিকতর পরিমাণে জৈব সার ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিয়া ফসলের এই চাহিদা পূরণ করিতে হইবে।

(৯) **কর্ষণ প্রক্রিয়া**—সেচ প্রয়োগে আগাছার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ধ্বংস না করিলে ইহারা ফসলের প্রাপ্য জল ও পোষক পদার্থ সমূহ লুণ্ঠন করিয়া থাকে।

(১০) **ফসল রক্ষণ**—কীটশত্রু, রোগ, পাখি, ইঁদুর, বা বন্য পশুর হাত হইতে রক্ষার ব্যবস্থা না করিলে সেচ প্রয়োগে ফসলের ফলন বৃদ্ধির কোন অর্থ হয় না।

প্রথমোক্ত পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হইতেছে। অবশিষ্ট পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে এই পুস্তকের অপর খণ্ডে আলোচনা করা হইয়াছে।

জলের সুযোগ (Water Facilities)

পৃথিবীর বৃহৎ দেশগুলির যে কোনটি অপেক্ষা ভারতে মোট জলের পরিমাণ অনেক বেশি; কিন্তু তবুও জলের ঘাটতি এদেশের একটি প্রধান সমস্যা। ভারতে তাপমাত্রা সারা বৎসর ফসল উৎপাদনের উপযোগী, কিন্তু বৃষ্টিপাতের বণ্টন সন্তোষজনক নয়। ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে মোট বৃষ্টিপাতের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ জুন হইতে সেপ্টেম্বর, এই চার মাস বা ততোধিক অল্প স্বল্প কালের মধ্যে সংঘটিত হয়। বৃষ্টিপাতের এই প্রকার প্রতিকূল বণ্টনের ফলে সেচ ব্যতীত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করিয়া বৎসরে কেবল একটি ফসল উৎপাদন করা যায়। প্রতি বৎসর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফসল উৎপাদন করার জন্য নদী, কূপ, খাল বা জলাশয় হইতে জল সেচন করার একান্ত দরকার।

পৃথিবীর জলসিক্ত মোট জমির প্রায় এক চতুর্থাংশ পরিমাণ জমিতে ভারতে জলসেচন করা হয়। ১৯৫৩-৫৪ সালে ভারতে মোট ৫ কোটি ৩৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচন করা হয়; সেক্ষেত্রে ১৯৬০-৬১ সালে মোট ৮ কোটি ৭০ লক্ষ

একর জমিতে জলসেচন করা হয়। হিসাব করিয়া দেখা যায় যে ১৯৫১ সালে নদীর জলের শতকরা ৮·৫ ভাগ মাত্র জলসেচনে ব্যবহার করা হয়; সেক্ষেত্রে ১৯৬১ সালে নদীর জলের শতকরা প্রায় ১৯ ভাগ জলসেচনে ব্যবহৃত হয়।*

ভারতে সেচজল প্রধানত নদী হইতে খালের সাহায্যে এবং কূপ ও জলাশয় হইতে সংগৃহীত হয়। উত্তর প্রদেশে সর্বাধিক জমিতে জলসেচন করা হয়। এই রাজ্যে ১ কোটি ২৫ লক্ষ একর জমিতে তথা ভারতের মোট জলসিক্ত জমির শতকরা ২৩ ভাগেরও বেশি জমিতে জলসেচন করা হয়। উত্তর প্রদেশের পরে পাঞ্জাবের স্থান। তাহার পর ক্রমানুসারে অন্ধ্রপ্রদেশ, মাদ্রাজ, বিহার, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও পশ্চিম বঙ্গের স্থান। জম্মু ও কাশ্মীর এবং কেরালা বাদে অবশিষ্ট সকল রাজ্যে জলসিক্ত জমির পরিমাণ দশ লক্ষের উপর।

বৃহৎ বাঁধ নির্মাণ করিয়া এবং আরও কূপ, জলাশয় ও খাল খননে সহায়তা করিয়া ভারত দ্রুতগতিতে তাহার সেচ জলের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে।

জলের অপচয় (Losses of Water)

সমাজ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত "Better Use of Land" নামক পুস্তিকায় বলা হইয়াছে, "অধিকাংশ জলসিক্ত অঞ্চলে নদী ও খাল হইতে জল বহন কালে অর্ধেক জল নষ্ট হয় এবং উদ্ভিদের মূলদেশে পৌঁছিবার পূর্বে জমিতে প্রযুক্ত জলের অর্ধেকের অপচয় ঘটে।" অর্থাৎ সেচ জলের এক চতুর্থাংশ মাত্র ফসল গ্রহণ করে। জলের এই অপচয় কি হ্রাস করা যায় না? সেচবিশারদ-গণের মতে এ অধ্যায়ে প্রদত্ত তথ্য সমূহ প্রয়োগ করিয়া এই অপচয় অনেকাংশে হ্রাস করা যায়।

নিম্নলিখিতভাবে সেচজলের অপচয় ঘটে (চিত্র নং ১৪):

(১) জলের উপরিতল, যেমন নদী ও জলাধার হইতে বাষ্পীভবন হেতু জলের অপচয়;

(২) জলের উৎস হইতে জমিতে বহনপথে মাটিতে ক্ষরণ (seepage) হেতু জলের অপচয়;

---

* হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে প্রতি বৎসর ভারতের বিভিন্ন নদী দিয়া যে পরিমাণ জল প্রবাহিত হয় তাহা ভারতের সর্বত্র জমির উপরে সমভাবে বিস্তার করিয়া দিলে, সমগ্র দেশ ২০ ইঞ্চি জলের নিচে ডুবিয়া থাকিবে।
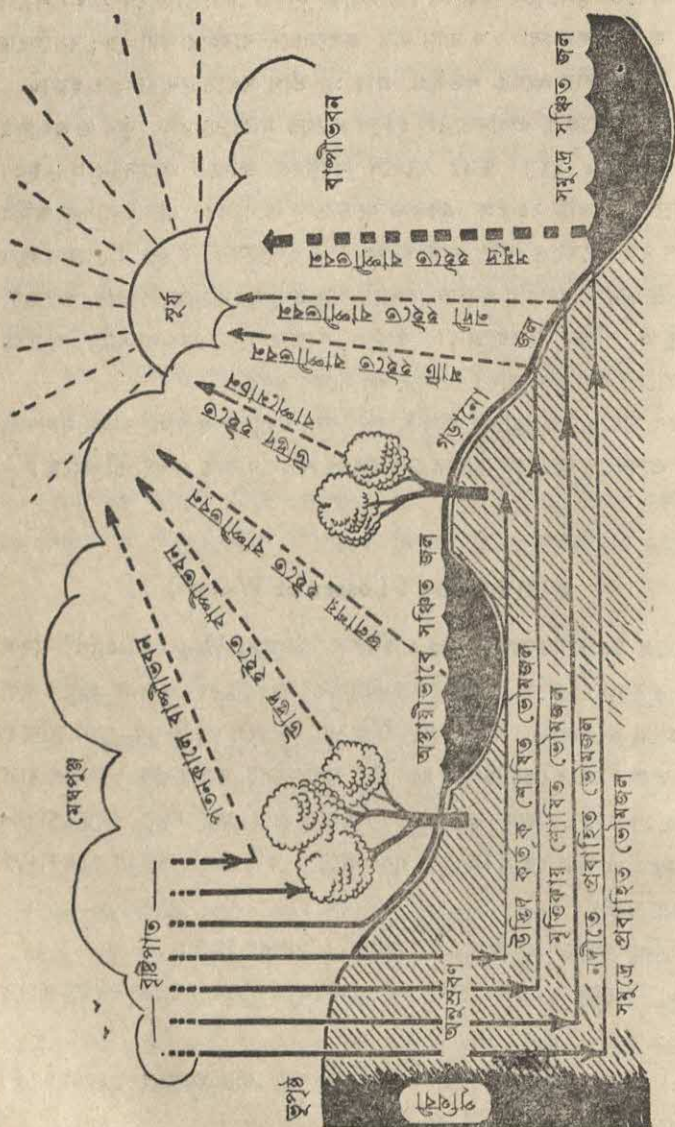
চিত্র নং ১৪। বৃষ্টিপাত হেতু জল কখনও স্থির থাকে না। ইহা সর্বদাই চলিতে থাকে। এই চলনকে জলচক্র (water cycle) বলে।
[SOIL CONSERVATION SERVICE : হইতে পুনরঙ্কিত]।

(৩) অতি-সেচ (over-irrigation), আগাছার মাধ্যমে বাষ্পমোচন, মাটির উপরিভাগ হইতে বাষ্পীভবন হেতু জমিতে জলের অপচয়।

জলের উপরোক্ত প্রত্যেক প্রকার অপচয় ও তাহা হ্রাস করিবার পদ্ধতি সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে।

বাষ্পীভবন হেতু অপচয় (Evaporation Losses)

নদী ও জলাধার হইতে বাষ্পীভবন হেতু প্রচুর জলের অপচয় ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ মধ্যভারতে অন্ধ্রপ্রদেশের নিজামসাগরে বাষ্পীভবন হেতু প্রতি বৎসর ৫·৫ ফুট জলের অপচয় ঘটে।

প্রধানত উচ্চ তাপমাত্রা, প্রবল বায়ু, নিম্ন আর্দ্রতা (humidity) প্রভৃতি কারণ জলের উপরিতলের বাষ্পীভবনকে প্রভাবিত করে। যেহেতু জলবায়ু সম্পর্কিত কারণসমূহ বাষ্পীভবনকে প্রভাবিত করে সেহেতু অনেকের ধারণা আছে যে জলের এই অপচয় রোধ করা সম্ভব নয়; কিন্তু ইহা সত্য নয়।

জলের উপরিতল হইতে বাষ্পীভবন ঘটে। জলের উপরিতলের ক্ষেত্রফল হ্রাস করাই হইল এই সমস্যার সমাধান। কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ জলের জন্য জলাধার যত গভীর হইবে জলের উপরিতলের ক্ষেত্রফলও তত কম হইবে। যেমন একটি পাত্রের অভ্যন্তরভাগের মাপ হইল ১ ফুট প্রস্থ, ১ ফুট দীর্ঘ ও ১ ফুট গভীর। ইহাতে ১ ঘনফুট জল ধরে এবং ১ বর্গফুট উপরিতল বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে আসে এবং তথা হইতে বাষ্পীভবন হয়। অপর একটি পাত্রের অভ্যন্তরভাগের মাপ যদি ০·৫ ফুট প্রস্থ, ১ ফুট লম্বা ২ ফুট, গভীর হয় তাহাতেও ১ ঘনফুট জল ধরিবে, কিন্তু ০·৫ বর্গফুট জলের উপরিতল মাত্র বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে আসিবে এবং বাষ্পীভবন হেতু জলের অপচয় অর্ধেক হ্রাস পাইবে। একই ভাবে জলাধার বা জলাশয় যত গভীর হইবে, কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ জলের তত কম উপরিতল বায়ু-মণ্ডলের সংস্পর্শে আসিবে এবং বাষ্পীভবন হেতু জলের অপচয়ও হ্রাস পাইবে।

ক্ষরণ হেতু অপচয় (Seepage Losses)

প্রধান খাল হইতে জমিতে বহন করিবার পথে প্রচুর জলের অপচয় ঘটে। নালার বাঁধে ফাটল বা কোন প্রাণী কর্তৃক সৃষ্ট ছিদ্রের মাধ্যমে বা সরন্ধ্র

(porous) মাটির ভিতর দিয়া ক্ষরণ হেতু জলের এই প্রকার অপচয় হয়। শিলা যুক্ত বা বেলে মাটিতে এই প্রকার অপচয় সবচাইতে বেশি হয়। ক্ষরণ হেতু অপচয় হ্রাস করিতে হইলে এই প্রকার মাটিতে নালাগুলির অভ্যন্তরভাগ এঁটেল মাটি দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হয়। নালার মধ্যে জলজ উদ্ভিদ জন্মিলে জলের গতিবেগ কমিয়া যায়, ফলে নালার জল বহন ক্ষমতাও হ্রাস পায়। ইহা ছাড়া নালায় জন্মানো আগাছার মাধ্যমেও প্রচুর জল বাষ্পমোচনে অপচয় হয়। ক্ষরণ জনিত ক্ষয় মাত্রা ছাড়াইয়া গেলে নালার অভ্যন্তরভাগ এঁটেল মাটি দ্বারা আবৃত করিয়া দিতে হইবে।

জমিতে অপচয় (Field Losses)

জমির ক্ষেত্রফলের ভিত্তিতে জলকর দেওয়ার নিয়ম থাকিলে, অনেক সময় কৃষক অতিরিক্ত জল জমিতে প্রয়োগ করে, ফলে জলের অপচয় হয়, জলপীঠ অত্যধিক উঁচুতে উঠিয়া আসে এবং লবণ হেতু ফসলের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ইহার ফলে ফসলের ফলন হ্রাস পায়।

মহারাষ্ট্র রাজ্যের খাল সিঞ্চিত অঞ্চলের কৃষক ইক্ষু বা কলার জন্য একর পিছু বার্ষিক টা. ১২০·০০ জলকর দেয় ; ফলের গাছ বা লুসার্ন-এর জন্য একর পিছু বার্ষিক টা. ৬০·০০ জলকর দেয়, সব্জির জন্য একর পিছু আটমাসে টা. ৩২·০০ জলকর দেয় এবং খরিপ ও রবি ধানের জন্য একর পিছু প্রত্যেক ফসলের জন্য টা. ১৩·০০ জলকর দেয়।

কৃষক যেহেতু ক্ষেত্রফলের ভিত্তিতে জলকর দেয় জলের পরিমাণের ভিত্তিতে দেয় না,* সেহেতু সঠিক পরিমাণ সেচজল প্রয়োগের কোন উৎসাহ দেখা যায় না। অধিক জল প্রয়োগ করিলেও যেহেতু অধিক ব্যয় করিতে হয় না, সেজন্য প্রত্যেক বারেই অত্যধিক জল প্রয়োগ করিবার দিকে কৃষকের প্রবণতা থাকে। কাজেই বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশে যেমন করা হয়, সেভাবে সেচজল মাপিয়া দিলে

---

* আয়তনের ভিত্তিতে জল সাধারণত একর-ইঞ্চি বা একর-ফুট হিসাবে মাপা হয়। এবং এক একর জমির (৪৩,৫৬০ বর্গ ফুট) উপরে এক ইঞ্চি গভীর জল দাঁড়াইলে এক একর-ইঞ্চি আয়তনের জল হয় ; অনুরূপভাবে এক একর জমির উপরে এক ফুট জল দাঁড়াইলে এক একর-ফুট জল হয়।

এবং জলের প্রকৃত পরিমাণ অনুসারে মূল্য আদায় করিলে এ সমস্যার সমাধান করা যায়।

জলসিক্ত জমিতে অবাধে আগাছা জন্মিতে থাকিলে উহারা প্রচুর জল শোষণ করে। এই জল ফসল ব্যবহার করিতে পারিত। কর্ষণ করিয়া, নিড়ানি চালাইয়া, উৎপাটন করিয়া বা আগাছা-নাশক ঔষধ প্রয়োগে আগাছাকে ধ্বংস করাই হইল এই সমস্যার সমাধান।

জলসিক্ত জমিতে আর্দ্র মাটির উপরিপৃষ্ঠ হইতে বাষ্পীভবনের ফলে প্রচুর জলের অপচয় ঘটে। ফসলকে দ্রুত বর্ধনে উদ্দীপ্ত করিলে ফসল যত শীঘ্র সম্ভব মাটির উপর ছায়া ফেলিবে এবং মাটির উপরিপৃষ্ঠ কোন-প্রকার জৈবপদার্থ দ্বারা আবৃত করিয়া এই অপচয় হ্রাস করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ অন্ধ্র প্রদেশের রাজামুণ্ডিতে কেন্দ্রীয় তামাক গবেষণা প্রতিষ্ঠানে একর প্রতি তিন গো-গাড়ী খড় দ্বারা মাটি আবৃত করিয়া দেওয়ার ফলে ফলন শতকরা নয় ভাগ বৃদ্ধি পায়। মাটির উপরিপৃষ্ঠ হইতে বাষ্পীভবন হেতু জলের অপচয় হ্রাস হওয়ার ফলে অধিকতর জল ফসল গ্রহণ করিতে পারে, ফসল বৃদ্ধির ইহাই বোধ হয় সম্ভাব্য কারণ।

জল উত্তোলন সরঞ্জাম (Water Lifts)

সেচখাল হইতে জল অভিকর্ষ (gravity) হেতু জমিতে প্রবাহিত হয়। কিন্তু কূপ বা জলাশয় হইতে জল তুলিতে হইলে জল উত্তোলনের জন্য সরঞ্জাম আবশ্যক। এ সকল সরঞ্জাম মানুষ বা বলদ-চালিত হইতে পারে, আবার যান্ত্রিক শক্তি-চালিত, যেমন তৈল-চালিত ইঞ্জিন সহ পাম্প বা বিদ্যুৎ-চালিত মোটরসহ পাম্পও হইতে পারে।

মনুষ্য-চালিত জল উত্তোলন সরঞ্জাম (Water Lifts Powered by Men)

সিউনি, দ্রোনী বা দোন, পিকোটা বা আর্কিমিডিয়ান স্ক্রু প্রভৃতি মনুষ্য-চালিত সরঞ্জাম।

শিউনি টিন বা বেতের তৈয়ারি ত্রিকোণ ঝুড়ি-বিশেষ। ইহাতে দুই-

তিন গ্যালন জল ধরে। ইহার প্রত্যেক পার্শ্বে প্রায় ছয় ফুট লম্বা দড়ি বাঁধা থাকে। প্রায় আট ফুট দূরত্বে দুই জন লোক দাঁড়ায়। উভয়ে উভয় হাতে একটি করিয়া দড়ি ধরিয়া ঝুড়িটিকে জলে নামায় এবং পরে দড়ি ধরিয়া টান মারিলে জল ভর্তি ঝুড়িটি দুই-তিন ফুট উঁচুতে উঠে এবং উহা জমিতে ফেলিয়া দেয়। এইভাবে জল তুলিয়া সেচ করা হয়। জল যদি চার-ছয় ফুট উঁচুতে তুলিবার প্রয়োজন হয় তবে দুইজন লোক একটি শিউনির সাহায্যে জল কিছুটা উঁচুতে তোলে এবং দুইজন লোকের দ্বিতীয় একটি দল ঐ স্থান হইতে আর একটি শিউনির সাহায্যে আরও দুই-তিন ফুট উঁচুতে জল তোলে (চিত্র নং ১৫)।

ছয় হইতে আট ফুট লম্বা তালগাছের একটি গুঁড়ি ফাঁপা করিয়া এবং এক প্রান্ত বন্ধ করিয়া **দোন** তৈয়ারি হয়। অনেক সময় লোহার পাত দ্বারাও ইহা তৈয়ারি হয়। দেখিতে ইহা অনেকটা নৌকার মত। ইহার বন্ধ প্রান্ত একটি দড়ির সাহায্যে জলে ডুবানো হয়। এই দড়ি একটি বাঁশ বা কাঠের দণ্ডের প্রান্তে বাঁধা থাকে; এই বাঁশ বা দণ্ডের অপর প্রান্তে ভারী কিছু বাঁধিয়া ওজনের সমতা রক্ষা করা হইয়া থাকে। এই বাঁশ বা দণ্ড চিমটার ন্যায় প্রান্তবিশিষ্ট আর একটি দণ্ডের উপর বসানো থাকে; ইহা আলম্বের (fulcrum) কাজ করে। সাধারণত একজন লোক জলে দাঁড়াইয়া দোন নামায় ও উঠায়, ফলে জলও এক-দুই ফুট উঁচুতে উঠে (চিত্র নং ১৬)।

মনুষ্য-চালিত জল তোলার যে সকল সরঞ্জাম আছে তন্মধ্যে **পিকোটার** সাহায্যে সর্বাধিক উঁচুতে জল তোলা যায়, অনেক সময় ২০ ফুট উঁচুতেও জল তোলা হয়। একটি উচ্চ আলম্বের উপর একটি শক্ত দণ্ড অনুভূমিকভাবে লাগানো থাকে। একটি দড়ি বা বাঁশের সাহায্যে জলের বালতি অনুভূম দণ্ডের সহিত বাঁধা থাকে। দুই বা ততোধিক লোক অনুভূম দণ্ডের উপরে সামনে ও পিছনে হাঁটে এবং অপর এক ব্যক্তি বালতিটিকে নির্দিষ্ট দিকে চালনা করে। বালতিটিকে জলে নামাইবার জন্য দণ্ডের উপরিস্থিত দুইজন লোক আলম্বের দিকে হাঁটে, বালতি ভর্তি হইলে তাহারা পিছনের দিকে হাঁটে; ফলে জলপূর্ণ বালতি মাটির উপরে উঠিয়া আসে এবং সেচখালে তাহা উপুড় করিয়া ঢালিয়া দেওয়া হয়। (চিত্র নং ১৭)।
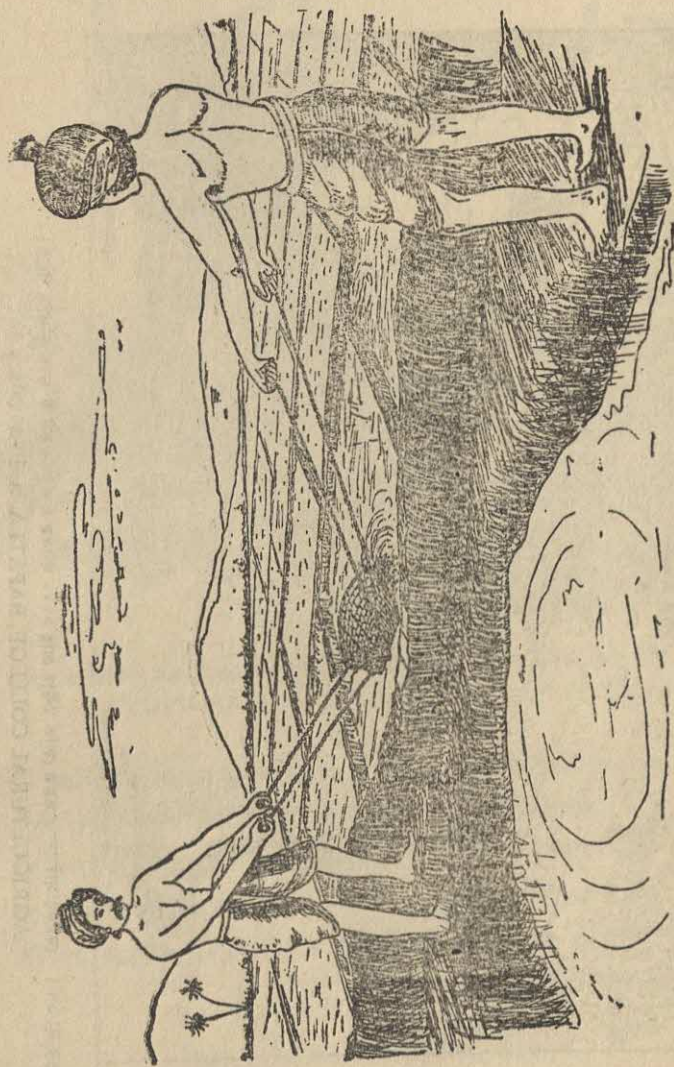
চিত্রা নং ১৫। দুই-তিন ফুট উচুতে জল তুলিবার উপযোগী সিউনি।
[AGRICULTURAL COLLEGE, BAPATLA, A. P.-এর সৌজন্যে]
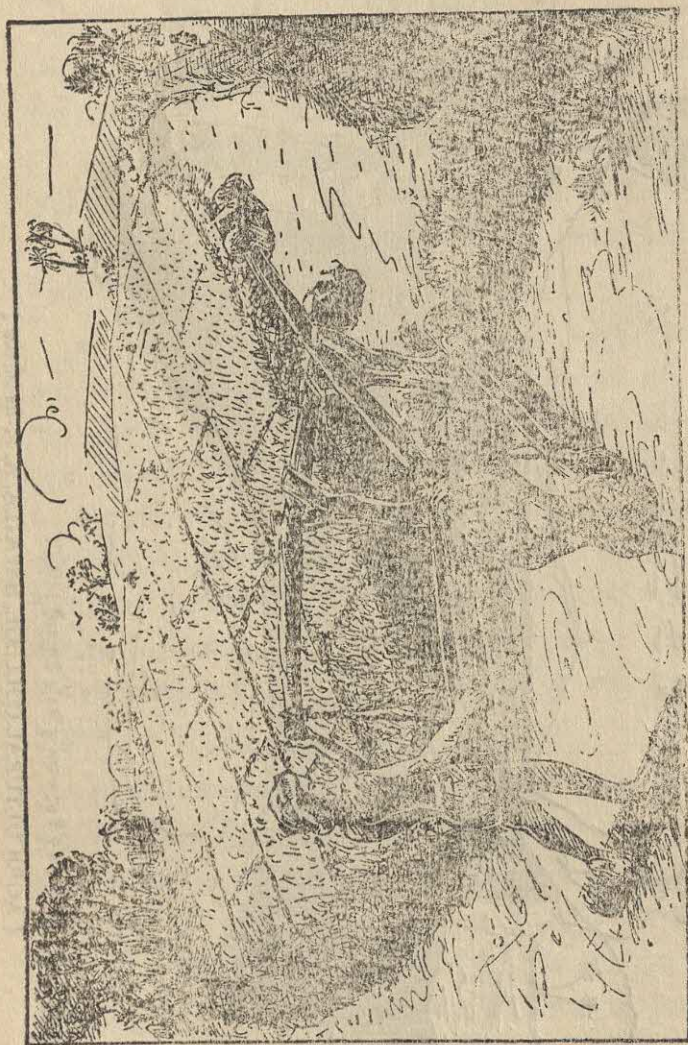
চিত্র নং ১৬। দোনের সাহায্যে একজন লোক ঘণ্টায় প্রায় ২০০০ গ্যালন জল তিন ফুট উঁচুতে তুলিতে পারে।
[AGRICULTURAL COLLEGE, BAPATLA, A. P.-এর সৌজন্যে]
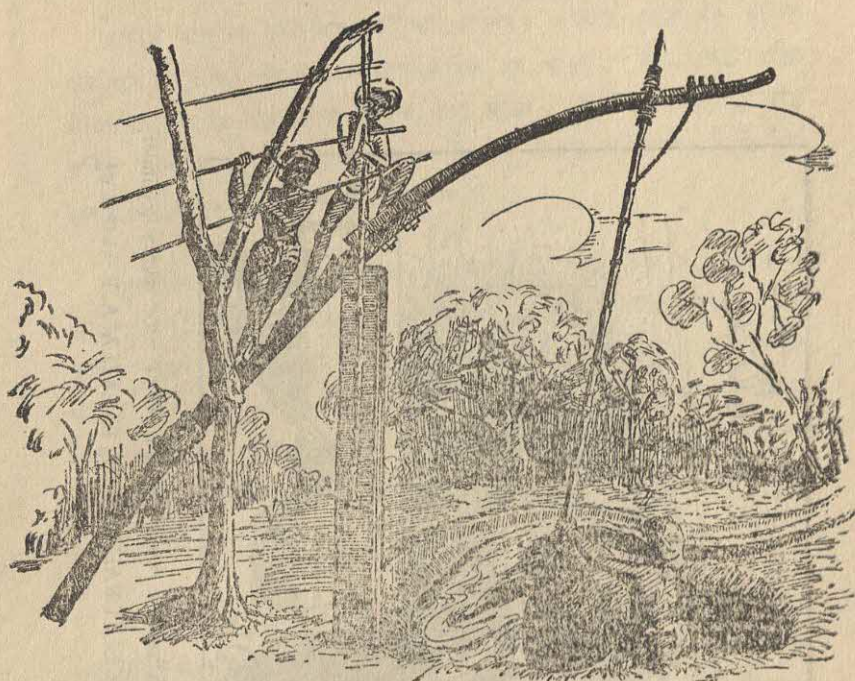
চিত্র নং ১৭। মনুষ্যচালিত জল তোলার সরঞ্জামের মধ্যে পিকোটার সাহায্যে জল সব চাইতে উঁচুতে তোলা যায়।
[AGRICULTURAL COLLEGE, BAPATLA. A. P.-এর সৌজন্যে]

আর্কিমিডিয়ান স্ক্রু কাঠ বা ধাতু নির্মিত ফাঁপা ও সাধারণত প্রায় ১ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট স্তম্ভক বিশেষ। ইহার উপর প্রান্তে একটি হাতল থাকে। এক ব্যক্তি এই হাতল ঘুরায়। কাঠে ঢুকাইবার স্ক্রু যেরূপ হয়, ইহার ফাঁপা অংশের মধ্যে ঐরূপ অংশ বিশেষ থাকে। এই স্ক্রু ঘুরাইলে জল উপরে উঠিয়া আসে। এই পদ্ধতিতে জল দুই ফুট উঁচুতে তোলা যায়। (চিত্র নং ১৮)।

বলদ চালিত জল উত্তোলন সরঞ্জাম

(Water Lifts Powered By Bullocks)

জল তোলার বলদ চালিত অতি পরিচিত সরঞ্জামগুলি হইল মোট (whole) ও পারসিয়ান হুইল (Persian wheel)।
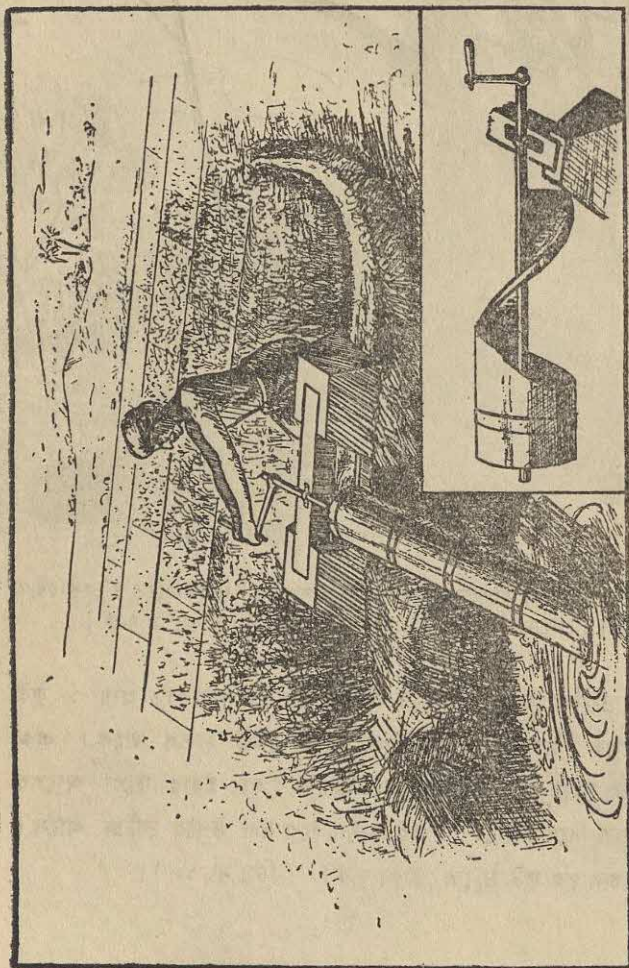
চিত্র নং ১৮। একজন লোকে জল তুলিবার পক্ষে আর্কিমিডিয়ান স্ক্রু বিশেষ উপযোগী। কর্তিত অংশে স্তম্ভকের (cylinder) অভ্যন্তরস্থ স্ক্রু দেখা যাইতেছে। [AGRICULTURAL CLLEGE, BAPATLA, A. P.-এর সৌজন্যে]

মোট ধাতু বা চর্মনির্মিত একটি থলি বিশেষ। ইহাতে প্রায় ৫০ গ্যালন জল ধরে। থলির তলদেশে একটি চর্মনির্মিত মুখ থাকে; ইহা একটি দড়ির সাহায্যে বলদের জোয়ালের সহিত বাঁধা থাকে। দ্বিতীয় একটি বড় দড়ি থলির উপরদিকে বাঁধা থাকে এবং এই দড়ি একটি কপিকলের উপর দিয়া জোয়ালের সহিত বাঁধা থাকে।

কূপ হইতে থলিটি তুলিবার সময় বলদদ্বয় দুইটি দড়িই এক সঙ্গে টানিতে থাকে, একটি দড়ি থলিটিকে তোলে, অপরটি থলির তলদেশস্থ মুখটিকে থলির সঙ্গে বাঁকাইয়া রাখে যাহাতে জল পড়িয়া না যায়। থলি মাটির উপরে উঠিবার পর দ্বিতীয় দড়িটি টানিয়া থলির মুখ খুলিয়া দেয় এবং জল সেচনালায় চলিয়া যায়। অতঃপর বলদদ্বয় আবার কূপের দিকে হাঁটে এবং থলিটিকে কূপে নামায় এবং উক্ত প্রক্রিয়া পুনরায় সংঘটিত হয়। (চিত্র নং ১৯)।

পারসিয়ান হুইলে কূপের তলদেশের নিকটে এক পার্শ্বে একটি ষড়ভুজ চক্র থাকে এবং মাটির উপরিতলে কূপের উপরে অনুরূপ অপর একটি চক্র থাকে। এই দুই চক্রের সঙ্গে সাইকেলের শিকলের ন্যায় একটি শিকল জড়ানো থাকে। এই শিকলে অনেকগুলি ছোট ছোট বালতি মালার আকারে প্রায় দুই ফুট দূরে দূরে সংযুক্ত থাকে। উপরের চক্রের কেন্দ্রে একটি অক্ষদণ্ড (axle) সংযুক্ত থাকে। ইহা প্রায় ১৫ ফুট লম্বা হয় এবং অপর প্রান্তে একটি দাঁতযুক্ত চাকা (gear) সংযুক্ত থাকে। অক্ষদণ্ডটি মাটির উপরিতলে অনুভূমিক ভাবে থাকে। ইহার দাঁতযুক্ত চাকার সঙ্গে অপর একটি দাঁতযুক্ত চাকা পিষে এবং দ্বিতীয় চাকার সহিত তিন ফুট লম্বা একটি দণ্ড সমকোণ করিয়া লাগানো থাকে। এই দণ্ডের প্রান্তের সহিত অপর একটি দণ্ড সমকোণ করিয়া যুক্ত থাকে। বলদ চক্রাকারে ঘুরিয়া এই দণ্ড ঘুরায়। বলদ যখন দণ্ড ঘুরায়, দাঁতযুক্ত চাকা ঘুরে এবং বালতিযুক্ত শিকল ঘুরিতে থাকে; ইহার এক পার্শ্বে জলভর্তি বালতিগুলি উঠিয়া আসে এবং অপর পার্শ্বে বালতিগুলি নামিবার পূর্বে জল একটি বড় পাতে ঢালিয়া দেয় এবং তথা হইতে জল সেচ নালায় চলিয়া যায়। খালি বালতিগুলি জলে নামে এবং পুনরায় ভর্তি হইয়া উঠিয়া আসে। (চিত্র নং ২০)।
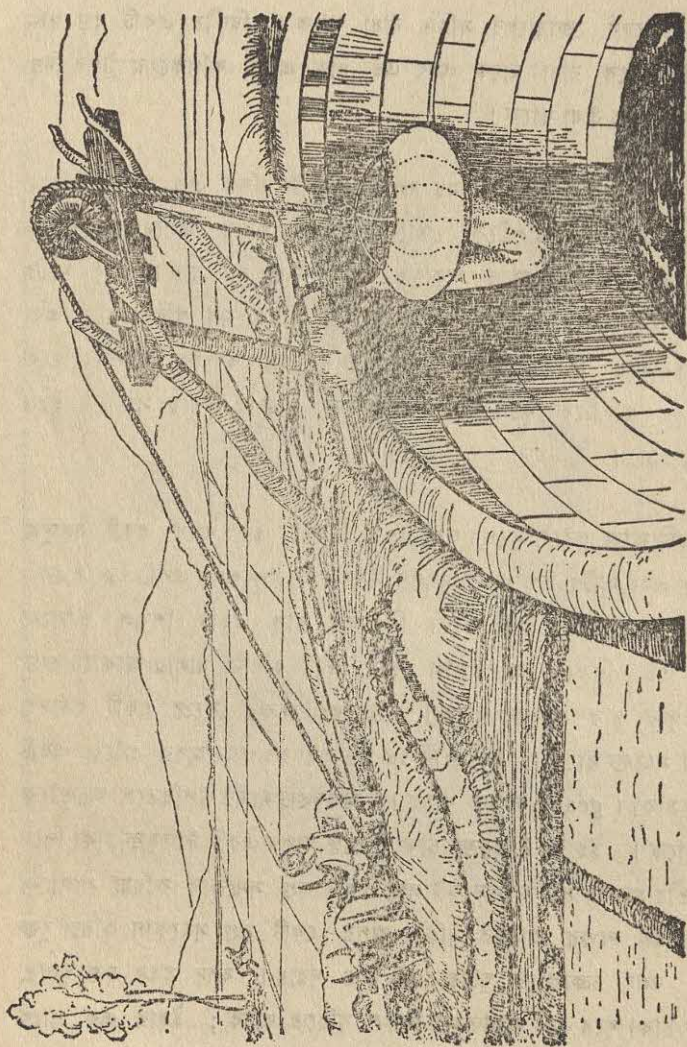
চিত্র নং ১৯। মোট সম্ভবত ভারতের সর্বাধিক জনপ্রিয় জল উত্তোলন সরঞ্জাম।
(AGRICULTURAL COLLEGE, BAPATLA, A. P.-এর সৌজন্যে)
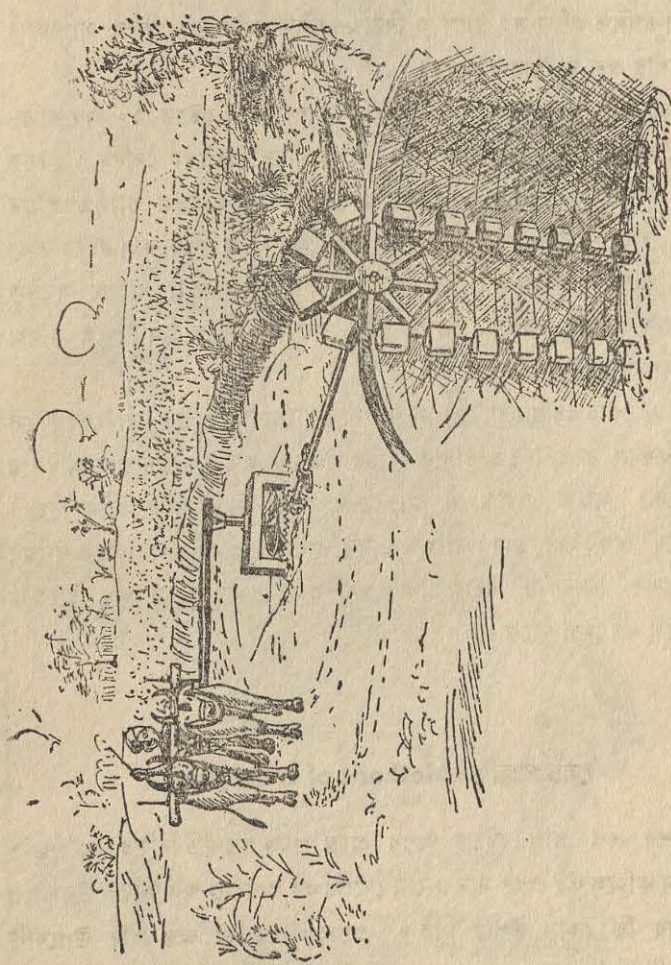
চিত্র নং ২০। বলদচালিত জল উত্তোলন যন্ত্রাদের মধ্যে পারসিয়ান হুইল বিশেষ কার্যকরী। কিন্তু ইহার প্রাথমিক ব্যয় খুব বেশী।
[AGRICULTURAL COLLEGE, BAPATLA, A. P.-এর সৌজন্যে]

যান্ত্রিক-শক্তি চালিত জল উত্তোলন সরঞ্জাম
(Water Lifts Powered Mechanically)

তৈল-চালিত ইঞ্জিন সহ পাম্প ও বিদ্যুৎ-চালিত মোটর সহ পাম্প সাধারণত জল তোলার জন্য ব্যবহার করা হয়।

সেচের জন্য সাধারণত ২ হইতে ৪ ইঞ্চি পাম্প সহ ৫ হইতে ১০ অশ্ব-শক্তি-বিশিষ্ট তৈল-চালিত ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে দৈনিক ১ হইতে ২ একর জমিতে জল সেচ চলে। সেচের জন্য পাম্প সহ তৈল চালিত ইঞ্জিন বসাইলে অনেক সময় শক্তির অপচয় হয়, অর্থাৎ যে কাজ করা হইবে তাহা অপেক্ষা ইঞ্জিন বা পাম্প অত্যধিক বড় বা ছোট হইতে পারে। আবার যতটুকু উঁচুতে জল তোলা দরকার, পাম্প তাহা অপেক্ষা উঁচুতে জল তোলে বলিয়া শক্তির অপচয় হয়। (চিত্র নং ২১)

ব্যয় সংকোচ হয় বলিয়া, যে সকল গ্রামে বিদ্যুৎ পাওয়া যাইতেছে সে সকল অঞ্চলে দ্রুত বিদ্যুৎ-চালিত মোটর তৈল-চালিত ইঞ্জিনের স্থান অধিকার করিতেছে। সঠিক প্রকার ও আয়তনের মোটর ক্রয় অতি জটিল বিষয়। এ বিষয়ে নিকটবর্তী কৃষি আধিকারিকের পরামর্শ গ্রহণ করা যাইতে পারে। তৈল-চালিত ইঞ্জিন বা বিদ্যুৎ-চালিত মোটর সহ পাম্প ক্রয়ের জন্য রাজ্যের কৃষিবিভাগ ঋণ দিয়া থাকে।

সেচ পদ্ধতি (Methods of Irrigation)

দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অনুসৃত বিভিন্ন সেচ পদ্ধতি অনুধাবন করিলে এই প্রশ্নই মনে জাগে, দেশের এই অপর্যাপ্ত জল আরও উত্তমরূপে ব্যবহারের কি কোন উপায় নাই? প্রত্যেকটি জমির জন্য যদি উপযোগী সেচ পদ্ধতি নির্বাচন করা হয় এবং সতর্কতার সহিত সঠিক পরিমাণ জল ব্যবহার করা হয়, তবে ফসলের ফলন অনেক বৃদ্ধি পাইবে, অপর্যাপ্ত জলের সুব্যবহার হইবে এবং তাহার ফলে সর্বত্র জীবনযাত্রার মানও উন্নীত হইবে।

নিম্নে প্রতিযোজন (adaptations) সহ কয়েক প্রকার সেচ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে।
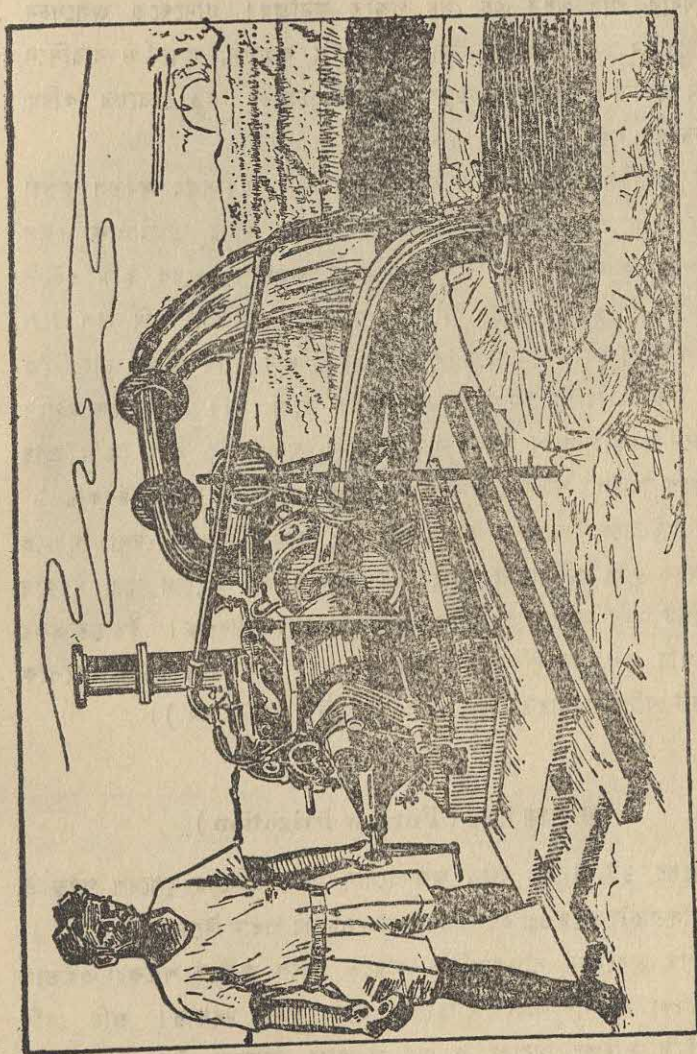
চিত্র নং ২১। যে সকল কৃষক বেশ কিছু টাকা প্রাথমিক ব্যয় করিতে সক্ষম তাহাদের নিকট তৈলচালিত ইঞ্জিনসহ পাম্প দ্রুত জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। [AGRICULTURAL COLLEGE, BAPATLA, A. P.-এর সৌজন্যে]

বেসিন সেচ পদ্ধতি (Basin Method of Irrigation)

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র এই সেচ পদ্ধতি জনপ্রিয়। ধানখেতে জলসেচন পদ্ধতি বেসিন সেচ পদ্ধতির উদাহরণ। লেবু বাগানে, লুসার্ন ও বারসিনে এবং গম প্রভৃতি কয়েক প্রকার তণ্ডুল শস্যে এই পদ্ধতির কিছু হেরফের করিয়া জলসেচন করা হয়।

এই পদ্ধতিতে জলসেচন করিতে হইলে জমি যথাসম্ভব সমতল হওয়া আবশ্যক এবং প্রয়োজন মত জল যাহাতে ধরে, জমির চারিদিকে এরূপ আইল থাকা আবশ্যক। এই আইল প্রয়োজন অনুসারে কয়েক ইঞ্চি হইতে কয়েক ফুট পর্যন্ত উঁচু হইতে পারে। পালাক্রমে প্রত্যেক জমি জল দ্বারা প্লাবিত করা হয় এবং জল মাটিতে শোষিত হয়। ধান চাষে জমির চারিদিকে আইল দিয়া প্রয়োজন অনুযায়ী জল ধরিয়া রাখা হয়। ধানখেতে জমির সকলস্থানে একই পরিমাণ জল দাঁড়াইয়া থাকা আবশ্যক। এজন্য জমি প্রায় সম্পূর্ণরূপে সমতল (শতকরা অনধিক ০·২ ভাগ ঢাল-বিশিষ্ট) হওয়া দরকার।

মহারাষ্ট্র রাজ্যের নাগপুর জেলায় থর্ষা লেবু গবেষণা উদ্যানে দেখা গিয়াছে যে প্রত্যেক বৃক্ষে প্রতিবার জলসেচনে ১৫০ গ্যালন জল প্রয়োগ করা দরকার এবং আট মাস সময়কালের মধ্যে ২৬ বার জলসেক আবশ্যক। ইহাতে একর প্রতি প্রায় ৫০ একর ইঞ্চি জল প্রয়োগ করা হয়। বেসিন পদ্ধতিতে জলসেকে প্রত্যেকটি বেসিনের আয়তন ছিল ১২´ × ১২´ ফুট (চিত্র নং ২২)।

নালায় সেচ (Furrow Irrigation)

ফসলের দুই সারির মাঝে জল প্রয়োগ এবং উদ্ভিদের মূলদেশ পর্যন্ত ঐ জল শোষিত হইতে দেওয়া হইল নালায় জলসেচনের প্রধান উদ্দেশ্য।

নালায় জলসেচন সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে জমিতে শতকরা একভাগ ঢাল* থাকা বাঞ্ছনীয় এবং সারিগুলি সোজা হওয়া দরকার। জমি বেশি ঢালু হইলে ভূমিক্ষয় নিবারণ ও জল সমভাবে শোষণের উদ্দেশ্যে নালাগুলি যথাসম্ভব সমোন্নতি রেখায় তৈয়ার করা দরকার। নালা কত দীর্ঘ হইবে তাহা জমির জলশোষণ ক্ষমতা ও জমির ঢালের উপর নির্ভর করে।

* শতকরা এক ভাগ ঢালের অর্থ হইল প্রতি ১০০ ফুট দীর্ঘ নালা ১ ফুট উঁচু বা নিচু হইবে।
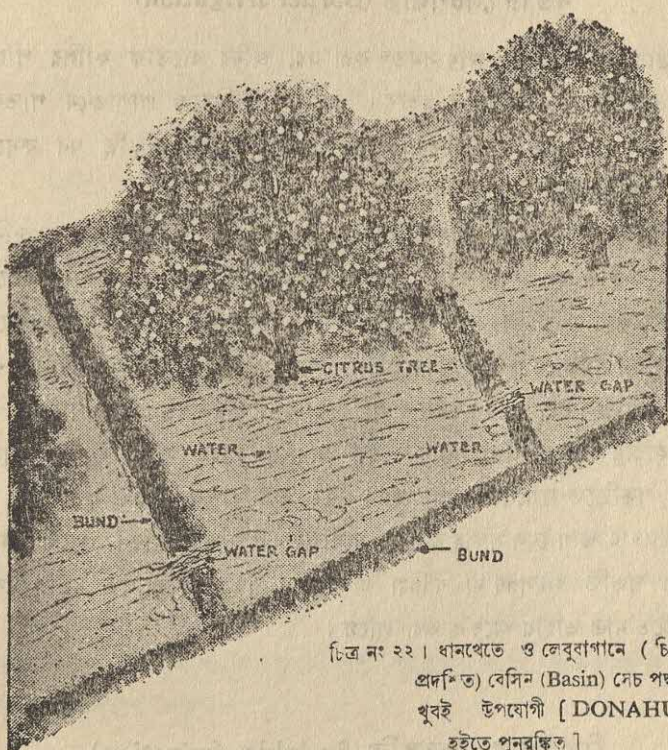
চিত্র নং ২২। ধানখেতে ও লেবুবাগানে (চিত্রে প্রদর্শিত) বেসিন (Basin) সেচ পদ্ধতি খুবই উপযোগী [DONAHUE হইতে পুনরঙ্কিত]

সহজে জল শোষণ করে এরূপ জমিতে অর্থাৎ বেলে মাটিতে নালার দৈর্ঘ্য কম হইবে এবং সহজে জল শোষণ করে না এরূপ জমিতে অর্থাৎ এঁটেল মাটিতে নালা দীর্ঘ করা চলে। শতকরা অনধিক এক ভাগ ঢাল সম্পন্ন জমিতে নালা দীর্ঘ করা চলে, কিন্তু ততোধিক ঢাল সম্পন্ন জমিতে নালার দৈর্ঘ্য অবশ্যই স্বাভাবিক অপেক্ষা হ্রাস করিতে হইবে।

সাধারণভাবে বলা যায়, নালায় পর্যাপ্ত জল প্রয়োগ করিতে যদি চার ঘন্টা সময় লাগে, তবে নালায় এমন পরিমাণ জল প্রয়োগ করিতে হইবে যাহাতে নালার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এক ঘন্টার মধ্যে জলপ্লাবিত হইয়া যায় (সমগ্র সময়ের এক চতুর্থাংশ) এইভাবে জল যথাসম্ভব সমভাবে মাটি শুষিবে এবং সমগ্র জমিতে ফসলের বৃদ্ধিও সমান হইবে।

বর্ডার সেচপদ্ধতি (Border Irrigation)

বর্ডার সেচ পদ্ধতিতে জমি সমতল করা হয়, জমির প্রত্যেক ফালির পার্শ্বে প্রায় এক ফুট উঁচু বাঁধ দিতে হইবে। প্রত্যেক জমিখণ্ডে পালাক্রমে পাতলা করিয়া জল প্রয়োগ করিতে হইবে। গম, লুসার্ণ, বারসিম প্রভৃতি ঘন ফসলে এই সেচপদ্ধতি খুবই উপযোগী।

দুইটি বাঁধের মধ্যবর্তী ফালি জমির প্রস্থ এমন হওয়া উচিত যাহাতে জমির সর্বত্র ২-৩ ইঞ্চি জল প্রযুক্ত হয়। সেচ জলের পরিমাণ অনুসারে ফালি ২০ হইতে ৫০ ফুট চওড়া হওয়া উচিত। প্রত্যেক ফালির দৈর্ঘ্য এমন হওয়া উচিত যাহাতে জমির সর্বত্র সমভাবে জল শোষিত হয়। বেলে দোআঁশ মাটিতে এই দৈর্ঘ্য ১০০ ফুট হইলে ভাল হয়, এঁটেল মাটিতে এই দৈর্ঘ্য ৫০০ ফুট পর্যন্ত হইতে পারে।

মহারাষ্ট্র রাজ্যের নাগপুর কৃষি কলেজ খামারে ১৯৫৬ সালে লুসার্ণ ফসলে বর্ডার পদ্ধতিতে জলসেচন করা হয়। ২০ ফুট প্রশস্ত, ১৫০ ফুট দীর্ঘ ও শতকরা ০·৫ ভাগ ঢাল সম্পন্ন জমিতে সর্বোত্তম ফল পাওয়া যায়। পূর্বে কোন প্রকার পদ্ধতি অনুসরণ না করিয়া জলপ্লাবনে যত জল লাগিত বর্ডার সেচ পদ্ধতিতে মাত্র তাহার অর্ধেক জল লাগে।

স্প্রিঙ্কলার সেচপদ্ধতি (Sprinkler Irrigation)

এই পদ্ধতিতে নল ও তাহার ঘূর্ণ্যমান জলের ভিতর জল পাম্প করা হয় এবং জল স্বাভাবিক বৃষ্টির আকারে জমির উপরে ছড়াইয়া পড়ে।

বেলেমাটি জাতীয় যে সকল মাটি দ্রুত জল শোষণ করে বলিয়া অন্যান্য পদ্ধতিতে জলসেচন অসুবিধাজনক স্প্রিঙ্কলার সেচ পদ্ধতিতে সে সকল জমিতে অনায়াসে জলসেচন করা চলে। গম বা লুসার্ণ প্রভৃতি ঘন বর্ধনশীল ফসলে এই পদ্ধতিতে জলসেক অতিশয় সুবিধাজনক। এই পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন সেচ পদ্ধতিতে ঢালু বা পার্বত্য জমিতে সমভাবে জলসেচ করা যায় না। ইহা ছাড়া, উৎসশিলা বা কঠিন অন্তস্তরের উপর অবস্থিত অগভীর মাটিতে এ পদ্ধতি অতিশয় উপযোগী। এই সেচ পদ্ধতিতে জলের সহিত নাইট্রোজেন ও পটাশ ঘটিত রাসায়নিক সার মিশাইয়া অনেক দেশে সার প্রয়োগ ও জল সেচ একই সঙ্গে সারা হয়।

আদিম জলপ্লাবন (Wild Flooding)

জলপ্লাবন পদ্ধতি বহু পুরাতন ও আদিম পদ্ধতি এবং সচরাচর অনুসরণ করা হয়; কিন্তু ইহাতে জলের অপচয় সর্বাধিক হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে জলের উৎস হইতে যত জল এই পদ্ধতিতে সরবরাহ করা হয় তাহার শতকরা ১০ ভাগ মাত্র উদ্ভিদের কাজে আসে। অবশিষ্ট ৯০ ভাগ জল গড়াইয়া, গভীর ক্ষরণ ও বাষ্পীভবনে অপচয় হয়। তাহা ছাড়া, জমির নিচু অংশের ফসল ডুবিয়া থাকে এবং উঁচু স্থানের ফসলে পর্যাপ্ত সেচ হয় না। ফলে ফসলের বৃদ্ধি সমান হয় না এবং গড় ফলনও হ্রাস পায়।

এই পদ্ধতিতে একটি সেচনালা খুলিয়া দেওয়া হয় যাহাতে জল সকল দিকে অনায়াসে প্রবাহিত হইতে পারে। জলের যথাসাধ্য সম-বিতরণের জন্য কয়েক জন লোক কোদালের সাহায্যে এখানে একটি নালা, সেখানে একটি বাঁধ ইত্যাদি তৈয়ার করিয়া চলে।

যদিও এই আদিম পদ্ধতিতে প্রচুর জলের অপচয় হয়, তবুও যে সকল অঞ্চলে প্রচুর জল পাওয়া যায়, সে সকল অঞ্চলে স্বল্প মূল্যবান ফসলে এই পদ্ধতিতে জল প্রয়োগ করা হয়। প্রয়োজনীয় প্রায়োগিক সহযোগিতা ও আর্থিক ঋণ পাইলে অনেক কৃষকই এই পদ্ধতির পরিবর্তে অধিকতর উপযোগী পদ্ধতি অনুসরণে উৎসুক।

জল প্রয়োগ (Water Application)

সেচ জল প্রয়োগ একটি বিজ্ঞানও বটে, আবার একটি শিল্পও বটে। ইহা একটি বিজ্ঞান কেননা জমিতে কখন জল প্রয়োগ করিতে হইবে এবং কতটা করিতে হইবে তাহা একমাত্র বিজ্ঞানীই, ব্যয়সাধ্য ও জটিল যন্ত্রপাতির সাহায্যে নির্ণয় করিতে পারে। কৃষক ইহা কখনও নির্ণয় করিতে পারে না। ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা এবং নিজের বিচার বিবেচনা (শিল্প) অনুসারে কৃষক তাহার নিজস্ব সিদ্ধান্তে আসিতে পারে মাত্র।

কখন জলসেচন, আরম্ভ করিতে হইবে (When to Start Irrigating)

যখন উদ্ভিদের আরও জলের আবশ্যক হয়, তখন তাহারা সাধারণত নেতাইয়া পড়ে (wilt)। যদি সারা খেতে এই লক্ষণ দেখা যায় তবে তাহার

পরে জল প্রয়োগ করিয়াও ফলন আর বাড়ানো যায় না; ফসল আগেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। খেতের শুষ্কতম অংশ লক্ষ্য করিলে যখন দেখা যাইবে যে ফসল নেতাইতে আরম্ভ করিয়াছে তখনই জলসেচন আরম্ভ করিবার প্রকৃষ্ট সময়।

কখন জলসেচন বন্ধ করিতে হইবে

(When to Stop Irrigating)

কখন জলসেচন বন্ধ করিতে হইবে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য জলসেচনের সঙ্গে সঙ্গে জমির মাঝখানে গিয়া একটি লাঠি বা লোহার দণ্ড মাটির বিভিন্ন স্থানে ঢুকাইয়া দেখিতে হইবে। আর্দ্র মাটিতে ইহা সহজে প্রবেশ করিবে, কিন্তু নিচের শুষ্ক স্তরে তত সহজে প্রবেশ করিবে না। জমির বিভিন্ন স্থানে কয়েকবার দণ্ডটি ঢুকাইয়া জমির কতটা নিচে পর্যন্ত জল প্রবেশ করিয়াছে তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। যতদূর পর্যন্ত জমি আর্দ্র করা হইবে তাহার ৩ ইঞ্চি উপরে জল প্রবেশ করিলে সেচ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। সেচ জল প্রয়োগ বন্ধ করিবার পর পূর্ব নির্দিষ্ট গভীরতার বেশ ৩ ইঞ্চি মাটি আপনা হইতেই ভিজিয়া যাইবে। এই পূর্ব নির্দিষ্ট গভীরতা সচরাচর ১ ফুট হইতে ২ ফুট পর্যন্ত হয়।

জল-নিষ্কাশন (Drainage)

অনেক কৃষিক্ষেত্রে দেখা যায় আর্দ্র মাটিই সব চাইতে উর্বর। কিন্তু যেহেতু ঐ মাটি বৎসরের অধিকাংশ সময় আর্দ্র থাকে তাহাতে (ধান চাষ না করিলে) প্রচ্ছন্ন ফলনের এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র উৎপন্ন হয়। যথাযথ জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করিলে ঐ মাটিতে প্রচুর ফলন হয়। জমিকে ফসল উৎপাদনের আরও উপযোগী করিয়া তোলার জন্য জমি হইতে অতিরিক্ত জল অপসারণ করাকে জল নিষ্কাশন বলে।

আর্দ্র মাটি সাধারণত জমাট হয়। জমাট মাটিতে উদ্ভিদ মূল সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। সেজন্য জল নিষ্কাশন করা আবশ্যক এরূপ আর্দ্র মাটিতে সার ব্যবহার করিলে অর্থ ও সময়ের অপচয় হয় মাত্র।

আর্দ্র মাটি হইতে জল নিষ্কাশিত করিলে, এক পশলা বৃষ্টির পর তাহা কর্ষণ করা যায়। বীজ দ্রুত অঙ্কুরিত হয় এবং ফসলের বৃদ্ধি উত্তম হয়। উত্তম নিকাশী জমিতে কীটশত্রু ও রোগের উপদ্রব কম হয়। জল নিষ্কাশন প্রয়োজন এরূপ জমিতে এক পশলা বৃষ্টির পর ফসল ডুবিয়া যাইতে পারে। অধিকন্তু উত্তম নিকাশী জমিতে ফসল আহরণের সময় আর্দ্র জমি হেতু ফসলের অপচয় কম হয়।

যথাযথ নিকাশী জমিতে এখানে ওখানে আর্দ্র স্থান থাকে না, ফলে সমগ্র জমিই এক সঙ্গে চাষ করা যায় ও রোপণ করা যায়। সকল আর্দ্র স্থান হইতে জল নিষ্কাশিত হইলে সমগ্র জমির ফলন বৃদ্ধি পায়।

জল নিষ্কাশন দরকার এরূপ জমিতে অনাবৃষ্টি কালে অনেক সময় ফসল জলাভাবে মারা যায়। কারণ রোপণ কালে জমিতে যথেষ্ট জল থাকে বলিয়া মূল মাটির বেশি গভীরে প্রবেশ করে না। পরে অনাবৃষ্টি কালে জলপীঠ মূলদেশ হইতে নিচে নামিয়া যায়, ফলে মূল কোন জল পায় না। উত্তম নিকাশী জমিতে মূল মাটির অনেক নিচে প্রবেশ করে, ফলে অনাবৃষ্টি কালে মূল মাটি গভীর স্তর হইতেও জল শোষণ করিতে পারে (চিত্র নং ২৩)।

জলসিক্ত জমি হইতে অতিরিক্ত জল অপসারণের জন্য যথাযথ জল নিষ্কাশন
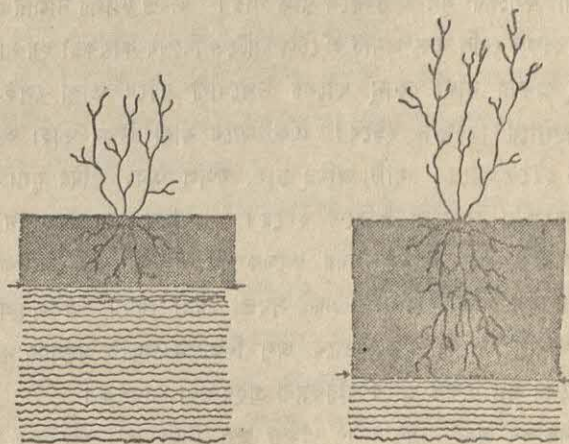
চিত্র নং ২৩। আর্দ্র জমির (ডাইনে) জল নিষ্কাশন হেতু উদ্ভিদের মূল মাটির বেশ নিচে প্রবেশ করে এবং অনাবৃষ্টি সহ্য করিতে পারে। বামে জমির জল নিষ্কাশন করা হয় নাই।
[PATERSON হইতে পুনরঙ্কিত]

ব্যবস্থা দরকার। যে সকল অঞ্চলে জমির উপরে লবণ জমা একটা সমস্যা-বিশেষ সে সকল অঞ্চলে লবণ ধুইবার জন্য জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা আবশ্যক।

জল নিষ্কাশন পদ্ধতি (**Drainage Systems**)

খোলা নালা বা টালির নালার সাহায্যে জমির জল নিষ্কাশন করা যায়। খোলা নালা মূল্যবান জমি অধিকার করিয়া থাকে; যন্ত্রপাতি সহ এই সকল নালা পার হইতে অসুবিধা হয়; আগাছা জন্মিয়া ও পলি জমিয়া ইহারা সহসা আবদ্ধ হইয়া যায়। এবং সেজন্য প্রতি বৎসর এই সকল নালা কয়েকবার পরিষ্কার করিতে হয়। খোলা নালা গভীর না হইলে ইহাদের মাধ্যমে মাত্র জমির উপরিস্তরের জলই নিষ্কাশিত হয়। অবশ্য টালির নালা অপেক্ষা খোলা নালার প্রাথমিক ব্যয় অনেক কম পড়ে। আর্দ্র অঞ্চলে জমাট এঁটেল মাটিতে অবশ্য খোলা নালাই কার্যকরী, কারণ মাটির ভিতরে জল সহজে প্রবেশ করে না।

অপরপক্ষে টালির নালায় কোন জমি নষ্ট হয় না এবং খামারের বিভিন্ন প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয় না। একবার বসাইলে ইহাদের আর কোন যত্নের আবশ্যক হয় না। এই নালার মাধ্যমে মাটির রন্ধ্র সমূহ হইতেও জল নিষ্কাশিত হয় বলিয়া ফসলের মূল উত্তমরূপে বৃদ্ধি পায়। অবশ্য টালির নালার প্রাথমিক ব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশি এবং জমাট এঁটেল মাটিতে বিশেষ কার্যকরী হয় না।

কোন্ প্রকার নালা কোন্ স্থানের উপযোগী হইবে তাহা সেই স্থানের অবস্থা অনুসারে স্থিরীকৃত হইবে। এক স্থানে যাহা উত্তম তাহা অন্য স্থানে উত্তম নাও হইতে পারে। মাটি, জমির ঢাল, ফসল এবং জমির মূল্য প্রভৃতি সকল বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হইবে। যথাযথ জল নিষ্কাশন পদ্ধতি অনুসরণ করিতে গেলে অনেক সময় অনেকগুলি খামার এবং অনেক ক্ষেত্রে একটি সমগ্র জল-বিভাজিকা লইয়া একই সমস্যা দেখা দেয়। এ সকল ক্ষেত্রে প্রত্যেক খামারে পৃথক পৃথক-ভাবে জল নিষ্কাশন পদ্ধতি অনুসরণ না করিয়া সমগ্র অঞ্চলের জন্য একক ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যক।

জল নিষ্কাশন খুবই ব্যয়সাধ্য। এজন্য জল নিষ্কাশনের পর জল-নিষ্কাশন ব্যবস্থার ব্যয় তুলিবার উপযোগী অতিরিক্ত ফসল নিষ্কাশিত জমি হইতে পাওয়া যাইবে কিনা প্রথমে তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। খোলা নালা না টালির নালা স্থাপন করা হইবে, তাহা পরবর্তী পর্যায়ে স্থির করিতে হইবে।

টালির নালার সাহায্যে জল নিষ্কাশন (Tile Drainage)

এ পদ্ধতিতে অপ্রশস্ত নালা খনন করিয়া তাহার মধ্যে ছোট ছোট টালি খণ্ড প্রান্তের সহিত প্রান্ত মিলাইয়া স্থাপন করা হয় এবং তাহার উপরে মাটি চাপা দিয়া জমির উপরিতল পর্যন্ত ভরাট করিয়া দেওয়া হয়। দুইটি টালির সংযোগস্থল দিয়া নিষ্কাশিত জল টালির নালার মধ্যে প্রবেশ করে।

সন্তোষজনকভাবে টালির নালা তৈয়ার করিতে হইলে যথেষ্ট পরিকল্পনা ও অভিজ্ঞতা আবশ্যক। অনেক সময় সন্থ পাস করা কৃষি বিশারদ অপেক্ষা নিরক্ষর কিন্তু অভিজ্ঞ শ্রমিক উৎকৃষ্ট নালা তৈয়ার করিতে পারে। যথেষ্ট অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন কৃষি স্নাতক অবশ্য সর্বোত্তম নালা তৈয়ার করিতে পারিবে। প্রত্যেক রাজ্যেই কৃষি বিভাগ হইতে টালির নালা স্থাপন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রায়োগিক সহযোগিতা পাওয়া যায়।

যথাযথ পরিকল্পনা করিয়া যথাযথভাবে নির্মাণ করিলে এবং সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিলে টালির নালা শতাধিক বৎসর পর্যন্ত উপযোগী থাকে। মাটির প্রকার এবং কি ফসল উৎপন্ন করা হইবে তাহার উপরে টালির লাইনগুলির পারস্পরিক দূরত্ব ও গভীরতা নির্ভর করে। যে মাটিতে জল ধীরে প্রবেশ করে সে মাটিতে টালি অপেক্ষাকৃত অগভীর করিয়া স্থাপন করিতে হইবে এবং লাইনগুলির দূরত্ব অপেক্ষাকৃত কম হইবে। লুসার্ন বা ফলের বাগানে টালি প্রায় ৪ ফুট গভীর করিয়া স্থাপন করিতে হইবে। ঘাস ও ক্ষুদ্রাকার শস্যের জন্য টালি ২ ফুট গভীরে স্থাপন করিলে সব চাইতে ভাল ফল পাওয়া যায় এবং ভুট্টার জন্য মাঝামাঝি গভীরতা উৎকৃষ্ট।

মাটির জল নিষ্কাশন ক্ষমতা অনুসারে টালির লাইনগুলির পারস্পরিক দূরত্ব ৪০ ফুট হইতে ৩০০ ফুট পর্যন্ত হইতে পারে। এঁটেল ও এঁটেল-দোআঁশ মাটিতে টালির গভীরতা ৩ ফুটের অধিক হওয়া উচিত নয় এবং লাইনগুলির পারস্পরিক দূরত্ব ৭০ ফুটের অধিক হওয়া উচিত নয়। দোআঁশ মাটিতে টালির লাইন ৪ ফুট নিচে এবং ১০০ ফুট পারস্পরিক দূরত্বে স্থাপন করা উচিত। বেলে মাটিতে ৪·৫ ফুট নিচে ও ৩০০ ফুট পারস্পরিক দূরত্বে টালির লাইনগুলি স্থাপন করা উচিত। লাবণিক জমিতে টালি আরও নিচে স্থাপন করা দরকার।

ইঁদুর মাটি তুলিয়া টালির লাইনের নির্গম-মুখ যাহাতে বন্ধ করিতে না পারে সেজন্য টালির নির্গম-মুখে ছাকনি বসাইতে হইবে। সিমেন্টের তৈয়ারি

একটি বাক্সের মধ্যে টালির লাইনের নির্গম-মুখটি বসাইতে হইবে যাহাতে জলের স্রোতে লাইনের নিচের মাটি সরিয়া না যায়। লাইনের নির্গম-মুখের পশ্চাতে ১০ ফুট পর্যন্ত টালির জোড়াগুলি সিমেন্ট দিয়া গাঁথিয়া দিতে হইবে। দুইটি টালির সংযোগস্থল দিয়া যাহাতে জল টালির ভিতর প্রবেশ করিতে পারে এজন্য অবশিষ্ট টালিগুলি সিমেন্ট ব্যতিরেকেই প্রান্তের সহিত প্রান্ত মিলাইয়া স্থাপন করিতে হইবে। কোন কোন দোআঁশ মাটিতে লাইনের উপরে মাটি চাপা দেওয়ার পূর্বে টালির সংযোগস্থলে কিছু ঘাস দিয়া তারপর মাটি চাপা দেওয়া উচিত। লাইনের চতুর্দিকে ঝুরো মাটি জমাট না হওয়া পর্যন্ত টালির ভিতরে পলির প্রবেশ হ্রাস করিবার জন্য এই ঘাস দেওয়া হয়।

খোলা নালার সাহায্যে জলনিষ্কাশন (Surface Drainage)

একটি আর্দ্র স্থান হইতে অপর আর্দ্র স্থান পর্যন্ত চোখের আন্দাজে নালা কাটিয়া বড় নালা বা নদীতে গিয়া মিলিলে খোলা নালার কাজ করে। অনেক সময় ইহাকে **স্বাভাবিক পদ্ধতি** (natural system) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই প্রকার জল নিষ্কাশন পদ্ধতি অনেক সময় অতিরিক্ত ঢালু হইয়া পড়ে, ফলে ভূমিক্ষয় হয়, অথবা ইহা যথাযথ ঢালু হয় না, ফলে অতিরিক্ত জল দ্রুত নিষ্কাশিত হয় না।

ঢালু জমির নিচের দিকে ঢালের সহিত লম্বভাবে খোলা নালা কাটিয়া অনেক সময় উপরের জমির অতিরিক্ত জলের গতি পরিবর্তিত করিয়া নিষ্কাশন করা হয়; এ প্রকার জলনিষ্কাশন পদ্ধতিকে **গতি পরিবর্তন পদ্ধতি** (diversion system) বলে।

গ্রীড আইরন পদ্ধতিও (Grid iron system) এক প্রকার খোলা জলনিষ্কাশন পদ্ধতি। যে সকল জমির ঢাল একরূপ সে সকল জমিতে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। ইহার নালাগুলি লেখ (graph) কাগজের লাইনের ন্যায় সুনিয়ন্ত্রিত।

মাঠের খোলা নালা প্রায় খাড়া পাড়যুক্ত অপ্রশস্ত নালা হইতে পারে বা সরল পাড়যুক্ত V-আকৃতির হইতে পারে। ভারী ও বৃহৎ যন্ত্রপাতিসহ V আকৃতির নালা পার হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। যে সকল খামারে বৃহৎ যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় না, সে সকল খামারে সাধারণত অপ্রশস্ত নালাই কাটা হয়।

খাড়া পাড়যুক্ত অপ্রশস্ত নালা চাষ করা যায় না। যেখানে এপ্রকার বহু নালার প্রয়োজন হয় সেখানে প্রচুর জমির অপচয় হয়। V-আকৃতির নালাও চাষ করা যায় না ; কিন্তু ঐ সকল নালাতে ঘাস রোপণ করা যায় এবং ঐ ঘাস পশুখাদ্যরূপে ব্যবহার করা যায়। যে জমিতে ঘন ঘন এপ্রকার নালার প্রয়োজন হয়, সে জমিতে V-আকৃতির নালাগুলি অগভীর ও চওড়া করিয়া কাটা যায় এবং নালার পাড়ে অবশিষ্ট জমির মতই ফসলের চাষ করা যায়।

সমতল অঞ্চলে, জমির একপার্শ্বে একটি বড় নালা কাটা হয় এবং V-আকৃতির নালাগুলি হইতে জল ঐ নালায় গিয়া পড়ে। মাটি ও তাহার উপরি-পৃষ্ঠের অবস্থা ও কোন্ ফসলের চাষ করা হইবে সেই অনুসারে জমির নালাগুলি ৫০ হইতে ১৫০ ফুট বা ততোধিক দূরে দূরে খনন করা হয়। জমির পার্শ্বস্থ যে নালায় সকল জল আসিয়া জমা হয় ও নিষ্কাশিত হয় তাহার গভীরতা অনুসারে জমির নালার গভীরতা ১২ হইতে ২৪ ইঞ্চি পর্যন্ত হইতে পারে।

সকল কর্ষণ ক্রিয়া জমির নালার সমান্তরালভাবে করিতে হইবে। মোল্ড বোর্ড লাঙ্গলের সাহায্যে চাষ করিলে প্রথম খাত (back furrow) দুইটি নালার মাঝামাঝি করিতে হইবে এবং লাঙ্গল এমনভাবে চালাইতে হইবে যাহাতে মাটিগুলি প্রথম খাতের দিকে উল্টাইয়া পড়ে। ইহার ফলে জমি নালার দিকে ঢালু হইবে। কয়েক বৎসর ধরিয়া এই ভাবে লাঙ্গল চালাইলে জমির মধ্যস্থল উঁচু হইবে এবং নালার দিকে ক্রমশ ঢালু হইবে। যেখানে জমি যথাসাধ্য সমতল রাখা আবশ্যক সেখানে এ পদ্ধতি অবলম্বন বাঞ্ছনীয় নয়। যেখানে টালির নালার পরিপূরক হিসাবে জমির নালা কাটা হয় সেখানে অবশ্যই ঐভাবে লাঙ্গল চালনা উচিত নয়।

জমির নালা সুনিয়ন্ত্রিত কিনা, তাহার আকার ও আয়তন, ঢাল এবং জল কত দ্রুত তাহার মধ্যে প্রবেশ করে তাহার উপরে জমির জলনিষ্কাশন সন্তোষ-জনক কিনা তাহা নির্ভর করে। নালা যদি উঁচু নিচু হয়, তাহার মধ্যে যদি আগাছা জন্মায় বা জঞ্জাল জন্মে তবে নালায় সন্তোষজনকভাবে জল নিষ্কাশিত হয় না। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, জমির ঢাল, মাটির অবস্থা ও কোন ফসলের চাষ হইতেছে তাহার উপরে জল কত দ্রুত নালায় প্রবেশ করিবে তাহা নির্ভর করে। উপরোক্ত অবস্থা অনুসারে সাধারণ ঢাল সম্পন্ন ৬০০ একর জমির

নালা ও নির্গম নালা এরূপ হইবে যাহাতে ২৪ ঘন্টায় $\frac{১}{২}$ হইতে ৩ ইঞ্চি জল অপসারণ করা যায়।

জল প্রবাহিত হইবার সময় জমির পৃষ্ঠদেশ ও নালায় ভূমিক্ষয় হয়। এজন্য জলের গতিবেগ হ্রাস করা দরকার। এ উদ্দেশ্যে জমির স্বাভাবিক ঢাল অনুসারে নালা না কাটিয়া সমগ্র নালাকে ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক খণ্ডের ঢাল স্বল্পতর করিতে হইবে ; ঐ খণ্ডগুলির সংযোগস্থলে জল খাড়াভাবে নিচের নালায় পড়িবে ; ঐ স্থানে ভূমিক্ষয় নিবারণমূলক ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিতে হইবে।

জলসেচন পদ্ধতির জন্য জলনিষ্কাশন

(Drainage for Irrigation Systems)

প্রথম যখন জলসেচন আরম্ভ হয় তখন পর্যাপ্ত জল সংগ্রহই প্রধান সমস্যা হিসাবে গণ্য করা হইত। জলের উৎকর্ষ বা জলসেচন হেতু মাটি অতিরিক্ত আর্দ্র বা লাবণিক হইয়া পড়িতেছে কিনা, সে সম্পর্কে কোনরূপ বিচার-বিবেচনা করা হইত না। যথাযথ জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকার ফলে জলসিক্ত জমি ক্রমশ অতিরিক্ত আর্দ্র ও লাবণিক হইয়া পড়ে। **প্রত্যেক জলসিক্ত জমিতে যথাযথ জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকা একান্ত আবশ্যক।**

জলসিক্ত জমিতে গভীর অনুস্রবণ হেতু এবং সেচখাল ও জলাধার হইতে ক্ষরণহেতু জমিতে অতিরিক্ত যে জল জমে তাহা অপসারণের উদ্দেশ্যে জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা আবশ্যক। জমিতে অতিরিক্ত জল জমার মুখ্য কারণ প্রধান সেচখাল হইতে জলের গভীর অনুস্রবণ। অনেক ক্ষেত্রে ইঞ্জিনীয়ারগণ কৃষককে দোষারোপ করেন, কেননা তাহারা জমিতে অতিসেচ করে, সেজন্য জমিতে অতিরিক্ত জল জমে। যদিও অনেক ক্ষেত্রে ইহা সত্য, তবুও অনেক সময় সর্বোত্তম সেচপদ্ধতি অনুসরণ করিয়াও দেখা যায় জলপীঠ উপরে উঠিয়া আসিয়াছে। মুক্ত ভূগর্ভস্থ জলের পার্শ্ব চলন ও আর্টেজীয় কূপের (artisian well) মাধ্যমে আবদ্ধ জলের ঊর্ধ্বগতির ফলেও অতিরিক্ত জল জমা হয়। উভয় ক্ষেত্রেই জলের উৎস হইল সেচখাল হইতে ক্ষরণ বা জলসিক্ত জমি হইতে গভীর অনুস্রবণ। উঁচু জমিতে সতর্কতার সহিত জল প্রয়োগ করিলে

নিচু জমিতে জলনিষ্কাশনের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়। জলনিষ্কাশন সমস্যাকে ন্যূনতম অবস্থায় রাখিতে হইলে যথোপযোগী ও উৎকৃষ্ট সেচপদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে। সেচ ও জলনিষ্কাশন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

লবণতা ও জলনিষ্কাশনের সম্পর্ক সম্যকরূপে অনুধাবন করিতে হইবে। সেচ জল, মাটি ও অগভীর ভূগর্ভস্থ জলে লবণের আধিক্য থাকিলে জলনিষ্কাশনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। এক কথায় বলিতে গেলে, জলপীঠকে এমন স্তরে রাখিতে হইবে যাহাতে উদ্ভিদের মূল স্তরের প্রতি ভূগর্ভস্থ লাবণিক জলের ঊর্ধ্বগতি ন্যূনতম থাকে বা সম্পূর্ণরূপে রহিত হয়।

সংক্ষিপ্তসার

ভারতে পর্যাপ্ত জল আছে, কিন্তু জলের বন্টন ব্যবস্থা সুষ্ঠু নয়। সেচজলের বড় বড় আধার নির্মাণ বর্তমানে ভারতের সেচ পরিকল্পনার একটি প্রধান অঙ্গ। জলের অপচয় হ্রাস করিয়া, জল উত্তোলনের জন্য সুদক্ষ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া এবং সঠিক পরিমাণ জল প্রয়োগ করিয়া সীমিত পরিমাণ জলের সাহায্যেই ফলন বহুলাংশে বৃদ্ধি করা যায়। একর প্রতি ফসল ভিত্তিতে সেচজল বিক্রয় না করিয়া পরিমাণ ভিত্তিতে বিক্রয় করিলে কৃষকগণ সেচজল সম্পর্কে মিতব্যয়ী হইবে।

জমি প্লাবিত করিয়া জলসেচনে সেচজলের প্রচুর অপচয় ঘটে। এই পদ্ধতির পরিবর্তে বেসিন, নালা, বর্ডার বা স্প্রিঙ্কলার সেচ পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। এই অধ্যায়ে যে সকল সুপারিশ করা হইয়াছে, সেগুলি অনুসরণ করিয়া এবং নিজের বিচার-বিবেচনা অনুসারে সঠিক পরিমাণ সেচজল প্রয়োগ করা যায়।

সকল সেচপদ্ধতির পরিপূরক হিসাবে জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। টালি বা খোলা নালার বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসারে জলনিষ্কাশন করা যায়।

প্রশ্ন

১। সেচজলের অপচয় কি ভাবে হ্রাস করা যায়?

২। কোন্ সেচ পদ্ধতি সব চাইতে নিকৃষ্ট? ইহা জনপ্রিয় কেন? কি করিয়া ইহা বর্জন করা যায়?

৩। কখন সেচ আরম্ভ করিতে হইবে তাহা কি করিয়া কৃষক স্থির করিবে ?

৪। কখন কৃষক সেচ বন্ধ করিবে ?

৫। প্রত্যেক জলসিক্ত জমিতে জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজনীয়তা কি ?

সহায়ক পুস্তক

Aiyer, A. K. Yegna Narayan, *Principles of Crop Husbandry in India*, The Bangalore Press, Bangalore, Mysore State, 1957

Arakeri, H. R., G. V. Chalam, P. Satyanarayana, and Roy L. Donahue, *Soil Management in India*, Asia Publishing House, Bombay, Second Edition, 1962

Cross, Gwen, *Irrigating the Soil*, Farming Series Book Eight, Longmans Green, and Co., London, 1956

—*Draining the Soil*, Farming Series Book Seven, Longmans Green and Co., London, 1956

Donahue, Roy L., *Our Soils and Their Management*—An Introduction to Soil and Water Conservation, The Interstate, Danville, Illinois, U.S.A., Second Edition, 1961

—*Soils, An Introduction to Soils and Plant Growth*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey. 1958

Kherdekar. D. N., *Agricultural Engineering for Extension Workers*, Directorate of Extension, Ministry of Food and Agriculture, New Delhi. 1959

Mudaliar, V. T. Subbiah, *Principles of Agronomy*, The Bangalore Press, Bangalore, 1956

Thorne, D. W., and H. B. Peterson, *Irrigated Soil*, Second Edition, McGraw Hill Book Co., Inc., New York, 1954

When to Irrigate—When to Stop, All India Agricultural Information Short Course and Workshop, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, 1957

চতুর্থ অধ্যায়

আগাছা দমন

আগাছা কর্তৃক ক্ষতি (Damage Caused by Weeds)

যথাস্থানে না জন্মিয়া অন্য যে কোন স্থানে জন্মাইলে উদ্ভিদকে আগাছা বলা হয়। আগাছা হেতু ফসলের ফলন কমিয়া যায়, কেননা আলোক, মৃত্তিকার জল, পোষক দ্রব্য ইত্যাদির জন্য আগাছা ফসলের সহিত প্রতিযোগিতা করে ; আগাছা হেতু চাষের ব্যয় বৃদ্ধি পায়, ফসলের উৎকর্ষ হ্রাস পায়, জল সেচন ও নিষ্কাশন নালার সংরক্ষণ ব্যয় বৃদ্ধি পায় ; এবং আগাছা কীট-শত্রু ও রোগজীবাণুকে আশ্রয়দান করে।

ফসল অপেক্ষা আগাছা অপেক্ষাকৃত দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং ফসলের উপর ছায়া বিস্তার করে ; ফলে ফসল সূর্যকিরণ, জল, পোষকদ্রব্যসমূহ হইতে বঞ্চিত হয়। চওড়া পাতাবিশিষ্ট আগাছা দ্রুত ফসলের উপর ছায়া বিস্তার করে। দ্রুত বর্ধনশীল ফসল অপেক্ষা ধীরে বর্ধনশীল ফসল, বিশেষত ফসলের প্রাথমিক অবস্থায়, আগাছা হেতু অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পশুখাদ্যরূপে জোয়ার দ্রুত বৃদ্ধি পায়, ফলে আগাছা ইহার বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে না। তুলা গাছের বৃদ্ধি অতি শ্লথ, সেজন্য তুলা ফসলে আগাছা দমন একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। আর্দ্র অঞ্চলে বর্ষাকালে ছায়াজনিত ক্ষতি বেশি হয় কারণ আগাছা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং মাটি প্রায়ই সিক্ত থাকে বলিয়া মাধ্যমিক পরিচর্যা করা সম্ভব হয় না, তথা আগাছা অপসারণের সুযোগ পাওয়া যায় না।

আগাছার মাধ্যমে বাষ্পমোচন হেতু যে জলের অপচয় হয় তাহার পরিমাণ অনেক সময় বাষ্পীভবন, মাটির উপর দিয়া গড়ানো জল বা মাটির গভীরে প্রবিষ্ট জলের মোট পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশি। আগাছার মাধ্যমে বাষ্পমোচন

হেতু জলের অপচয় রোধ করিবার একমাত্র উপায় পরিচ্ছন্ন চাষ (clean cultivation) অনুসরণ করিয়া আগাছা নিয়ন্ত্রণ। অনেক কৃষক মনে করে, তাহাদের ফসলে একটি আগাছাও বৃদ্ধির সুযোগ পাইলে তাহাদের সুনাম কলঙ্কিত হয়। ভারতের সকল কৃষকের মধ্যে এই মনোভাব বিস্তার লাভ করিলে, কেবল যথাযথ আগাছা নিয়ন্ত্রণেই শতকরা ১০ হইতে ২৫ ভাগ ফলন বৃদ্ধি পাইবে।

মাটিতে পোষক দ্রব্যের অভাব ফসলের স্বল্প ফলনের একটি প্রধান কারণ। আগাছার মূলতন্ত্র অপেক্ষাকৃত সবল বলিয়া আগাছাই প্রথমে পোষক দ্রব্যাদি শোষণ করে। ফসলের জন্য পোষকদ্রব্য সামান্য মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সার প্রয়োগের পর ফসল অপেক্ষা আগাছা অধিকতর উদ্দীপ্ত হয়—ইহাই কৃষকের সাধারণ অভিজ্ঞতা। এ সমস্যার সমাধান হইল :

১) ফসলের একান্ত নিকটে সার প্রয়োগ করা যাহাতে আগাছা কর্তৃক গ্রহণের পূর্বেই উদ্ভিদ তাহা গ্রহণ করিতে পারে ; এবং

২) ফসলের সহিত প্রতিযোগিতার উপযোগী বড় হইয়া আগাছা যাহাতে বাড়িতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূমি কর্ষণের উদ্দেশ্য হইল আগাছা নিয়ন্ত্রণ। লাঙ্গল চালনা, বিদে-মই চালনা, সমতল-করণ, মই চালনা, দৃঢ়ীকরণ প্রভৃতি বীজতলা তৈয়ারি করিবার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার একটি উদ্দেশ্য হইল আগাছা নিয়ন্ত্রণ এবং অপর উদ্দেশ্য হইল উত্তম বীজতলা তৈয়ার। এই সকল কর্ষণ প্রক্রিয়া ছাড়াও বহুবার হাতনিড়ানি চালাইয়া আগাছা বিনাশ করিতে হয়।

ফসল আহরণের সময় বহু আগাছা ও আগাছার বীজও আহৃত হয়। ইহাতে ফসল নিকৃষ্ট হয় বা ফসল হইতে আগাছা পৃথক করিবার জন্য শ্রমিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। আগাছার বীজ, বিশেষ করিয়া ওকড়া বীজ হেতু মেষ ও ছাগল হইতে সংগৃহীত যথাক্রমে পশম ও লোমের উৎকর্ষ হ্রাস পায়।

আগাছার সংখ্যা বেশি হইলে, কীটশত্রু ও রোগের উপদ্রবও প্রায়ই বৃদ্ধি পায়, কারণ কীটশত্রু ও রোগজীবাণু তাহাদের জীবনচক্রের এক অংশ আগাছায় কাটায়। সেজন্য পরিচ্ছন্ন মাধ্যমিক পরিচর্যা কীটশত্রু ও রোগজনিত ক্ষতি হ্রাস করে। যেমন ধান খেতের চারপাশের আইলে যে আগাছা জন্মায় তাহা গল ফ্লাইকে (gall fly) আশ্রয় দান করে ; ঐ সকল আগাছা ধ্বংস করিলে গল ফ্লাই জনিত ক্ষতি হ্রাস করা যায়। আলু ও লঙ্কার কোঁকড়ানো পাতার জন্য দায়ী

জাবপোকা খেতের চারিপাশের আইল ও পতিত জমির আগাছাতে বাস করে। অনুরূপভাবে অনেক বিষাণু (virus) ও ব্যাকটিরিয়া যখন ফসল থাকে না তখন আগাছায় আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ফসল রোপণ করিলে তাহাকে আক্রমণ করে।

জল নিকাশী ও সেচের নালায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আগাছা জলের গতি হ্রাস করে। ইহার ফলে নালার জল বহন ক্ষমতা কমিয়া যায়। নালাকে আগাছা মুক্ত রাখা সরকার ও কৃষক উভয়েরই পক্ষে একটি ব্যয়বহুল কাজ; কিন্তু নালার জল বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আগাছা বীজের বিস্তার রোধের জন্য ইহা করিতেই হইবে।

আগাছার বিস্তার রোধ (**Preventing the spread of weeds**)

নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিয়া আগাছার অনুপ্রবেশ রোধ করা যায়ঃ

১) আগাছার বীজমুক্ত বীজের ব্যবহার;

২) অঙ্কুরোদ্গমশীল আগাছার বীজমুক্ত খামারজাত সার ও কম্পোস্ট তৈয়ার ও ব্যবহার;

৩) বীজ ধারণের পূর্বেই জলনিকাশী ও সেচ নালা এবং রাস্তার পার্শ্বে ও পতিত জমিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আগাছার বিনাশ সাধন।

প্রায় সর্বদাই ফসলের বীজের সহিত আগাছার বীজ মিশ্রিত থাকে। এভাবে আগাছার অনুপ্রবেশ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কোন কোন দেশে বীজ আইন প্রবর্তন করা হইয়াছে। এই আইনে শতকরা নির্দিষ্ট ভাগের অধিক কতকগুলি অনিষ্টকর আগাছার বীজযুক্ত কয়েকটি ফসলের বীজ বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। আইনের সকল শর্ত পূরণ করিতে পারিলে তবে বীজকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। বীজ বিক্রয়কারী বীজের প্রত্যেক বস্তার গায়ে একটি মুদ্রিত লেবেল আঁটিয়া দিতে বাধ্য থাকে এবং তাহাতে বীজে অনিষ্টকর আগাছা বীজের শতকরা হার লিখিত থাকে। নিয়মিত বীজের নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণহেতু বীজ আইন অমান্য করা সম্ভব হয় না।

১৯১৯ সালে আন্তর্জাতিক ফসল উন্নয়ন সংঘ (International Crop Improvement Association) গঠিত হয়। বিভিন্ন দেশের গবেষণা কেন্দ্র সমূহ কর্তৃক অনুমোদিত কয়েকটি জাতের অতি উৎকৃষ্ট বীজের উৎপাদন, সনাক্ত-করণ ও বিতরণে সহায়তা করা এই বেসরকারী সংস্থার উদ্দেশ্য। পৃথিবীর সকল

দেশই এ প্রকার সংস্থায় যোগদান করিয়া ও তাহাতে অংশগ্রহণ করিয়া লাভবান হইতে পারে। ভারত এখনও এই সংস্থায় যোগ দেয় নাই।

আন্তর্জাতিক বীজ পরীক্ষা সংঘ (International Seed Testing Association) সকল ফসল ও সব্‌জি বীজের বিশুদ্ধতার মান নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। ভারতে বর্তমানে কোন বীজ আইন নাই, কাজেই ফসলের বীজের সহিত আগাছার বীজের অনুপ্রবেশ রোধ করিবার কোন ব্যবস্থা নাই; কেবল বিভিন্ন বন্দরে বীজ প্রবেশের পূর্বে শুল্ক বিভাগের কর্মচারীগণ গতানুগতিক সঙ্গরোধ (quarantine) ব্যবস্থা অবলম্বন করে। কৃষকগণ যাহাতে উৎকৃষ্ট বীজ পাইতে পারে, সে উদ্দেশ্যে নূতন দিল্লীস্থ ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (Indian Agricultural Research Institute) ও রাজ্য কৃষি বিভাগগুলি বীজ পরীক্ষাগার স্থাপন করিয়াছে। কি ভাবে বীজ পরীক্ষা করানো যায় সে সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য ঐ প্রতিষ্ঠান বা রাজ্য কৃষি বিভাগকে লিখিয়া জানা যায়।

পশুখাদ্যের সহিত কোন বীজ পশু খাইলে তাহা অবিকৃত অবস্থায় মলের সহিত বাহিরে আসিয়া সারের মাধ্যমে জমিতে প্রবেশ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ গরুকে শুইবার জন্য যে খড় বিছাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইতেও সারে আগাছার বীজ মিশ্রিত হইতে পারে। খামারজাত সার বা কম্পোস্ট সম্পূর্ণরূপে বিযোজিত হইলে বিযোজনকালে উদ্ভূত তাপ হেতু আগাছা বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা হ্রাস পায়। খামারজাত যে সার উল্টাইয়া দেওয়া হয় না এবং যথাযথভাবে জমা করা হয় না, তাহাতে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাসম্পন্ন আগাছা বীজ থাকিবার সম্ভাবনা বেশি এবং এভাবে চাষের জমিতে আগাছা প্রবেশ লাভ করে। যথাযথ বিযোজিত সার ব্যবহার করিয়া আগাছার অনুপ্রবেশ হ্রাস করা যায়। তৃতীয়তঃ সারের গর্তের চার পাশে এবং গর্তের মধ্যে জমা করা সারের উপর যে আগাছা জন্মায় তাহা হইতেও সারে বীজ মিশ্রিত হইতে পারে। কাজেই সারের গর্তের চার পাশে এং গর্তের মধ্যে সারের গাদার উপরে যে আগাছা জন্মায় বীজ-ধারণের পূর্বেই তাহাদের অপসারণ করিতে হইবে।

সেচ নালা, জলনিকাশী নালা, বাঁধ, রাস্তার দুই পার্শ্ব ও পতিত জমিতে সর্বদাই আগাছা জন্মায়। বীজ ধারণের পূর্বেই এ সকল আগাছা কাটিয়া ফেলিলে, ইহাদের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই সকল কর্তিত আগাছা পশু খাদ্য, সবুজসার বা গোমহিষাদির বিছানারূপে ব্যবহার করা যায়। আগাছা

উচ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্যে বাঁধ ও পতিত জমিতে উপকারী উদ্ভিদ রোপণের জন্য সরকার সম্প্রতি কৃষকদের উৎসাহিত করিতেছেন।

আগাছা নিয়ন্ত্রণে যান্ত্রিক পদ্ধতি
(Mechanical Methods to Control Weeds)

হাতে নিড়ানো, কর্ষণ ও পোড়ানো হইল আগাছা নিয়ন্ত্রণের প্রধান যান্ত্রিক পদ্ধতি।

ভারতের অধিকাংশ গ্রাম অঞ্চলে হাতে আগাছা তুলিবার জন্য দৈনিক ১৲ হইতে ২৲ টাকা মজুরীতে শ্রমিক পাওয়া যায়। এজন্য সাধারণত হাত দ্বারাই আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কাস্তে, খুরপি বা উন্নত কোদাল ইত্যাদি যন্ত্রপাতি সচরাচর ব্যবহার করা হয়।

লাঙ্গল চালনা আগাছা হ্রাস করিবার একটি উত্তম পদ্ধতি। কারণ ইহার ফলে আগাছা মূলসহ উৎপাটিত হয়। অপেক্ষাকৃত ছোট আগাছা দমনে বিদে মই (Harrow) বিশেষ কার্যকরী। অনুরূপভাবে উন্নত কোদালের সাহায্যে যথা-সময়ে মাধ্যমিক পরিচর্যাও আগাছা দমনে সহায়তা করে। বর্ষজীবী ও অগভীর মূলবিশিষ্ট বহুবর্ষজীবী আগাছা বীজধারণের পূর্বে কর্ষণ প্রক্রিয়াসমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অবশ্য বহুবর্ষজীবী আগাছার অঙ্গসমূহ মরিয়া না যাওয়া পর্যন্ত উহা যাহাতে পুনরায় শিকড় বিস্তার করিতে না পারে সেজন্য বেশ কয়েকবার মাটি উলটপালট করিয়া দিতে হয়। কর্ষণ প্রক্রিয়া দ্বারা গভীর মূলবিশিষ্ট আগাছা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হইল বারংবার আগাছার উপরের অংশ বিনষ্ট করিয়া মূলের সঞ্চিত খাদ্য নিঃশেষ করিয়া দেওয়া। অবশ্য কর্ষণ দ্বারা সকল বহুবর্ষজীবী আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

চারা উৎপাদনের পূর্বে বীজতলার উপরিভাগ পুড়াইয়া দিবার প্রধান উদ্দেশ্য হইল আগাছার বিনাশসাধন। ধীরে ধীরে পুড়াইলে ইহা খুবই কার্যকরী হয়, কিন্তু দ্রুত পুড়াইলে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। অনাবাদী জমিতে অগ্নি বিচ্ছুরকের সাহায্যে সজীব আগাছা বীজধারণের পূর্বে পুড়াইয়া ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে তুলা, ভুট্টা ও ইক্ষুতে ইহা সাফল্যের সহিত অনুসরণ করা হইয়াছে। ফসলের গোড়ার দিকে অগ্নি বিচ্ছুরণ করা হয়; ফলে কোমল আগাছা পুড়িয়া যায়, কিন্তু স্বল্প অনুভূতি সম্পন্ন ফসলের কাণ্ডের কোন ক্ষতি হয়

না। কোন কোন আগাছার মাটির নিম্নস্থ অংশের কোন ক্ষতি হয় না এবং তাহা আবার বাড়িতে আরম্ভ করে। ভারতে তামাকের বীজতলা ব্যতীত আগাছা নিয়ন্ত্রণের জন্য সচরাচর এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় না।

আগাছা নিয়ন্ত্রণে শস্য পর্যায়
(Cropping System to Control Weeds)

কোন কোন ফসলের সহিত প্রতিযোগিতায় আগাছা পারিয়া উঠে না; আবার কোন কোন ফসলে আগাছার উপদ্রব বৃদ্ধি পায়। যেমন পশু খাদ্যরূপে জোয়ার এবং শন, মিষ্টি আলু প্রভৃতি দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং আগাছার সহিত সন্তোষজনকভাবে প্রতিযোগিতা করে। যদি এই সকল ফসলের যথাযথ যত্ন লওয়া হয়, উত্তম বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সার প্রয়োগ করা হয় এবং ঘন ফসলের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি বীজ ব্যবহার করা হয় তবে আগাছা নিয়ন্ত্রণে ইহারা বিশেষ কার্যকরী হয়।

শস্যপর্যায়ে আলু, লঙ্কা, তুলা, তামাক, চীনাবাদাম প্রভৃতি ফসল অন্তর্ভুক্ত করিলে পরবর্তী ফসলের জন্য আগাছা নিয়ন্ত্রিত হয়, কারণ এই সকল ফসলে বারংবার মাধ্যমিক পরিচর্যার আবশ্যক হয়। অপর পক্ষে, সব্‌জি ও অন্যান্য জলসিক্ত (irrigated) ফসলে আগাছা বংশবৃদ্ধি ও বিস্তারের অধিকতর সুযোগ পায়।

অধিক জলসিক্ত ফসলের সহিত কয়েকপ্রকার আগাছাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। একই শস্য পর্যায় ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করিলে সাধারণত কয়েক প্রকার বহুবর্ষজীবী আগাছার উপদ্রব সৃষ্টি হয়। এই সকল ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর শস্য পর্যায় পাল্টানো উচিত। পরিচ্ছন্ন চাষ-সম্পন্ন, দ্রুত বর্ধনশীল এবং পুরু আস্তরণ সৃষ্টিকারী ফসলসহ এমন শস্যপর্যায় অনুসরণ করিতে হইবে যাহাতে কয়েকপ্রকার আগাছা শস্যপর্যায়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

আগাছা নিয়ন্ত্রণে রাসায়নিক পদার্থ
(Chemicals to Control Weeds)

ভারতে আগাছানাশক নানাপ্রকার ঔষধ ব্যবহার করা হইয়াছে, দেখা গিয়াছে যে তন্মধ্যে 2,4-D সর্বাধিক কার্যকরী।

প্রায় পনর বৎসর পূর্বে 2, 4-D সর্বপ্রথম নির্বাচিত আগাছা নাশকরূপে ব্যবহার করা হয়। 'নির্বাচিত' বলিতে এই বুঝায় যে নির্দেশ অনুসারে ব্যবহার করিলে ইহা চওড়া পাতা-সম্পন্ন আগাছাকে ধ্বংস করে কিন্তু সরু পাতা-সম্পন্ন আগাছা বা সরু পাতা-বিশিষ্ট, ঘাস জাতীয় ফসলের কোন ক্ষতি হয় না। যেমন তৃণাবৃত বাগান (lawn), গম বা ইক্ষু খেতে 2, 4-D প্রয়োগ করিলে চওড়া পাতা-বিশিষ্ট আগাছা ধ্বংস হয় কিন্তু ঘাস, গম ও ইক্ষুর কোন ক্ষতি হয় না।

সস্তা, কার্যকরী, প্রয়োগ করা সহজ, মানুষ বা পশুর কোন ক্ষতি করে না বলিয়া 2, 4-D খুবই জনপ্রিয়। 2, 4-D সাধারণতঃ ধাতব লবণ (metallic salts), অ্যামাইন লবণ (amine salts), এস্টার (ester) প্রভৃতিরূপে তৈয়ারি হয়। ইহাদের মধ্যে ধাতব লবণ স্বল্প কার্যকরী, অ্যামাইন লবণ আরও বেশি কার্যকরী এবং এস্টার সর্বাধিক কার্যকরী।

রাসায়নিক গঠন, আগাছার প্রকার, ফসলের প্রকার, প্রয়োগকালে ফসল ও আগাছার বৃদ্ধি, ও আবহাওয়ার অবস্থার উপর, 2, 4-*D* এর মাত্রা নির্ভর করে। সাধারণত একর পিছু ½ পাউণ্ড হইতে ২ পাউণ্ড পর্যন্ত অ্যাসিডের তুল্যাঙ্ক (Equivalent) মাত্রায় 2, 4-D প্রয়োগ করা হয়। মহারাষ্ট্র রাজ্যের পুণা কৃষি কলেজ কৃষিক্ষেত্রে নানা পরীক্ষায় জানা যায় যে ইক্ষু, আলু, আদা প্রভৃতি মাটির উপরে নির্গত হইবার পূর্বেই 2, 4-D প্রয়োগ করিলে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ফসল রোপণের পাঁচ দিন পরে একবার এবং পঁচিশ দিন পরে আর একবার একর পিছু ৮০ গ্যালন জলে ১'৪ পাউণ্ড অ্যাসিড তুল্য 2, 4-D মিশাইয়া প্রয়োগ করিয়া ছয় সপ্তাহের জন্য প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ আগাছা দমন করা যায়। একর পিছু প্রায় ১৫৲ টাকার মত ব্যয় হয়। সুফল পাইতে হইলে 2, 4-D ব্যবহারকারীগণ যেন সর্বদাই প্রস্তুতকারকের নির্দেশ মানিয়া চলেন। নিম্নলিখিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসমূহ সর্বদাই অনুসরণ করিতে হইবে :

(১) সর্বদাই অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করিতে হইবে মাত্রাধিক্যে ফসল মারা যাইতে পারে।

(২) প্রবল বায়ু প্রবাহকালে বিশেষ করিয়া তুলা, ঢেঁড়স, টোম্যাটো প্রভৃতি অনুভূতিসম্পন্ন ফসল নিকটে থাকিলে 2,4-D ছিটানো চলে না ;

(৩) **2, 4-D ছিটাইবার জন্য ব্যবহৃত পাত্র কীটনাশক বা**

রোগনাশক ঔষধ ছিটাইবার জন্য কখনও ব্যবহার করা চলে না, কারণ কৃষকের বাড়ীতে বা খামারে স্প্রেয়ার বা ডাস্টারকে সম্পূর্ণ **2, 4-D** মুক্ত করা সম্ভব হয় না।

(৪) কীটনাশক ঔষধের নিকটে 2, 4-D মজুত করা উচিত নয়, কারণ ভুলবশত একটি অপরটির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইতে পারে।

মুথা ঘাস নিয়ন্ত্রণ (**Control of nut grass**)

(*Cyperus species*)

ভারতের বহু অঞ্চলে বিশেষত জলসিক্ত অঞ্চলে বহুবর্ষজীবী মুথা ঘাসের উপদ্রব খুবই প্রবল। ইহার মাটির উপরের অংশ পাতার স্তবকদ্বারা গঠিত এবং প্রতি স্তবকে তিনটি করিয়া পাতা থাকে। কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদে দেখা যায়, ইহা ঘাসের ন্যায় চ্যাপটা নয় কিন্তু ত্রিকোণবিশিষ্ট। ইহার মৃদ্‌গত অংশ রাইজোম দ্বারা গঠিত এবং রাইজোমের প্রান্ত হইতে নাট (nut) ও মূল উৎপন্ন হয়। নাটগুলি প্রথম অবস্থায় সাদা ও সরস থাকে এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহারা লালচে-তামাটে এবং অবশেষে কালো হইয়া যায়। এই নাটগুলি আবার দুই প্রকার। এক শ্রেণী মাটির উপরিস্তরে থাকিয়া মাটির উপরের অংশ গঠন করে, অপর শ্রেণী মাটির গভীরে প্রবেশ করিয়া নূতন নাট গঠন করে। সাধারণত খরিপ ঋতুতে (গ্রীষ্মকালে) ইহারা বৃদ্ধি পায়, মাটির আর্দ্রতা সন্তোষজনক থাকিলে ইহারা বৎসরের যে কোন সময়ে বাড়িতে পারে।

মুথা প্রধানত নাটের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। বীজের যদিও শতকরা দুই ভাগ মাত্র অঙ্কুরোদ্গমশীল থাকে তবুও বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তারও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেখা গিয়াছে যে, পাতা নির্গত হইবার পর কুড়ি দিনের মধ্যে প্রথম নাট গঠিত হয় এবং পরবর্তী কুড়ি দিনের মধ্যে এই নূতন নাট অঙ্কুরিত হয় ও পাতা ছড়ায়। মাটির উপরের ছয় ইঞ্চি স্তরে অধিকাংশ রাইজোম ও নাট থাকে ; অবশ্য এই স্তরের গভীরতা মাটির শ্রেণী অনুসারে কম বেশি হইতে পারে। এঁটেল মাটিতে নাট অগভীর স্তরে থাকে, দোআঁশ মাটিতে নাট গভীর স্তরে প্রবেশ করে (চিত্র নং ২৪)।

মুথা দমন করিবার জন্য নানা প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে।

ইহাদের মধ্যে আগাছার অঙ্গজ বৃদ্ধি কালে পনর দিন অন্তর বলদ টানা মোল্ড বোর্ড লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ সর্বাধিক কার্যকরী। যে সকল অঞ্চলে শ্রমিক খুবই সস্তা এবং যান্ত্রিক শক্তি পাওয়া যায় না, লোহার শাবলের সাহায্যে ছয় ইঞ্চি গভীর করিয়া মাটি উল্টাইয়া দিলে রাইজোম ও নাট উপরে উঠিয়া আসে এবং বায়ু ও সূর্যকিরণের প্রভাবে শুকাইয়া যায়। অনুরূপভাবে গাজর বা পশুখাদ্যের জন্য জোয়ার প্রভৃতি আবরণ সৃষ্টিকারী ফসলের চাষ এই আগাছা দমনে বিশেষ কার্যকরী।

একর প্রতি ২ পাউণ্ড অ্যাসিড তুল্য 2, 4-D সোডিয়াম বা অ্যামাইন লবণ-রূপে প্রয়োগ করিলে মাটির উপরের অংশ এবং মাটির ভিতরে ছয় ইঞ্চি নিচে পর্যন্ত প্রায় অর্ধেক নাট বিনাশপ্রাপ্ত হয়। মুথা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে ন্যূনতম জলসিক্ত (irrigated) ফসল সহ পশুখাদ্যের জন্য জোয়ার, গাজর, লঙ্কা, বেগুন প্রভৃতি আবরণ সৃষ্টিকারী ফসল সহ শস্যসূচী প্রণয়ন করিতে হইবে এবং তাহা অনুসরণ করিতে হইবে।
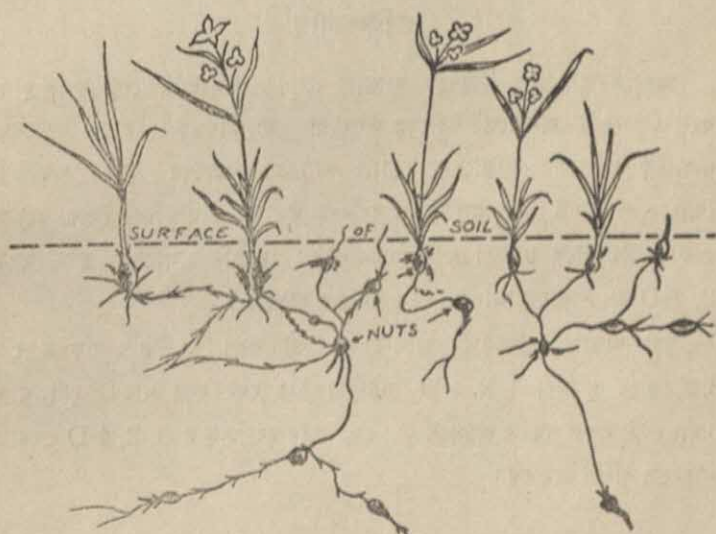
চিত্র নং ২৪। মুথা অত্যন্ত অনিষ্টকর আগাছা, কারণ ইহা মূলে কিছুদূর পর পর নাট সৃষ্টি করে এবং তাহার সাহায্যে বংশবিস্তার করে।

[H. R. ARAKERI মহাশয়ের সৌজন্যে]।

দূর্বা ঘাস নিয়ন্ত্রণ

(Control of Dub Grass) (Bermuda Grass)

Cynodon daetylon

ভারতের প্রায় সর্বত্রই এই ঘাস জন্মায়। ইহা বিশেষ করিয়া আর্দ্র উর্বর মাটিতে, রাস্তার দুই ধারে এবং ফসলের জমিতে বৃদ্ধি পায়।

পশুখাদ্য ও বাগানের ঘাস হিসাবে ইহা বিশেষ উপযোগী, কিন্তু ফসলের জমিতে ইহা অবাঞ্ছিত বলিয়া ইহা আগাছারূপে পরিগণিত হয়।

লতানো (creeping) কাণ্ডের সাহায্যে অঙ্গজ জনন, অগভীর রাইজোম ও বীজের মাধ্যমে ইহা বংশবিস্তার করে।

উষ্ণ ও শুষ্ক ঋতুর প্রারম্ভে গভীর কর্ষণ করিয়া পরে বারংবার অগভীর কর্ষণ দ্বারা দূর্বা ঘাস স্বল্প ব্যয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আর্দ্র ঋতুতে অবশ্য ঘাসকে মূলসহ উৎপাটিত করিয়া অপসারণ করা আবশ্যক।

সংক্ষিপ্তসার

অস্থানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উদ্ভিদকে আগাছা বলে। আগাছা ফসলের ফলন হ্রাস করে এবং ছোট অবস্থাতেই ইহাদের অপসারণ করা আবশ্যক। হাতে নিড়ানো, মাধ্যমিক পরিচর্যা, পোড়ানো ইত্যাদি আগাছা নিয়ন্ত্রণের যান্ত্রিক পদ্ধতি। জোয়ার, শন, মিষ্টি আলু প্রভৃতি ঘন বর্ধনশীল ফসলের চাষ করিলে ইহারা কয়েক প্রকার আগাছাকে ঢাকিয়া ফেলিয়া দমন করে। সম্প্রতি রাসায়নিক দ্রব্য, যেমন 2, 4-D এর সাহায্যে আগাছা দমন জনপ্রিয় হইয়াছে।

মুথা অত্যন্ত অনিষ্টকারী আগাছা। গভীর কর্ষণ, বা উষ্ণ ও শুষ্ক ঋতুতে গভীরভাবে খুঁড়িয়া বা 2, 4-D ছিটাইয়া ইহা দমন করা যায়। দূর্বা ঘাস দমনেও ঐ সকল পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, তবে দূর্বা ঘাস দমনে 2, 4-D প্রয়োগ ব্যয়বহুল বলিয়া মনে হয়।

প্রশ্ন

১) মুথা ও দূর্বা ঘাস কি প্রকারে দমন করা যায়?

২) 2, 4-D ব্যবহারে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়?

সহায়ক পুস্তক

Aiyer, A. K. Yegna Narayan, *Principles of Crop Husbandry in India,* The Bangalore Press, Bangalore, Mysore State, 1957

Ahlgren, G. H., G. C. Klingman and D. E. Wolf, *Principles of Weed Control,* John Wiley and Sons, Inc., New York, 1951

Soils : An Introduction to Soils and Plant Growth, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1958

Martin, John H. and Warren H. Leonard, *Principles of Field Crop Production,* The Macmillan Co., New York, 1949

Mudaliar, V. T. Subbiah, *Principles of Agronomy,* The Bangalore Press, Bangalore, 1956

Pugh, B. M., and C. P. Dutt, *Crop Production in India,* Allahabad Agricultural Institute, Allahabad, 1940

Pyenson, Louis L., *Elements of Plant Protection,* John Wiley and Sons, Inc., New York, 1951

Robbins, W. W., A. S. Crafts and R. N. Raynor, *Weed Control,* McGraw Hill Book Co., Inc., New York, 1959

পঞ্চম অধ্যায়

শস্য-পর্যায়

শস্য পর্যায় বা পর্যায়ক্রমে চাষ বলিতে একই জমিতে পৌনঃপুনিকভাবে বিভিন্ন প্রকার শস্যের আবর্তন বুঝায়। জমির উর্বরতা বজায়, কৃষকের সর্বোচ্চ নীট লাভ এবং আগাছা, রোগ ও কীট শত্রুর আক্রমণের হাত হইতে ফসলকে রক্ষা করাই শস্য পর্যায়ের প্রধান উদ্দেশ্য। উক্ত উদ্দেশ্যসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া একই জমিতে ক্রমানুসারে বিভিন্ন ফসলের চাষ করাকে পর্যায়ক্রমে চাষ বলে।

শস্য-পর্যায় সম্পর্কে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

শস্য পর্যায় স্থির করিবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হইবে।

(১) জমির প্রকারভেদ অনুসারে উৎপাদন সহায়ক অন্যান্য উপাদানগুলির যোগান সাপেক্ষে কোন্ শস্য পর্যায়ে কৃষককের সর্বোচ্চ লাভ হবে। অর্থাৎ একই জমির পক্ষে উপযোগী বিভিন্ন শস্য পর্যায়ের মধ্যে কোনটিতে কৃষকের লাভ সর্বাধিক হইবে তাহা বিবেচনা করিতে হইবে।

(২) কৃষকের যদি গৃহপালিত পশু থাকে, তবে শস্য পর্যায় এমনভাবে নিবারণ করিতে হইবে যাহাতে ঐ পর্যায়ে মানুষের খাদ্য ও অন্যান্য অর্থকরী ফসলের (আলু, ইক্ষু, পাট ইত্যাদি) সহিত পশুখাদ্য ফসলও থাকে।

(৩) যে ফসলে প্রচুর পরিমাণে সার প্রয়োগ করিতে হয়, শস্য পর্যায়ে এমন

ফসলের চাষ করা দরকার। আলু, আখ, ভুট্টা প্রভৃতি এই প্রকার ফসল। এ সকল ফসলে প্রযুক্ত সারের অবশিষ্টাংশ দ্বারা অপর একটি ফসলের চাষ করা যায়।

(৪) শস্য পর্যায়ে একটি সবুজ সার ফসল অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। সবুজ সার জমিতে জৈব পদার্থ যোগ করে এবং তাহার ফলে জমির ভৌত গঠন উন্নত হয়।

(৫) একটি শিম্বি-গোত্রীয় ফসলও শস্য পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। ইহা সবুজ সার বা সাধারণ ফসল হিসাবে চাষ করা যায়। এ প্রকার ফসল অর্বুদ ব্যাকটেরিয়ার (nodule bacteria) সাহায্যে বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে। ফলে সাধারণ ফসল হিসাবে চাষ করিলে মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সবুজ সার রূপে চাষ করিলে মাটিতে নাইট্রোজেন যোগ হয়।

(৬) একই গোত্রভুক্ত ফসল পর পর চাষ করা উচিত নয়। ইহাতে বিশেষ আগাছা, রোগ বা কীটশত্রুর আক্রমণ বৃদ্ধি পাইতে পারে।

(৭) যে সকল ফসলে নিড়েন দেওয়া হয়, এরূপ একটি ফসলকে শস্য পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। ইহার ফলে জমি আগাছা-মুক্ত থাকে।

(৮) যে সকল ফসলের মূলবিন্যাস একই প্রকার ঐরূপ ফসল পর পর চাষ করা উচিত নয়। যেহেতু ঐ সকল ফসল জমির একটি বিশেষ স্তর হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে, সেহেতু ঐরূপ চাষে ঐ বিশেষ স্তরে খাদ্য নিঃশেষিত হইবে অথচ অন্যান্য বৃক্ষখাদ্য অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে।

শস্য পর্যায়ের সুবিধা

সুষ্ঠু শস্য পর্যায়ের অনেকগুলি সুবিধা আছে। যথা:

(১) **মূলধন ও শ্রমিকের সুষম বণ্টন**—কৃষকের সকল জমিতে যদি কেবল একই ফসলের চাষ করা হয় তাহা হইলে বৎসরের কোন সময়ে মূলধন নিয়োজিত থাকিবে আবার কোন সময়ে মূলধনের নিয়োগের কোন সুযোগ থাকিবে না। অনুরূপভাবে কৃষি শ্রমিকেরাও বৎসরের এক সময়ে কাজ পায়, অন্য সময়ে বেকার হইয়া পড়ে। স্থায়ী শ্রমিককে লাভজনকভাবে সারা বৎসর নিযুক্ত রাখা যায়। পশ্চিমবঙ্গে আমন ধানের চাষ ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

এ ফসলের চাষ কালে শ্রমিকেরা কাজ পায়; কিন্তু ফসল উঠিবার পর পুনরায় ধান রোপণের মরশুম না আসা পর্যন্ত কৃষি মজুরেরা কাজ পায় না এবং ঐ সময়ে ইহাদের বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য সরকারকে প্রচুর টাকা টেস্ট রিলিফের মাধ্যমে ব্যয় করিতে হয়।

আবার ধান রোপণ ও কাটিবার সময় শ্রমিকের চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, ফলে মজুরীর হারও আকাশচুম্বী হইয়া উঠে এবং চাষের খরচ বাড়িয়া যায়। কিন্তু কৃষকের বিভিন্ন জমিতে এক সময়ে একই ফসলের চাষ না করিয়া বিভিন্ন ফসলের চাষ করিলে শ্রমিকেরা সারা বৎসর কাজ পায় এবং স্থায়ী শ্রমিকদিগকে লাভজনকভাবে সারা বৎসর কার্যে ব্যাপৃত রাখা যায়।

(২) **উদ্ভিদ খাদ্যের সুষম বণ্টন**—বিভিন্ন উদ্ভিদের খাদ্যের চাহিদা বিভিন্ন। কোন উদ্ভিদের নাইট্রোজেনের চাহিদা অধিক, আবার কোন উদ্ভিদের পটাশিয়মের চাহিদা বেশি; আবার হয়ত কোন উদ্ভিদের ফসফেটের অধিক প্রয়োজন হয়। অতএব ক্রমাগত একই জমিতে একই ফসলের চাষ করিলে জমি হইতে বিশেষ কয়েকটি খাদ্য অপসারিত হইবে এবং অন্যান্য বৃক্ষ খাদ্য অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে।

আবার বিভিন্ন ফসলের মূলবিন্যাস বিভিন্ন প্রকার। কোন ফসলের মূল জমির খুব গভীরে প্রবেশ করে; কোন ফসলের মূল মাত্র জমির কয়েক ইঞ্চি নীচে প্রবেশ করে, অপরপক্ষে কোন ফসলের মূল এ দুই শ্রেণীর মাঝামাঝি। অতএব কোন ফসল বৎসরের পর বৎসর একই জমিতে চাষ করিলে জমির একটি বিশেষ স্তর হইতে বৃক্ষ খাদ্য দ্রুত অপসারিত হয়। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ফসলের চাষ করিলে বৃক্ষখাদ্যের সুষম বণ্টন সম্ভব হয়।

(৩) **আগাছা দমন**—বিশেষ কয়েকটি ফসলের সঙ্গে বিশেষ কয়েকটি আগাছা বৃদ্ধি পায়। ক্রমাগত একই জমিতে ঐ একই ফসলের চাষ করিলে আগাছাগুলি দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং তাহাদের দমন ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু পর্যায়ক্রম চাষে যেহেতু একটি ফসলের পর অপর ফসলের চাষ করা হয়, সেহেতু ঐ বিশেষ আগাছাগুলি প্রতিকূল পরিবেশে মরিয়া যায়।

আবার পর্যায়ক্রম চাষে যেহেতু জমি প্রায় সারা বৎসরই কর্ষিত অবস্থায় থাকে, সেহেতু কোন আগাছা জন্মাইবার সুযোগ পায় না।

(৪) **রোগ ও কীটশত্রু দমন**—আগাছার ন্যায় ফসল বিশেষে রোগ ও কীটশত্রুও বিভিন্ন হয়। ধানে যে রোগ ও কীটশত্রুর আক্রমণ হয়, ভুট্টার রোগ ও কীটশত্রু তাহা হইতে পৃথক। ক্রমাগত একই জমিতে একই ফসলের চাষ করিলে ঐ ফসলের রোগ ও কীটশত্রুর আক্রমণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পর্যায়ক্রমে একই জমিতে বিভিন্ন প্রকার ফসলের চাষ করিলে ঐ সকল রোগ ও কীটশত্রু দ্রুত বংশবিস্তারের সুযোগ পায় না।

(৫) **প্রতিকূল আবহাওয়ায় ফসল বিনষ্ট হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস**—শস্য পর্যায় অনুসরণ করিলে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে কৃষকের বিভিন্ন জমিতে বিভিন্ন ফসলের চাষ হয়। কাজেই বৎসরের কোন এক সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা রোগ ও কীটশত্রুর আক্রমণে ফসল নষ্ট হইলে কৃষক অন্যান্য ফসল হইতে সে ক্ষতির কিছুটা পূরণ করিতে পারে। কিন্তু এক সময়ে কৃষকেরা সকল জমিতে একই ফসলের চাষ করিলে এবং সে ফসল যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা হইলে কৃষক চরম দুর্দশার সম্মুখীন হইয়া পড়ে।

(৬) **বিপণনে ক্ষতির সম্ভাবনা হ্রাস**—শস্য পর্যায় অনুসরণ করিলে সারা বৎসরই কৃষক কোন না কোন ফসল বিক্রয় করিতে পারে এবং তাহার মূলধন আবদ্ধ হইয়া থাকে না। তাহা ছাড়া বাজারে যদি হঠাৎ কোন ফসলের দাম হ্রাস পায় তবে সে ফসল গুদামে রাখিয়া অন্য ফসল বিক্রয় করিয়া কৃষক চালাইতে পারে। পরে ঐ ফসলের দাম বাড়িলে তাহা বিক্রয় করিয়া কৃষক লাভবান হইতে পারে।

(৭) **জমির উর্বরতা বজায়**—একই জমিতে ক্রমাগত এমন ফসলের চাষ করা উচিত নয় যাহার ফলে জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ হ্রাস পায় ও মাটির উর্বরতা কমিয়া যায়। শস্য পর্যায়ে অবশ্যই একটি সবুজ সার ফসলের চাষ করা উচিত। ইহার ফলে জমির উর্বরতা বজায় থাকে ও জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আবার বরবটি জাতীয় ফসলের চাষ করিলে মাটির ক্ষয়ীভবন ও ধৌতকরণ হ্রাস পায়। এ জাতীয় ফসলকে আচ্ছাদন ফসল (cover crop) বলে। শস্য পর্যায়ে আবার এমন ফসলও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যাহার মূল বহু নীচে ও পার্শ্বে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এ সকল ফসল চাষে মাটির সচ্ছিদ্রতা ও ভৌত গঠন উন্নত হয়।

(৮) **সারের সুব্যবহার**—অনেক ফসলে প্রচুর পরিমাণে সার প্রয়োগ করিতে হয়, যেমন আলু। ঐ ফসল তুলিবার পর এমন ফসলের চাষ করা যায় যাহাদের সারের চাহিদা কম। পূর্বোক্ত ফসলের পরে একই জমিতে শেষোক্ত ফসলের চাষ করিলে অনেকক্ষেত্রে সার প্রয়োগ না করিলেও চলে। ইহারা পূর্ব-ফসলের প্রযুক্ত সারের অবশিষ্টাংশ ব্যবহার করিয়াই বৃদ্ধি পায়। শস্য পর্যায়ের ইহা একটি বড় সুবিধা।

পর্যায়ক্রম

শস্য পর্যায় দুই, তিন বা চার বৎসরে সম্পূর্ণ করা যায়। পর্যায়ক্রম যত বৎসরের কৃষকের মোট জমিকে তত খণ্ডে বা তাহার গুণকে সমভাবে বিভক্ত করিতে হইবে। যেমন ধরা যাউক, কোন কৃষক তিন বৎসরের শস্য পর্যায় অনুসরণ করিবে। ঐক্ষেত্রে কৃষকের মোট জমিকে তিন, ছয়, বা নয় ভাগে বিভক্ত করা দরকার। অতঃপর বিভিন্ন খণ্ডে শস্য পর্যায়ের বিভিন্ন ফসল বপন বা রোপণ করিতে হইবে। পরবর্তী বৎসরে প্রথম জমি খণ্ডের ফসল দ্বিতীয় খণ্ডে, দ্বিতীয় খণ্ডের ফসল তৃতীয় খণ্ডে এবং তৃতীয় খণ্ডের ফসল প্রথম খণ্ডে চাষ করিতে হইবে। অনুরূপভাবে তৃতীয় বৎসরেও শস্য আবর্তন করাইতে হইবে। চতুর্থ বৎসরে প্রথম জমি খণ্ডের ফসল ঐ খণ্ডে ফিরিয়া আসিবে।

পশ্চিমবঙ্গে শস্য পর্যায়

শস্য পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা করিতে গেলে জমিতে জলসেচনের সুযোগ আছে কিনা তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। তদনুসারে পশ্চিমবঙ্গের জমিগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যেমন, (ক) সেচপ্রাপ্ত জমি ও (খ) সেচবিহীন জমি।

পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিই বেশী। এ সকল জমিতে চাষ প্রধানত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল এবং বৎসরের পর বৎসর কেবল আমন ধানের চাষ করা হয়। কোন শস্য পর্যায় অনুসরণ করা হয় না। কিন্তু এ সকল জমিতেও

লঙ্কার চারা রোপণ। কেবল পর্যাপ্ত সার প্রয়োগেই লঙ্কার ফলন বাড়ানো যায় (অন্ধ্রপ্রদেশ)।

কোনাকুনিভাবে রবার গাছ চিরিয়া তাহার রস সংগ্রহ করিবার জন্য একটি আধখানা নারিকেলের মালা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই রস হইতে রবার প্রস্তুত হয় (কেরালা রাজ্য)।

ভারতে ৬০ হইতে ৯০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে এবং ২৫০০ হইতে ৫০০০ ফুট ভূমিতে কফি চাষ ভাল হয় (অন্ধ্রপ্রদেশের অরাকু উপত্যকা)।
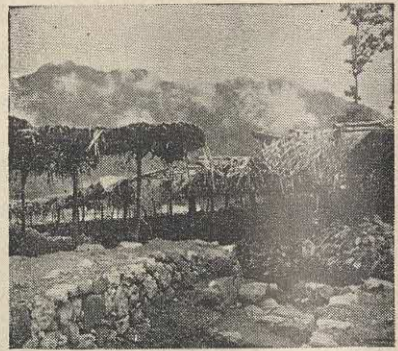
আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলে এবং পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় চা একটি প্রধান ফসল।

উপরে ডাইনে : চায়ের বীজতলা। উপরে বামে : কাপড়ে বাঁধা চায়ের পাতাসহ শ্রমিক।
নীচে : কীটশত্রু দমনের জন্য ঔষধ প্রয়োগ। (কেরালা রাজ্য)।

শস্য পর্যায় সম্ভব। যেমন, দীর্ঘজীবী আমন ধানের জাত চাষ না করিয়া সেক্ষেত্রে স্বল্পজীবী আমন ধানের চাষ করিলে ধান কাটিবার পরে জমিতে যে পরিমাণ আর্দ্রতা থাকে তাহার সাহায্যে তিল, তিসি, মিষ্টি আলু, চৈতালী মুগ, বরবটি, কুমড়া বা কুষ্মাণ্ড গোত্রীয় অন্যান্য ফসল চাষ করা যায়। আবার দীর্ঘজীবী আমন ধানের জমিতে দাঁড়ানো ফসলের মধ্যেই কার্তিক মাসের ভিতরে খেসারী, ছোলা, মটর, মসুরী, তিসি প্রভৃতি ছিটাইয়া বপন করা যায়। রবি মরসুমে এ সকল ফসলের চাষ করিয়াও খরিপ মরসুমে ধান রোপণের পূর্বে সবুজ সার ফসলের চাষ করিয়া জমির উর্বরতা বজায় রাখা যায়।

সেচপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ পশ্চিমবঙ্গে খুব বেশী নয়। কিন্তু যে স্বল্প পরিমাণ জমিতে সেচের সুযোগ আছে তাহাতেও সর্বক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ কোন শস্য পর্যায় অনুসরণ করা হয় না।

নিম্নে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রকার মাটিতে কোন কোন ফসল ভাল হয় এবং কোন শ্রেণীর মাটিতে কোন শস্য-পর্যায় অনুসরণ করা যাইতে পারে তাহার একটি মোটামুটি তালিকা প্রদত্ত হইল। এই শস্য-পর্যায়সমূহ আঞ্চলিক প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করা যাইতে পারে।

বিভিন্ন প্রকার মাটির শস্য-পর্যায় নির্ণয় করিতে হইলে কোন প্রকার মাটিতে কোন কোন ফসল ভাল হয় তাহা জানা দরকার।

পাথুরে কাঁকরযুক্ত মাটিতে ভুট্টা, যই, জোয়ার, বাজরা, কোদো, কাঁকড়ী, কাঁকরোল, চিচিঙ্গা, মেস্তা, রেড়ি, সরগুজা প্রভৃতি ফসলের চাষ করা যায়। পার্বত্য অঞ্চলের নিম্নভূমি ও উপত্যকায় আমন ও আউশ ধানের চাষ করা যাইতে পারে।

বেলে মাটিতে আউশ ধান, তিল, সরিষা, সরগুজা, চীনাবাদাম, যব, যই, বজরা, কাওন, শন, মেস্তা, ধইঞ্চা, কলাই, মুগ, তরমুজ, খরমুজ, শাঁক আলু, পটল ইত্যাদি ফসলের চাষ করা যায়।

দো-আঁশ মাটিতে প্রায় সকল ফসলেরই ফলন ভাল হয়। আলু, পাট, ধান, তুলা, তামাক, গম, ভুট্টা, জোয়ার, যব, যই, সকল প্রকার সবজি, আখ, মেস্তা, চীনাবাদাম, তিসি, মুগ, মসুর, কলাই, ছোলা, খেসারী, আদা, হলুদ, কলা, এরোরুট, তরমুজ, খরমুজ, মানকচু, রাঙ্গা আলু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এঁটেল মাটিতে আমন ধান, পাট, গম, আখ, ছোলা, অড়হর, মটর, শিম, তিসি ও বাঁধাকপির চাষ ভাল হয়।

চুনা (calcareous) মাটিতে ধান, গম, ছোলা, খেসারী, জোয়ান, ভুট্টা, শাঁক আলু, আলু, তুলা, পিঁয়াজ, অরহর, গাজর প্রভৃতি ফসলের চাষ করা যায়।

বোদ বা পাট মাটিতে শসা, কুমড়া, লাউ, গম, যব, যই, তিসি, সরিষা, খিরা, প্রভৃতির চাষ করা যাইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জমির উপযোগী কয়েকটি আদর্শ শস্য পর্যায়ের উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

(১) পাথুরে মাটি

প্রথম বৎসর ভুট্টা বরবটি
দ্বিতীয় ,, তুলা
তৃতীয় ,, মেস্তা শাঁকআলু
চতুর্থ ,, জোয়ার মুগ

(২) বেলে মাটি

প্রথম বৎসর আউশ সরিষা
দ্বিতীয় ,, পাট মুগ বা তিল
তৃতীয় ,, ভুট্টা আলু
চতুর্থ ,, সবুজসার কুষ্মাণ্ডগোত্রীয় ফসল

(৩) দোআঁশ মাটি

প্রথম বৎসর ভুট্টা ভুট্টা আলু কুষ্মাণ্ড গোত্রীয় ফসল
দ্বিতীয় ,, পাট সবজি
তৃতীয় ,, আউশ তামাক
চতুর্থ ,, সবুজ সার আউশ গম

(৪) এঁটেল মাটি

প্রথম বৎসর সবুজসার আমন শসা তরমুজ ইত্যাদি
দ্বিতীয় ,, পাট আমন খেসারী ও মসুর
তৃতীয় ,, তুলা
চতুর্থ ,, ভুট্টা আমন তিসি

মনে রাখিতে হইবে যে তুলা, অড়হর, আখ, রেড়ি, হলুদ, আদা প্রভৃতি ফসলের পরে একই বৎসরে দ্বিতীয় কোন ফসল চাষ করা যায় না।

চীনাবাদাম, বরবটি, শন, কুমড়া, ঝিঙা, বেগুন, লঙ্কা, ভুট্টা প্রভৃতি ফসল খরিফ ও রবি উভয় শস্য ঋতুতে চাষ করা যায়।

দুইটি প্রধান ফসলের মধ্যবর্তী সময়ে কুষ্মাণ্ড গোত্রীয় ফসল, বরবটি, কাওন, চিনা, ধইঞ্চা, শাঁকআলু, ঢেঁড়শ, শাক প্রভৃতি ফসলের চাষ করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গে সচরাচর অনুসৃত কয়েকটি শস্য পর্যায়ের উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

(ক) তিন বৎসরের শস্য পর্যায়

প্রথম বৎসর আউশ আমন খেসারী
দ্বিতীয় ,, পাট আমন খেসারী
তৃতীয় ,, সবুজ সার আমন খেসারী

(খ) দুই বৎসরের শস্য পর্যায়

(১) প্রথম বৎসর আউশ গম
দ্বিতীয় ,, পাট আলু

(২) প্রথম ,, আউশ সরিষা
দ্বিতীয় ,, পাট ডাল

(৩) প্রথম ,, আউশ আলু
দ্বিতীয় ,, পাট আলু

(৪) প্রথম ,, সবুজ সার আমন গ্রীষ্মের সবজি
দ্বিতীয় ,, পাট সবজি

(গ) এক বৎসরের শস্য পর্যায়

(১) পাট রবি ফসল

(২) আমন খেসারী, কলাই

(৩) আমন পতিত

(৪) পাট আমন

(৫) আউশ আমন

প্রশ্ন

১। শস্য পর্যায় কাহাকে বলে ? শস্য পর্যায়ের সুবিধা কি ?

২। পশ্চিমবঙ্গের শস্য পর্যায় সম্পর্কে যাহা জান লেখ।

৩। শস্য পর্যায় নির্ণয় করিতে হইলে কোন কোন বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে ?

ষষ্ঠ অধ্যায়

গম

Triticum sativum

গম অতিশয় পুষ্টিকর শস্য। চাউল ও অন্যান্য তণ্ডুলজাতীয় শস্য অপেক্ষা ইহা প্রোটিনে অধিকতর সমৃদ্ধ। প্রধানতঃ উত্তর ও মধ্য ভারতে ইহার চাষ হয় এবং ইহা দ্বারা নানা প্রকার খাদ্য তৈয়ারি করা যায়।

বহু পুরাতন কাল হইতে ভারত ও মিশরে গমের চাষ হইত। বর্তমানে পৃথিবীতে গমের চাষ ব্যাপক প্রসারলাভ করিয়াছে। কেরালা ব্যতীত ভারতের সকল রাজ্যে গম চাষ হয়। তন্মধ্যে পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশে গমের চাষ বেশী হয়। ভারতের সকল প্রকার খাদ্যশস্যের জমির শতকরা ১৫ ভাগ জমিতে গমের চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গে গমের চাষ খুব অল্প। প্রায় ১,৭০,০০০ একর জমিতে গম চাষ হয়। কিন্তু গমের চাষ বাড়াইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

প্রকৃতি

গম বর্ষজীবী উদ্ভিদ, অর্থাৎ, একই শস্যঋতুতে ইহা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বীজ ধারণ করে ও মারা যায়। জলবায়ু ও জমির উর্বরতা অনুসারে উদ্ভিদ ৩ হইতে ৬ ফুট উঁচু হয়। অনুকূল অবস্থায় উদ্ভিদের গোড়া হইতে নূতন উদ্ভিদের (tillers) সৃষ্টি হয়। কোন কোন জাতের গমে শুঁয়া (awn) থাকে অন্যান্য জাত শুঁয়াবিহীন। গমের গুচ্ছমূল মাটির বেশ গভীরে প্রবেশ করে (২৫নং চিত্র)।

চিত্র নং ২৫। 1. সম্পূর্ণ গম গাছ ; 2. গাছের গোড়া হইতে বিয়ান (নূতন বিটপ) 3. শুঁয়াসহ গমের শীষ ; 4. বিয়ান নির্গত হইতেছে। [H. R. ARAKERI মহাশয়ের সৌজন্যে]

মাটি ও জলবায়ু

উর্বর ও সূক্ষ্ম গ্রথণবিশিষ্ট মাটিতে গমের ফলন বেশী হয়। সেচবিহীন অবস্থায় এঁটেল মাটি গমের পক্ষে প্রকৃষ্ট। সেচযুক্ত অঞ্চলে বেলে মাটিতেও গম চাষ করা যায়। গম যেহেতু শুষ্ক আবহাওয়ায় শীতকালে চাষ করা হয়, সেচবিহীন গমের চাষ প্রধানতঃ মৃত্তিকায় সংরক্ষিত আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে। গমের দ্রুত বর্ধনশীল অবস্থায় মেঘলা আবহাওয়া থাকিলে গমের মরিচা রোগের প্রাদুর্ভাবে সহায়তা করে। ফুল আসিবার সময় তাপমাত্রা খুব কম থাকিলে বীজের সংখ্যা হ্রাস পায়।

পরিচর্যা

মহারাষ্ট্র ও উত্তর মহীশূর রাজ্যে রবি জোয়ারের ন্যায় জমি তৈয়ারি করা হয়। উত্তর ভারতে পূর্ববর্তী ফসল সংগ্রহ করিবার পর বারবার লাঙ্গল চালাইয়া জমি তৈয়ারি করা হয়। উর্বর ও এঁটেল মাটিতে পরীক্ষা করিয়া

দেখা গিয়াছে যে মোল্ড বোর্ড লাঙ্গল চালাইবার পর দুই একবার দেশী লাঙ্গল চালাইয়া ভাল ফল পাওয়া যায়। গম রোপণের জন্য সাধারণতঃ ঝুরো কিন্তু দৃঢ় বীজতলা আবশ্যক। বীজতলা দৃঢ় করিবার জন্য কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে বর্ষাকালে বার বার হ্যারো (harrow) চালানো হয়। উত্তর ভারতে বীজ বপনের পূর্বে মই বা ভারী কাঠের তক্তা চালাইয়া বীজতলা দৃঢ় করা হয়।

১লা হইতে ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বীজ বপন প্রকৃষ্ট। কোন কোন জাতের বীজ নভেম্বরের শেষভাগেও বপন করা যায়। বীজবপন যন্ত্রের সাহায্যে বা লাঙ্গলের পিছনে লাইন করিয়া বীজ বপন করা হয়। গম মাটির প্রায় ২ হইতে ৩ ইঞ্চি নীচে বপন করা হয় এজন্য ভারী বীজ বপন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। প্রতি একরে ১৭ হইতে ২২ কেজি বীজ লাগে। যেখানে বৃষ্টিপাত কম সেখানে ও যে সকল জাতে বিয়ান (tiller) বেশী হয়, সে সকল ক্ষেত্রে বীজের হার কম হইলেও চলে। অনেক ক্ষেত্রে স্বল্প বীজ ব্যবহার করিয়া ফলন বেশী পাওয়া যায় (২৬নং চিত্র)

সেচযুক্ত অঞ্চলে সাধারণতঃ শুষ্ক বীজতলায় বীজ বপন করিবার পরই সেচের জল প্রয়োগ করা হয়। এ পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা হইল এই যে, মাটির উপরে আস্তরণের সৃষ্টি হয়, ফলে অঙ্কুরোদ্গমে বিলম্ব ঘটে বা বাধা সৃষ্টি করে। এসকল ক্ষেত্রে সেচের পরে দাঁতযুক্ত হ্যারো চালাইয়া আস্তরণ ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত। অবশ্য সেচের পরে বপন করিলে মাটির উপরে কম আস্তরণের সৃষ্টি হয়, অঙ্কুরোদ্গম অপেক্ষাকৃত ভাল হয় ও বিয়ান বেশী হয়।

সেচবিহীন অবস্থায় বীজ বপনের পর প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে আস্তরণের সৃষ্টি হইলে দাঁতযুক্ত হ্যারো চালাইয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত।

সার প্রয়োগ

সেচবিহীন অবস্থায় চাষ করিলে গমে সাধারণতঃ কোন জৈব বা রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয় না; কিন্তু সেচযুক্ত অবস্থায় সবুজ সার, গোবর সার ও রাসায়নিক সার প্রয়োগে গমের ফলন অনেক বৃদ্ধি পায়। এমন কি সেচবিহীন গমের ক্ষেত্রেও বীজ বপনের পূর্বে বা বপনের সময় অল্প পরিমাণে নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে। সেচযুক্ত গমে
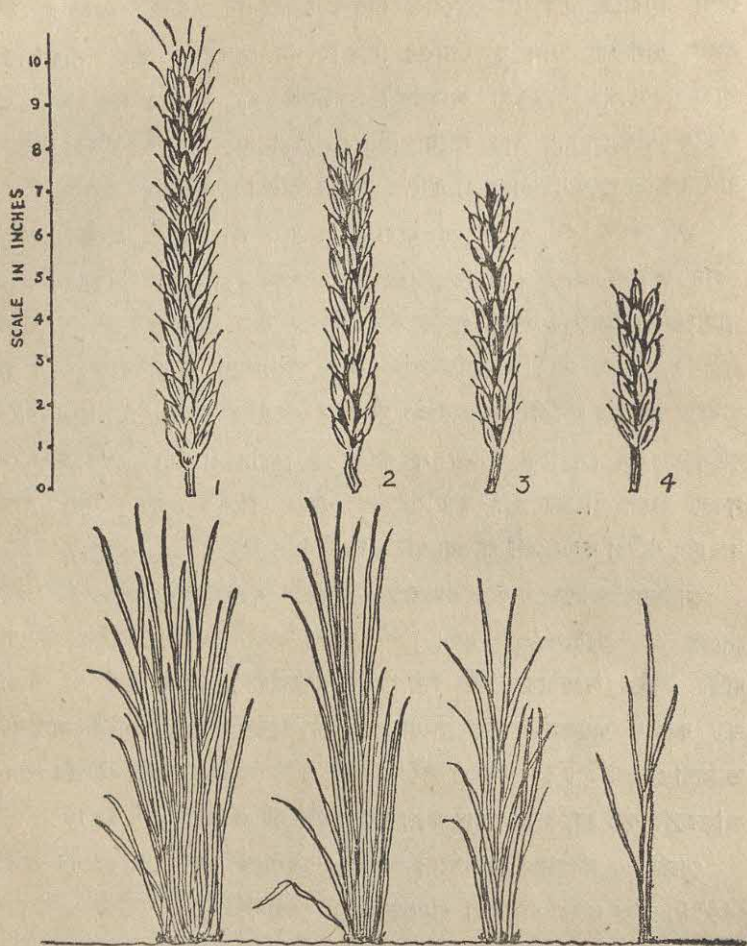
চিত্র নং ২৬। একর প্রতি বিভিন্ন হারে বীজ বপনের ফলে গমের গাছ ও শীষ
1. স্বাভাবিক অপেক্ষা অর্ধেক বীজের হার ; 2. স্বাভাবিক বীজের হার ; 3. স্বাভাবিক অপেক্ষা দ্বিগুণ বীজের হার ; 4. স্বাভাবিক অপেক্ষা চতুর্গুণ বীজের হার।
[WEAVER হইতে পুনরঙ্কিত]।

একর প্রতি ৯০ কেজি অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রয়োগ প্রকৃষ্ট। ইহা দু বারেই প্রয়োগ করা উচিত ; একবার বীজ বপনকালে ও অন্যবার বিয়ানের সময়। সেচবিহীন গমের ক্ষেত্রে একর প্রতি ২২ কেজি অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রয়োগে
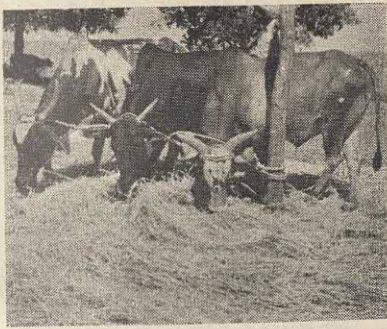
সাধারণত বলদ দ্বারা মাড়াইয়া গম ও ধান মাড়াই করা হয় (উত্তরপ্রদেশ)।

উপরের ডাইনে ও নীচে উভয় ফটোর বামপার্শ্বস্থ গমে ৩০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন (১৫০ পাউণ্ড এমোনিয়ম সালফেট), ৩০ পাউণ্ড ফসফেট (১৮৮ পাউণ্ড ১৬% সুপার ফসফেট) ও ৩০ পাউণ্ড পটাশ (৫০ পাউণ্ড মিউরিয়েট অব পটাশ) প্রয়োগ করা হইয়াছে। ডানপার্শ্বস্থ গমে কোন সার প্রয়োগ করা হয় নাই। গমের ফলন : বামে—একর প্রতি ১৪৫০ পাউণ্ড। ডাইনে—একর প্রতি ৬০০ পাউণ্ড (মধ্যপ্রদেশে জব্বলপুরের নিকটে)।

বারসিম দ্বারা সবুজসার করিবার পরে জোয়ারের চাষ (অন্ধ্রপ্রদেশ)।

মৃত্তিকায় সংরক্ষিত জলের সাহায্যে কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে রবিফসল হিসাবে জোয়ার ভাল হয়। ঐ অঞ্চলে বার্ষিক গড় মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০ ইঞ্চি (মহারাষ্ট্র রাজ্য)।

টবে মধ্যভারতের মাটিতে গম গোবর সার অপেক্ষা N, NP ও NPK প্রয়োগে অধিক সাড়া পাওয়া যায়। Control—বিনা সার।

N—প্রতি টবে এক অঙ্গুস্তানা (thimble) পূর্ণ এমোনিয়ম সালফেট। NP—প্রতি টবে N এর মাত্রা + দুই অঙ্গুস্তানাপূর্ণ ১৬% সুপার ফসফেট। NPK—প্রতি টবে NPএর মাত্রা + এক অঙ্গুস্তানাপূর্ণ ৬০% মিউরিয়েট অব পটাশ। Gaikhad—প্রতি টবে দুই মুষ্টি গোবর সার।

দ্রষ্টব্য : নিম্নে প্রদর্শিত গম গাছগুলি অনুরূপ মাত্রায় সারপ্রযুক্ত টব হইতে সংগৃহীত।

উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে। ফসফেটঘটিত সার প্রয়োগে গমে কোথাও সুফল পাওয়া যায়, কোথাও পাওয়া যায় না।

যে সকল অঞ্চলে অনাবৃষ্টির সম্ভাবনা কম, সে সকল অঞ্চলে খরিফ ঋতুতে কোন প্রকার ডাল ফসল বা সবুজ সারের চাষ করা উচিত। দেখা গিয়াছে যে ডাল ফসল সংগ্রহ করিবার পরে বা সবুজ সার মাটিতে মিশাইবার পরে ও গম বপনের পূর্বে ৬ হইতে ৮ ইঞ্চি বৃষ্টিপাতের নিশ্চয়তা থাকিলে তবেই এ প্রথা অনুসরণ করা যায়। সেচযুক্ত গমে অবশ্য সবুজ সারের চাষে কোন বাধা নাই এবং তাহাতে ফলন বাড়ে। পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ গমের জমিতে খরিফ ঋতুতে আউশ বা পাট ইত্যাদির চাষ হয়, ফলে সবুজ সার চাষের অনেক সময় সুযোগ পাওয়া যায় না।

সার সম্পর্কে যথাযথ সুপারিশ করিবার জন্য মৃত্তিকা পরীক্ষা করা আবশ্যক।

সেচ

গমে সাধারণতঃ ১০ হইতে ১৫ একর ইঞ্চি* সেচের প্রয়োজন হয়। গম যখন বাড়িতে থাকে তখন প্রতিবারে ২ হইতে ৩ একর ইঞ্চি করিয়া ৪ হইতে ৫ বার সেচ প্রয়োগ করা উচিত। কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে বিয়ানের পূর্বে দুইবার এবং ফুল আসিবার পূর্বে একবার সেচ প্রয়োগ করিলেই চলে। অপেক্ষাকৃত বেলে মাটিতে দুই-একবার বেশী সেচ প্রয়োগ করিতে হইতে পারে। ফুল আসিবার পরে জল সেচন করিলে ফসল রোগাক্রান্ত ও ভূপতিত হইবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

ফসল আহরণ

গম সাড়ে তিন হইতে পাঁচ মাসের মধ্যে পাকে। উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতে গম শীঘ্র পাকে এবং দক্ষিণ ভারত অপেক্ষা উত্তর ভারতে গমের ফলন অধিক হয়। মাটি হইতে উপড়ানো হয় বা কাস্তের সাহায্যে

* যে পরিমাণ জল এক একর (৪৩,৫৬০ বর্গফুট) জমির উপর দাঁড়াইলে এক ইঞ্চি উঁচু হইবে তাহাকে এক একর ইঞ্চি জল বলে।

গোড়া হইতে গম কাটা হয়। বলদের পায়ে মাড়াইয়া গম খড় হইতে সচরাচর পৃথক করা হয়, তবে বলদ-চালিত মাড়াই যন্ত্র ব্যবহার করা সুবিধাজনক। সেচবিহীন অবস্থায় একর প্রতি ১৬০০ পাউণ্ড এবং সেচযুক্ত অঞ্চলে একর প্রতি ২৫০০ পাউণ্ড ফলন হয়।

জাত

ভারতে যে সকল জাতের চাষ হয় সেগুলিকে উদ্ভিদতত্ত্ব অনুসারে দুইটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায় (ক) *Vulgare* ও (খ) *Durum*. ময়দা অনুসারে এ দুই শ্রেণীকে পুনরায় নরম ও শক্ত এ দুই ভাগে পৃথক করা হয়। বর্ণ অনুসারে আবার ইহাদিগকে লাল ও সাদা এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। শক্ত সাদা জাতগুলি সাধারণতঃ উত্তর ভারতে চাষ করা হয় এবং শক্ত লাল জাতগুলি মহীশূরের উত্তর ভাগ ও মহারাষ্ট্রের দক্ষিণ অংশে চাষ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন জাত সুপারিশ করা হয়। দার্জিলিং জেলার পাহাড়ী অঞ্চলের জন্য '৭৮১' ও 'রিড্‌লে'; কুচবিহার, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও মালদহ জেলার জন্য '৭১০' ও গঙ্গাজলি; বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার জন্য '৭১০', '৭৭৫,' '৮২৩' ও '৮২৫' সুপারিশ করা যায়।

সংক্ষিপ্তসার

গম উত্তর ও মধ্য ভারতের শীতপ্রধান ফসল। উত্তর প্রদেশে গমের জমি সর্বাপেক্ষা বেশী। উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া ইহার সহ্য হয় না। বপনের পরে বৃষ্টিপাত, বিশেষতঃ কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে, গমের ক্ষতি করে। সেচবিহীন অবস্থায় বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করিয়া এবং জলসেচন করিয়া উভয় প্রকারে গমের চাষ হয়। সেচপ্রযুক্ত গমে সবুজ সার ও রাসায়নিক সার প্রয়োগে উত্তম সাড়া পাওয়া যায়। সেচবিহীন গমেও গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করিয়া রাসায়নিক সারে ভাল ফল পাওয়া যায়। একবারে প্রয়োগ অপেক্ষা রাসায়নিক সার দুই বারে প্রয়োগ করা উচিত। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন জাত সুপারিশ করা হয়।

প্রশ্ন

১। গমে জলসেচন সম্পর্কে কি জান ?

২। সমগ্র ভারতে ধানের চাষ হওয়া সত্ত্বেও গমের চাষ কেবলমাত্র উত্তর ভারতে সীমাবদ্ধ কেন ?

সহায়ক পুস্তক

Aiyer, A. K. Yegna Narayan, *Field Crops of India,* Bangalore Printing Co., Bangalore, Mysore State, 1954

Murthy, G. S,. *Wheat Cultivation in India,* Indian Council of Agricultural Research, Farm Bulletin No. 27, New Delhi, 1958

Pugh, B. M. and C. P. Dutt, *Crop Production in India,* Allahabad Agricultural Institute, Allahabad, 1940

Sawhney, K., J. A. Daji and D. Raghayan, Editors, *Handbook of Agriculture,* Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, 1958
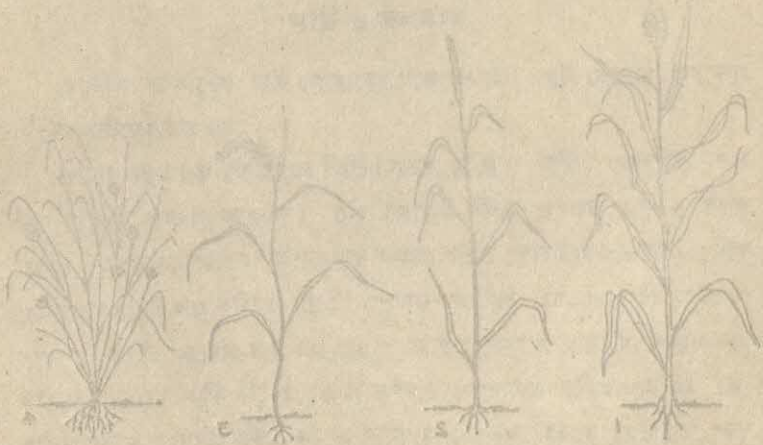
সপ্তম অধ্যায়

মিলেট (Millets)

জোয়ার, বাজরা, মারুয়া ভুট্টা ও অন্যান্য অপ্রধান মিলেট এই শ্রেণীর অন্তর্গত। খাদ্য ফসলের জমি শতকরা ৪৫ ভাগ জমিতে উক্ত ফসলসমূহের চাষ হয় এবং ইহার শতকরা ৯৮ ভাগ ফসল সেচবিহীন অবস্থায় চাষ করা হয় (চিত্র নং ২৭)। পশ্চিমবঙ্গে এ শ্রেণীর ফসলের প্রচলন খুবই কম। তবে পশু খাদ্য হিসাবে জোয়ার ও ভুট্টা এবং খাদ্য হিসাবে ভুট্টার চাষের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

প্রধান প্রধান মিলেট শস্য

চিত্র নং ২৭। 1. জোয়ার; 2. বাজরা; 3. কাওন; 4. মারুয়া

[H. R. ARAKERI : মহাশয়ের সৌজন্যে]

জোয়ার (*Sorghum Vulgare*)

জোয়ার উভয় উদ্দেশ্যসাধক ফসল। ইহা হইতে যেমন মানুষ ও পশুর উৎকৃষ্ট দানা খাদ্য পাওয়া যায়, আবার গোমহিষাদির জন্য সবুজ খাদ্য (চিত্র নং ৭) হিসাবেও ইহার চাষ করা হয়। ভারতে ৪৩ মিলিয়ন একর জমিতে জোয়ারের চাষ হয় এবং এই জমির পরিমাণ সকল মিলেটের জমির প্রায় অর্ধেক। জোয়ার প্রধানতঃ মধ্য প্রদেশ, দক্ষিণ গুজরাট, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র প্রদেশ ও মহীশূর রাজ্যে চাষ করা হয়।

প্রকৃতি

জোয়ার বর্ষজীবী উদ্ভিদ এবং ৪ হইতে ১৬ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। জোয়ারের ছড়া নানা আকারের হইতে পারে। অন্যান্য মিলেটের ন্যায় ইহারও গুচ্ছমুল। (২৮ নং চিত্র)

মাটি ও জলবায়ু

দোআঁশ ও এঁটেল মাটি জোয়ারের পক্ষে উৎকৃষ্ট। রবি জোয়ার প্রধানতঃ এঁটেল মাটিতেই চাষ হয়।

বিভিন্ন ঋতুর জন্য জোয়ারের বিভিন্ন জাত আছে। খরিপ জোয়ারের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু আবশ্যক। রবি জোয়ার শীতল ও শুষ্ক জলবায়ু পছন্দ করে। প্রধানতঃ অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে খরিপ জোয়ারের চাষ হয়। কিন্তু জোয়ার অনাবৃষ্টি সহ্য করিতে পারে। এজন্য অর্ধশুষ্ক (semi-arid) অঞ্চলেও সাফল্যের সহিত জোয়ার চাষ করা যায়। আবার জোয়ার দাড়ানো জলও সহ্য করিতে পারে। অতি নীচু তাপমাত্রা কখনও জোয়ারের বৃদ্ধির সহায়ক নয়। এপ্রিল হইতে আগস্ট, জুলাই হইতে ডিসেম্বর, সেপ্টেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী হইতে মে এই চারি ঋতুতে জোয়ারের চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গে প্রধানতঃ পশুখাদ্য হিসাবে জোয়ারের চাষ করা হয় এবং উপরোক্ত যে কোন ঋতুতে জোয়ার রোপণ করা যায়।

চিত্র নং ২৮। জোয়ারের বিভিন্ন প্রকার শীষ [MUDALIAR : হইতে পুনরঙ্কিত]
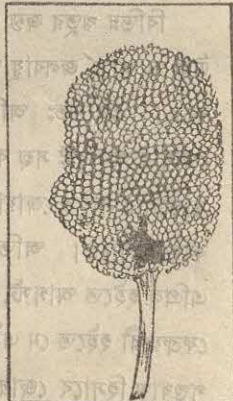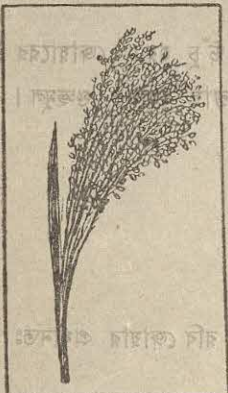
পরিচর্যা

অগভীর ভাবে লাঙ্গল চালাইয়া বা বার বার হ্যারো চালাইয়া খরিপ জোয়ারের জমি তৈয়ার করা হয়। একর প্রতি পাঁচ গাড়ী গোবর সার বা কম্পোস্ট প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে বীজ ছড়াইয়া বপন করা হয়। তবে বীজ বপনে যন্ত্রের সাহায্য লওয়া বাঞ্ছনীয় (২৯ নং চিত্র)। ১৮ হইতে ২৪ ইঞ্চি দূরে দূরে লাইনে বপন করা উচিত। একর প্রতি ৬ হইতে ৮ পাউণ্ড বীজ লাগে।
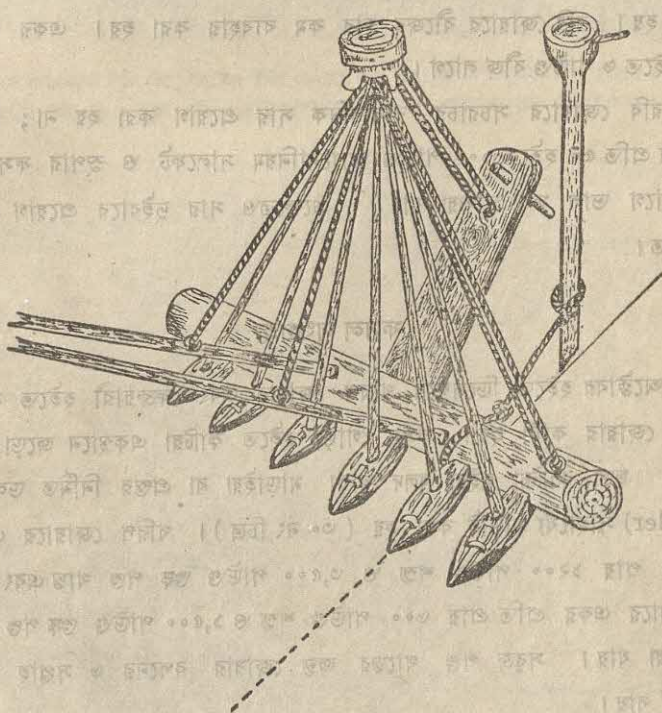
চিত্র নং ২৯। মিলেট ও ডাল শস্যের উপযোগী ছয় সারি বীজ বপনের জন্য নল রহিয়াছে। এভাবে একই জমিতে একাধিক ফসলের চাষকে মিশ্র ফসল বলে।

[ARAKERI মহাশয়ের সৌজন্যে]।

স্মাট (smut) রোগ এড়াইবার উদ্দেশ্যে জোয়ার বীজ গন্ধক দ্বারা শোধন করিয়া লওয়া উচিত। অড়হর, মুগ বা কালো কলাই-এর সহিত মিশ্র ফসল

হিসাবে সাধারণতঃ জোয়ার বপন করা হয়। খরিপ জোয়ারে রাসায়নিক সার প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়া যায়। একর প্রতি ১০০ পাউণ্ড অ্যামোনিয়ম সালফেট ও ১০০ পাউণ্ড সুপার ফসফেট প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়া যায়। অ্যামোনিয়ম সালফেট দুই বারে প্রয়োগ করা উচিত। বীজ বপনের সময় একবার এবং বপনের ৬ হইতে ৮ সপ্তাহ পরে আর একবার প্রয়োগ করা উচিত।

রবি জোয়ার সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরে রোপণ করা হয়। ইহার জন্য বর্ষাকালে জল সংরক্ষণের জন্য জমির সমোন্নতি রেখায় বাঁধ দেওয়া হয় এবং বারবার হ্যারো চালাইয়া আগাছা দমন করা হয়। গমের জন্য এভাবে জমি তৈয়ারি করা হয়। রবি জোয়ারে বীজের হার কম ব্যবহার করা হয়। একর প্রতি ৪ হইতে ৬ পাউণ্ড বীজ লাগে।

রবি জোয়ারে সচরাচর রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয় না; কিন্তু একর প্রতি ৫০ হইতে ১০০ পাউণ্ড অ্যামোনিয়ম সালফেট ও সুপার ফসফেট প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়া যায়। এক্ষেত্রেও সার দুইবারে প্রয়োগ করা উচিত।

ফসল সংগ্রহ

অক্টোবর হইতে ডিসেম্বরে খরিপ জোয়ার এবং ফেব্রুয়ারী হইতে মার্চে রবি জোয়ার কাটা হয়। ফসল গোড়া হইতে কাটিয়া একস্থানে জড়ো করা হয়। ছড়া কাটিয়া লইয়া বলদ দ্বারা মাড়াইয়া বা প্রস্তর নির্মিত ডলনার (roller) সাহায্যে মাড়াই করা হয় (৩০ নং চিত্র)। খরিপ জোয়ারে একর প্রতি প্রায় ১২০০ পাউণ্ড শস্য ও ৩,৫০০ পাউণ্ড শুষ্ক পশু খাদ্য এবং রবি জোয়ারে একর প্রতি প্রায় ৬০০ পাউণ্ড শস্য ও ১,৫০০ পাউণ্ড শুষ্ক পশু খাদ্য পাওয়া যায়। সবুজ পশু খাদ্যের জন্য জোয়ার বপনের ৬ সপ্তাহ পরে কাটা যায়।

জাত

জোয়ারের অসংখ্য জাত আছে। অঞ্চল বিশেষে কোন জাত উপযোগী হইবে, সে সম্পর্কে নিকটবর্তী কৃষি কর্মচারীর পরামর্শ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

অন্ধ্র প্রদেশে মাদ্রাজ-কলিকাতা সড়কের উপর জোয়ার গাছ বিছাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার উপর দিয়া মোটর গাড়ী, ট্রাক, গরুর গাড়ী প্রভৃতি যাতায়াত করে এবং এভাবে জোয়ার মাড়াই করা হয়।
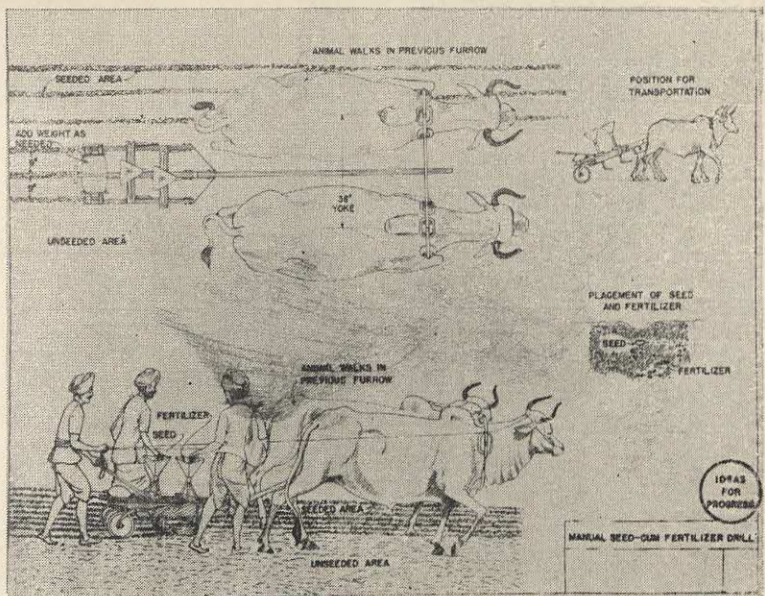
বীজের এক পাশে ২ ইঞ্চি দূরে ও ২ ইঞ্চি নীচে সার প্রয়োগ করিবার উপযোগী বীজ বপন ও সার প্রয়োগ যন্ত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে। বলদের জোয়াল লক্ষ্য করিবার মত।

[ভারত সরকারের সম্প্রসারণ অধিকারের M. L. Taneja মহাশয়ের সৌজন্যে]

প্রায় অনুর্বর ও অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত-যুক্ত অঞ্চলেও প্রোটিনে সমৃদ্ধ শস্য উৎপাদন করা যায় প্রধানত এ উদ্দেশ্যেই বাজরার চাষ করা হয়। অবশ্য সার প্রয়োগে বাজরার ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় (মহারাষ্ট্র রাজ্য)।
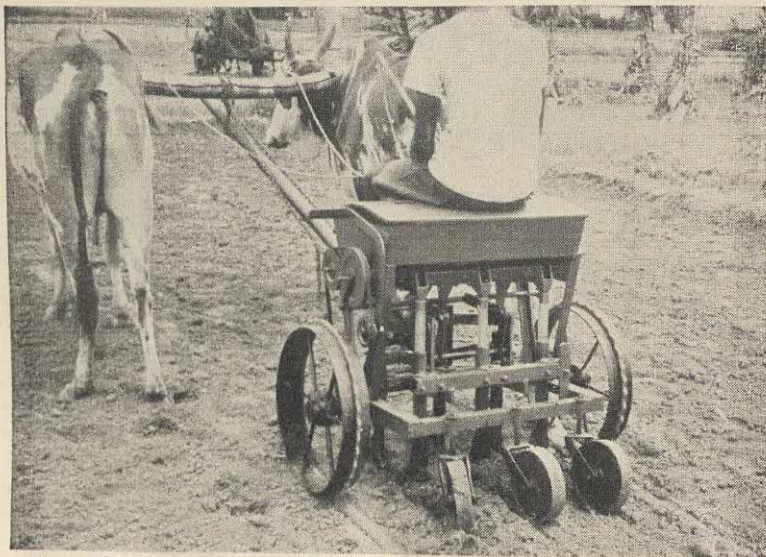
বীজের ২ ইঞ্চি নীচে ও এক পাশে ২ ইঞ্চি দূরে সার প্রয়োগের যন্ত্রের সাহায্যে গম, যব, জোয়ার ও অন্যান্য ছোট দানার মিলেট বপন করা যায়। বীজ বপন ও সার প্রয়োগের হার হ্রাস বৃদ্ধি করা যায়। সারের হপার (hopper) সামনে এবং বীজের হপার পশ্চাতে থাকে ; এই উভয় অংশের উপরে চালক বসিতে পারে। (সেকেন্দ্রাবাদের স্বস্তিকা ম্যানুফ্যাকচারার্স লিমিটেড-এর সৌজন্যে)।

মহারাষ্ট্র রাজ্যের পুণার নিকটে মাড়াই করিবার অপেক্ষায় এক স্তূপ বাজরার শীষ।

গভীর বেলে মাটিতে জলপাত্র হইতে জল ঢালিয়া রাগিতে সেচ করা হয়।

উত্তমরূপে চাষ করিলে দেশী জাত অপেক্ষা (অন্ধ্রপ্রদেশ) ফলন অনেক বেশী হয় বলিয়া সংকর ভুট্টা দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করিতেছে। এখানে উদ্ভিদ প্রজননবিদ তাঁহার সাহায্যে সৃষ্ট সংকর ভুট্টার একটি শীষের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছেন।

মধ্যপ্রদেশে জব্বলপুর কৃষি কলেজের ক্ষেত্রে হলুদে এঁটেল মাটিতে প্রয়োজনমত সার প্রয়োগে সংকর ভুট্টার ফলন ৫ গুণেরও বেশী (৫৮৫%) বৃদ্ধি পাইয়াছে। বামে : বিনা সারে ফলন একর প্রতি ১২৫৪ পাউণ্ড ভুট্টার শীষ (Cob)। ডাইনে : একর প্রতি ১০০ পাউণ্ড N+৬০ পাউণ্ড P_2O_5+৩০ পাউণ্ড K_2O প্রয়োগে একর প্রতি ৮৫৮৫ পাউণ্ড ভুট্টার শীষ (Cob)।

দ্রষ্টব্য : ১। সংকর ভুট্টার জাত ছিল গঙ্গা ১০১। ২। জব্বলপুরে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ৫০ ইঞ্চি। ৩। সকল ফলন ১৫% আর্দ্রতার ভিত্তিতে হিসাব করা। ৪। সকল P ও K এবং ৩০ পাউণ্ড N বীজ বপন কালে এবং অবশিষ্ট ৭০ পাউণ্ড N পরবর্তী পরিচর্যাকালে প্রয়োগ করা হইয়াছিল।

বাজরা (*Pennisetum Typhoideum*)

বাজরা প্রধানতঃ শস্যের জন্য চাষ করা হয় ; কারণ পশুখাদ্য হিসাবে ইহার উপযোগিতা কম। জোয়ার অপেক্ষা ইহার শস্য প্রোটিনে অধিকতর সমৃদ্ধ। বাজরার চাষ মুখ্যতঃ গুজরাট, মহীশূর, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশে সীমাবদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গে বাজরার চাষ করা হয় না। ইহার প্রকৃতি মোটামুটি জোয়ারের ন্যায়। (চিত্র নং ৩১)
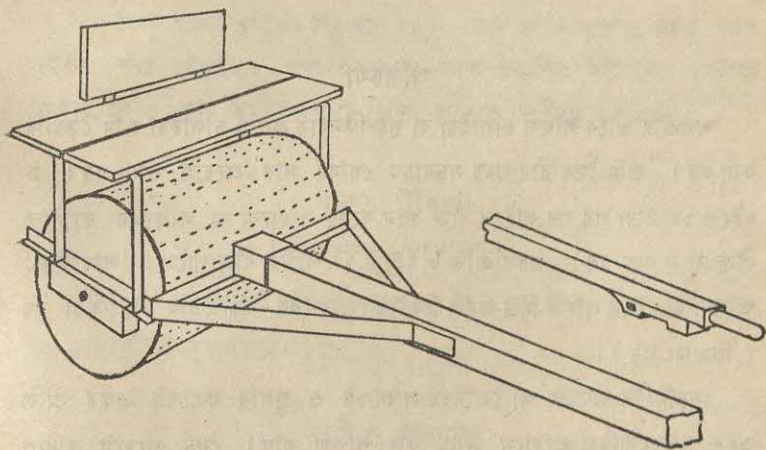
চিত্র নং ৩০। জোয়ার ও মারুয়া মাড়াইবার জন্য প্রস্তর নির্মিত ডলনা।

[H. R. ARAKERI : মহাশয়ের সৌজন্যে]

চিত্র নং ৩১। বাজরার বিভিন্ন প্রকার শীষ [MUDALIAR : হইতে পুনরঙ্কিত]

মাটি ও জলবায়ু

বাজরা সাধারণতঃ খরিপ ঋতুতে সেচবিহীন অবস্থায় চাষ করা হয়। দোআঁশ ও বেলে মাটি বাজরার পক্ষে উৎকৃষ্ট। বাজরার প্রথম অবস্থায় ও পাকিবার সময় অত্যধিক বৃষ্টিপাত হইলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও শস্যের উৎকর্ষ হ্রাস পায়। গুজরাট, রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশে প্রথম বৃষ্টির সুযোগ লইয়া বাজরা বপন করা হয় ; অন্যত্র জুলাই বা আগস্টের প্রথমভাগে বপন করা হয়।

পরিচর্যা

অগভীর ভাবে লাঙ্গল চালাইয়া বা দুই-তিনবার হ্যারো চালাইয়া জমি তৈয়ারি করা হয়। জমি তৈয়ারীর সময় সচরাচর গোবর সার প্রয়োগ করা হয়। ৯ হইতে ১৫ ইঞ্চি পর পর লাইনে বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে বা লাঙ্গলের ফালিতে বীজ বপন করা হয়। একর প্রতি ৮ হইতে ১০ পাউণ্ড বীজ লাগে। সাধারণতঃ অড়হর বা মুগের সহিত মিশ্র ফসল হিসাবে জোয়ারের ন্যায় ইহার চাষ করা হয় (চিত্র নং ৩২)।

সেচবিহীন অবস্থায় অ্যামোনিয়ম সালফেট ও সুপার ফসফেট একর প্রতি ১০০ পাউণ্ড করিয়া প্রয়োগে উত্তম ফল পাওয়া যায়। সেচ প্রয়োগ করিলে সারের মাত্রা দ্বিগুণ করা বাঞ্ছনীয়।
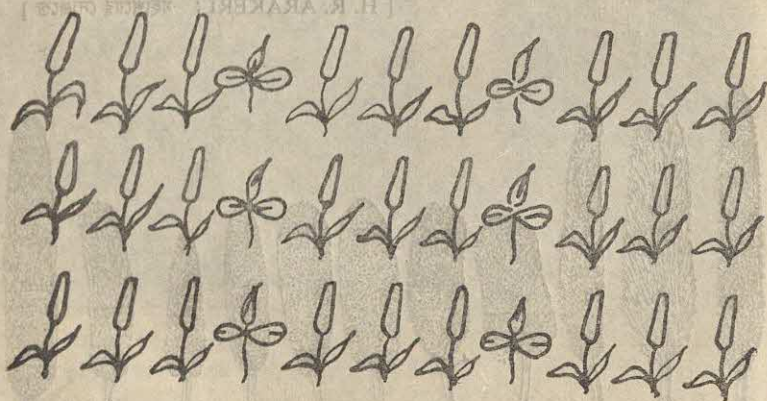
চিত্র নং ৩২। বাজরা (তিন সারি) ও অড়হরের (এক সারি) মিশ্র ফসল।

[H. R. ARAKERI : মহাশয়ের সৌজন্যে]

ফসল আহরণ

সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ফসল কাটা হয়। একর প্রতি ৭০০ হইতে ৮০০ পাউণ্ড ফলন হয়। সেচপ্রযুক্ত অবস্থায় যথাযথ সার প্রয়োগে একর প্রতি ২০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত ফলন হয়।

জাত

সাধারণতঃ স্থানীয় জাতের চাষ করা হয়। কোন কোন অঞ্চলে উন্নত জাত প্রবর্তন করা হইয়াছে। সম্প্রতি সংকর জাত উদ্ভাবিত হইয়াছে। শস্যের আকার, বর্ণ ও ছড়ার দৈর্ঘ্য অনুসারে বিভিন্ন জাতকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়।

মারুয়া (Ragi)

(Eleusine Coracana)

মারুয়া প্রধানতঃ দক্ষিণ ভারতের ফসল। ইহার শস্য উৎকৃষ্ট মনুষ্য খাদ্য এবং খড় মোটামুটি উত্তম পশুখাদ্য।

মাটি ও জলবায়ু

লাল বেলে মাটি মারুয়ার পক্ষে উৎকৃষ্ট। দক্ষিণে মারুয়া প্রায় সারা বৎসর চাষ হয়। উত্তম বৃদ্ধি ও বিয়ানের জন্য মারুয়া উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু পছন্দ করে। পাকিবার সময় অতিবৃষ্টি হইলে ক্ষতি হয় কারণ ছড়াতেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া যায় এবং খাদ্য হিসাবে ইহার উপযোগিতা নষ্ট হইয়া যায়। (চিত্র নং ৩৩)

পরিচর্যা

পূর্ববর্তী ফসল কাটিবার পরেই অথবা মৌসুমী ঋতুর প্রথম বৃষ্টির সুযোগ লইয়া জমি কর্ষণ করা হয় এবং মাটি উত্তমরূপে ঝুরো না হওয়া পর্যন্ত বার বার লাঙ্গল চালানো হয়। সাধারণত মেষ চরাইয়া বা গোবর সার প্রয়োগে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা হয়। বপন যন্ত্রের সাহায্যে বা ছড়াইয়া বীজ বপন করা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে চারাও রোপণ করা হয়। ছড়াইয়া বপনে একর প্রতি ২০ পাউণ্ড বীজ লাগে। বপন যন্ত্রের সাহায্যে বপন করিলে ১০ হইতে ১২ পাউণ্ড
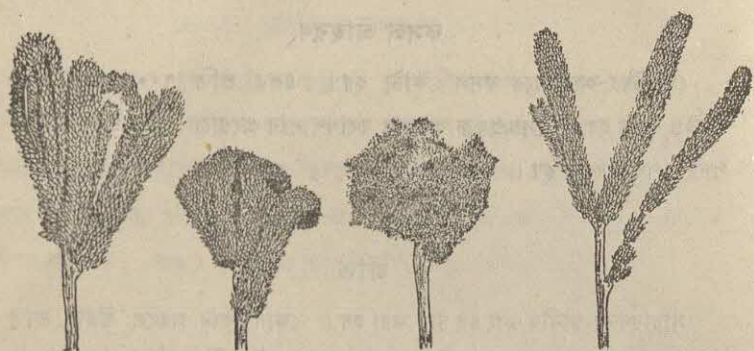
চিত্র নং ৩৩। মারুয়ার বিভিন্ন প্রকার শীষ। [MUDALIAR; হইতে পুনরঙ্কিত]

লাগে (৩৪ নং চিত্র)। রোপণে একর প্রতি ৬ পাউণ্ড বীজই যথেষ্ট। সেচ বিহীন মারুয়ায় অ্যামোনিয়ম সালফেট ও সুপার ফসফেট একর প্রতি ১০০ পাউণ্ড হারে প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়া যায়। সেচপ্রযুক্ত ফসলে এই সারের মাত্রা দ্বিগুণ করা উচিত। অ্যামোনিয়ম সালফেট দুইবারে একবার বীজ বপনের পূর্বে এবং দ্বিতীয়বার পরিচর্যার সময় প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। আগাছা দমন ও যথাযথ পরিচর্যায় মারুয়ার ফলন বাড়ে। মারুয়ার কোন কোন জাতে যথেষ্ট বিয়ান হয় ; কিন্তু কোন কোন জাতে বিয়ানের সংখ্যা খুব কম।
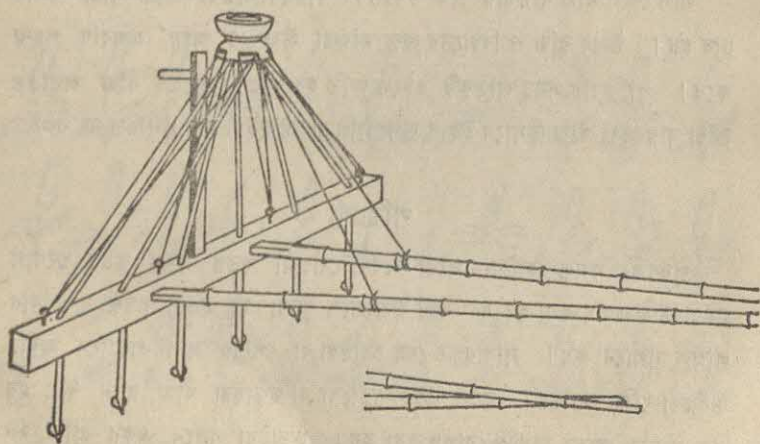
চিত্র নং ৩৪। মারুয়া বপন যন্ত্র (মহীশূর রাজ্য) [H. R. ARAKERI মহাশয়ের সৌজন্যে]

ফসল সংগ্রহ

সেচবিহীন ফসল এক সঙ্গে পাকে ; কাজেই একবারেই সংগ্রহ করা হয়। প্রথমে ছড়াগুলি সংগ্রহ করা হয় এবং তারপরে গাছ গোড়া হইতে কাটিয়া লওয়া হয়। সেচ প্রযুক্ত ফসল এক সঙ্গে পাকে না ; সেজন্য ছড়াগুলি দুই বা তিনবারে সংগ্রহ করা হয়। ছড়াগুলিতে তামাটে রঙ না আসা পর্যন্ত চারি পাঁচদিন ঢাকিয়া রাখা হয়। অতঃপর ছড়াগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া বলদ দ্বারা বা প্রস্তর নির্মিত ডলনা দ্বারা মাড়াই করা হয়।

ভুট্টা (**Maize**)
(*Zea mays*)

গম, মারুয়া, বাজরা, জোয়ার প্রভৃতির ন্যায় ভুট্টাও তণ্ডুলজাতীয় ফসল। ভুট্টা গাছ প্রায় ৬ ফুট উঁচু হয় এবং ইহার মূলতন্ত্র সুবিস্তৃত। আমাদের দেশে ভুট্টা প্রধানত মনুষ্য খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইলেও উৎপন্ন শস্যের কিছু অংশ পশুখাদ্য হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। কাঁচা ভুট্টা গাছও উত্তম পশুখাদ্য (চিত্র নং ৩৫ ও ৩৬)।
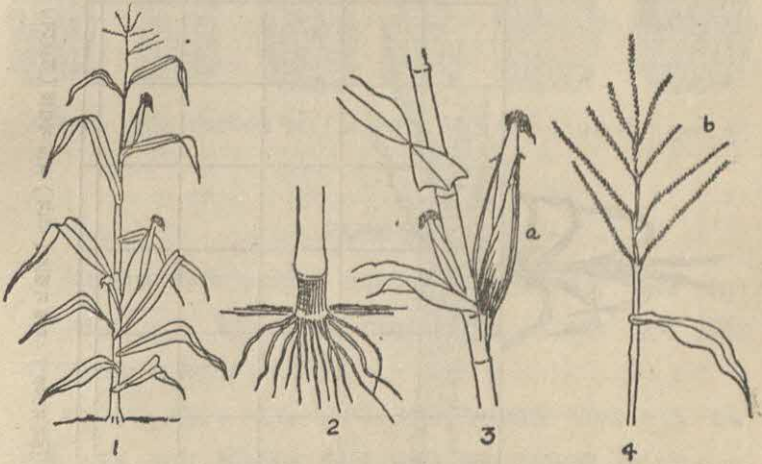
চিত্র নং ৩৫। ভুট্টাগাছ ও তার বিভিন্ন অংশ

1. পূর্ণ বয়স্ক ভুট্টাগাছ ; 2. গাছের গোড়া মূল ; 3. শীষ (*a*) সহ কাণ্ডের অংশ ; 4. পুং পুষ্প (*b*) সহ গাছের অগ্রভাগ / [H. R. ARAKERI : মহাশয়ের সৌজন্যে]
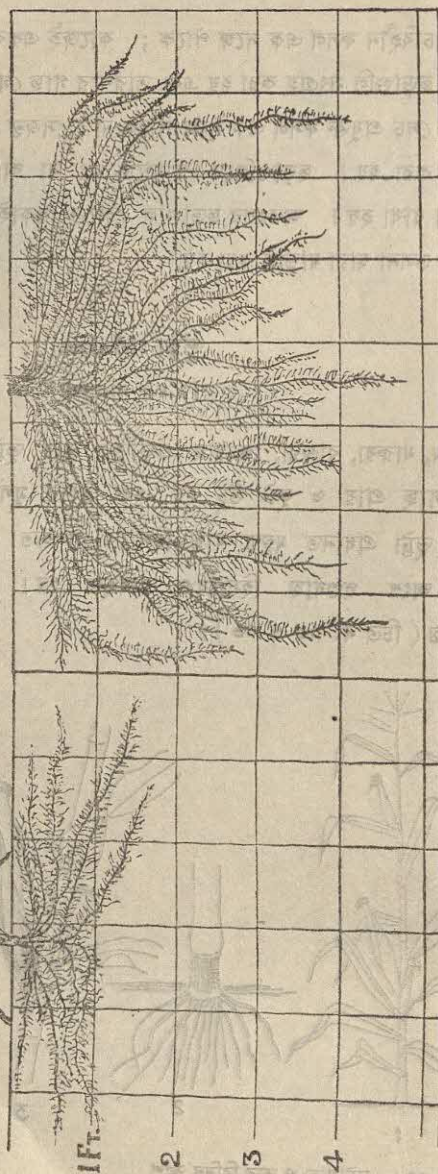
চিত্র নং ৩৬। চার সপ্তাহ (বামে) আট সপ্তাহ (ডাইনে) বয়সে ভুট্টা গাছের মূল।

[WEAVER হইতে পুনরঙ্কিত]

কোন্ কোন্ অঞ্চলে ভুট্টা হয়

ভারতে প্রায় ১ কোটি একর জমিতে প্রতি বৎসর ভুট্টার চাষ হয়। একর প্রতি গড় ফলন প্রায় ৬০০ পাউণ্ড। নানা জাতের ভুট্টার চাষ হয় এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ঐগুলি স্থানীয় জাত, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত সংকর জাত নয়। সাধারণত পূর্ব ফসলের শস্য বীজরূপে ব্যবহার করা হয়। স্থানীয় জাতগুলির বিভিন্ন শ্রেণীসমূহ হইল পপ্ (pop), সুইট (sweet), ফ্লিন্ট (flint), ডেন্ট (dent) ও পড (pod)। ভারতীয় সংকর জাতগুলি ফ্লিন্ট ও ডেন্ট শ্রেণীদ্বয়ের মিশ্রণে উদ্ভূত (চিত্র নং ৩৭)।
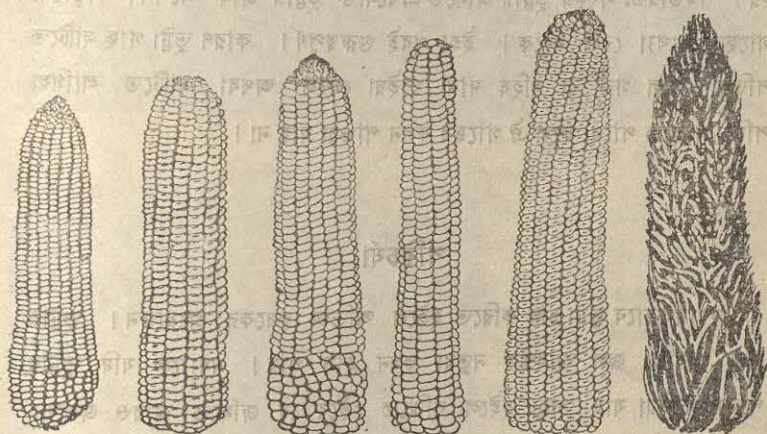
চিত্র নং ৩৭। ভুট্টার বিভিন্নপ্রকার শীষ। [MARTIN AND LEONARD হইতে পুনরঙ্কিত]

সংকর ভুট্টা

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উদ্ভিদ প্রজননের ফলে সংকর ভুট্টা উদ্ভূত হয়। যে সকল দেশে ইহার ব্যাপক প্রচলন হইয়াছে সে সকল দেশে স্থানীয় জাতসমূহের চাষ দ্রুত হ্রাস পাইয়াছে।

প্রশ্ন করা যাইতে পারে, পৃথিবীর সকল কৃষকেরাই সংকর ভুট্টা পছন্দ করে কেন এবং ভারতেও ইহার প্রচলন করা হইতেছে কেন? কারণ, পৃথিবীতে খুব কম তণ্ডুলজাতীয় শস্য আছে যাহার একর প্রতি ফলন সংকর ভুট্টা অপেক্ষা বেশী। ভারতে উদ্ভূত সংকর ভুট্টা স্থানীয় জাতসমূহ অপেক্ষা

শতকরা ৪০ ভাগ অধিক ফলন দেয়। সংকর ভুট্টার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। স্থানীয় জাতের বীজ অপেক্ষা সংকর জাতের বীজ আকারে অপেক্ষাকৃত বড় এবং সকল বীজ একই আকারের হয়। উভয় প্রকার বীজের রঙ অবশ্য একই প্রকার। সংকর ভুট্টার চারা দ্রুত বৃদ্ধি পায় ও সবল হয়, ফলে রোগ ও কীটশত্রুর হাত হইতে বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকে বেশী এবং আগাছা অপেক্ষা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

ফসল সংগ্রহকালে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ উন্মুক্ত পরাগযোগে সৃষ্ট বীজ অপেক্ষা সংকর ভুট্টার ফলন সকল ক্ষেত্রেই বেশী হয়। দ্বিতীয়তঃ সংকর ভুট্টার জমিতে প্রথমোক্ত ভুট্টার জমি অপেক্ষা দাঁড়ানো গাছের সংখ্যা বেশী থাকে। ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভুট্টা গাছ মাটিতে পড়িয়া গেলে গরু বা মহিষ দানা খাইয়া ফেলে অথবা মাটিতে লাগিয়া পচিয়া যাইতে পারে, ফলে ঐ গাছের ফলন পাওয়া যায় না।

পরিচর্যা

যথাযথভাবে ভুট্টা চাষ করিতে হইলে অভিজ্ঞ কৃষকের প্রয়োজন। ভুট্টার জন্য পর্যাপ্ত জল আবশ্যক নতুবা ফলন হ্রাস পায়। মধ্যাহ্নে যদি ভুট্টার পাতা গুটাইয়া যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে জমিতে আরও জলসেচ করিতে হইবে। আবার অত্যধিক জলসেচনও ফসলের পক্ষে ক্ষতিকর। ভুট্টার জমিতে জল দাঁড়াইয়া থাকিলে গাছ হল্‌দে হইয়া যায় এবং বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। একদিন জল দাঁড়াইয়া থাকিলে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তিনদিন দাঁড়াইয়া থাকিলে ফসল সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

সংকর ভুট্টার প্রধান সুবিধা হইল এই যে ইহা অধিক সার প্রয়োগে সাড়া দেয়। সুনিষ্কাশন ব্যবস্থাবিশিষ্ট জমিতে বিনা সারে বপন করিলে দেশী ও সংকর উভয় প্রকার ভুট্টার ফলন একর প্রতি ৯০০ পাউণ্ডের বেশী হয় না কিন্তু ঐ জমিতেই যথাযথ মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া সার প্রয়োগ করিলে দেশী ভুট্টার একর প্রতি ৩০০০ পাউণ্ড ও সংকর ভুট্টার একর প্রতি ৬০০০ পাউণ্ড ফলন হইবে। আদর্শ অবস্থায় সংকর ভুট্টার ফলন ১০,০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত হইতে পারে।

উপরে ও পার্শ্বে : রাসায়নিক সার, বিশেষতঃ ফসফোরস ও পটাশিয়ম বীজের একপাশে ২ ইঞ্চি দূরে এবং ২ ইঞ্চি নীচে প্রয়োগ করিলে ভুট্টা, গম ও জোয়ারের বেলায় সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত ভাল ফল পাওয়া যায়। ঐভাবে সার প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে একটি দেশী লাঙ্গল প্রস্তুত করা হইয়াছে। সামনের চোঙায় সার এবং পিছনের চোঙায় বীজ ফেলা হয়।

অড়হর (বামে) এবং স্তূপীকৃত কাটা জোয়ার গাছ (ডাইনে)। অনিশ্চিত ও স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে মিশ্র ফসলের ইহা একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত। (রাজস্থান)।

অড়হর (ডাইনে, বামে ও মধ্যে) এবং বাজরা (পশ্চাতে স্তূপীকৃত) স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে মিশ্র ফসলের উদাহরণ (রাজস্থান)।

সর্বোচ্চ বৃদ্ধির জন্য গোবর সারের সঙ্গে রাসায়নিক সার প্রয়োগ আবশ্যক। বামে—বিনা সারে। মাঝে—টব প্রতি দুই হাতের মুঠো ভর্তি দুই মুঠো গোবর সার। ডাইনে—টব প্রতি দুই হাতের মুঠো ভর্তি দুই মুঠো গোবর সার + এক অঙ্গুস্তানাপূর্ণ এমোনিয়ম সালফেট + দুই অঙ্গুস্তানাপূর্ণ ১৬ % সুপারফসফেট ও এক অঙ্গুস্তানাপূর্ণ ৬০ % মিউরিয়েট অব পটাশ।

একর প্রতি ১০০ পাউণ্ড N, ৬০ পাউণ্ড P_2O_5 ও ৩০ পাউণ্ড K_2O প্রয়োগে মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরের নিকটে ভিনোগ্রাম গ্রামে ৭৯৪৬ পাউণ্ড সংকর ভুট্টার (গঙ্গা ১·১) শীষ (Cob) পাওয়া গিয়াছে। বিনা সারে চাষ করিয়া একটি খেতে (এখানে দেখানো হয় নাই) মাত্র ৩৫ পাউণ্ড ভুট্টার শীষ (Cob) পাওয়া গিয়াছে। ভুট্টা পুষ্টিকর মনুষ্যখাদ্য এবং শীষ আগুনে পোড়াইয়া বা দানা চূর্ণ করিয়া রুটি করিয়া খাওয়া যায়।

দ্রষ্টব্য : ফলন ১৫ % আর্দ্রতার ভিত্তিতে হিসাব করা।

মধ্যভারতের ৫০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাতযুক্ত লাল মাটি অঞ্চলে পরিমিত সার প্রয়োগে দেশী ভুট্টার ফলন বাড়ে, কিন্তু সংকর ভুট্টার ফলন আরও বেশী বাড়ে। বামে : দেশী ভুট্টায় গোবর সার প্রয়োগে চাষ, একর প্রতি ফলন ১,৬৫০ পাউণ্ড শীষ। মধ্যে : দেশী ভুট্টায় কোন জৈব সার না দিয়া একর প্রতি ১০০ পাউণ্ড N. ৬০ পাউণ্ড P_2O_5 ও ৩০ পাউণ্ড K_2O প্রয়োগে চাষ ; একর প্রতি ফলন ৫,৬৩৩ পাউণ্ড শীষ। ডাইনে : সংকর ভুট্টায় কোন জৈব সার না দিয়া মাঝের অনুরূপ রাসায়নিক সার প্রয়োগে চাষ ; একর প্রতি ফলন ৭,৪৭০ পাউণ্ড শীষ।

দ্রষ্টব্য : সকল ফলনের হিসাব ১৫% আর্দ্রতার ভিত্তিতে।

প্রস্তরনির্মিত চাকায় সাধারণতঃ ভুট্টা চূর্ণ করা হয় (মধ্যপ্রদেশ)।

কীটশত্রু ও রোগ দমন সংকর ভুট্টা চাষের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। চারা অবস্থায় মাজরা পোকার উপদ্রব হইতে বাঁচাইবার জন্য দুই তিনবার কীট-নাশক ঔষধ ছিটাইতে হইবে। কোন কোন অঞ্চলে পাতা পচা ও ডাঁটা পচা রোগও দেখা যায়।

সংকর ভুট্টার বীজ রাখিয়া যদি দ্বিতীয় বৎসর চাষ করা হয় তবে ফলন প্রায় ২০ শতাংশ হ্রাস পায়। এজন্য প্রত্যেক বৎসরই সংকর ভুট্টা যে বা যাহারা সৃষ্টি করে তাহাদের নিকট হইতে ক্রয় করিতে হয়। এ রাজ্যে সরকারী তত্ত্বা-বধানে সংকর ভুট্টার বীজ সৃষ্টি করা হয় এবং স্থানীয় কৃষিকর্মচারীদের মাধ্যমে ঐ বীজ পাওয়া যায়।

সংক্ষিপ্তসার

ভারতে খাদ্য ফসলের জমির ৪৫ শতাংশ জমিতে মিলেট শ্রেণীর ফসলের চাষ হয়। আঞ্চলিক জলবায়ু ও মাটির প্রকারভেদে কোন শ্রেণীর মিলেটে চাষ হইবে তাহা নির্ভর করে। ভুট্টা ব্যতীত অন্যান্য মিলেট সাধারণতঃ প্রতিকূল অবস্থা সহিষ্ণু। অর্ধশুষ্ক অঞ্চলে স্বল্প উর্বর জমিতে সচরাচর এ সকল ফসলের চাষ করা হয়। রবি জোয়ার ব্যতিরেকে সকল মিলেটই খরিফ ঋতুর ফসল। যদি সেচের ব্যবস্থা থাকে তবে বৎসরের যে কোন সময়ে ভুট্টা চাষ করা যায়। উত্তর-পূর্ব ভারত ও উপকূল অঞ্চল বাদ দিলে জোয়ার ভারতের একটি প্রধান ফসল। ইহা অনাবৃষ্টি ও অতিশয় আর্দ্রতা— উভয়ই সহ্য করিতে পারে।

বেলে ও দোয়াঁশ মাটিতে জোয়ারের স্থলে বাজরার চাষ করা হয়। দক্ষিণ ভারতের লাল মাটি অঞ্চলে মারুয়া একটি প্রধান ফসল। সংকর ভুট্টার বহুল প্রচলন হওয়ায় ভুট্টা চাষের এলাকা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে।

মিলেটে যদিও সাধারণত সার প্রয়োগ করা হয় না, ভারতের সকল অঞ্চলেই সার প্রয়োগে উত্তম সাড়া পাওয়া গিয়াছে। জোয়ার, ভুট্টা, মারুয়া, বাজরা প্রভৃতি সেচ প্রয়োগেও চাষ করা হয় এবং সেক্ষেত্রে সার প্রয়োগে উচ্চ ফলন পাওয়া যায়। মিলেট ফসলের সহিত অনেক ক্ষেত্রে ডালশস্য, তন্তুজাতীয় ফসল ও তৈলবীজ মিশ্র ফসল হিসাবে চাষ করা হয়।

প্রায় সকল মিলেট ফসলেরই উন্নত জাত উদ্ভাবিত হইয়াছে।

প্রশ্ন

(১) রবি ও খরিপ জোয়ারের মাটি ও জলবায়ুর চাহিদার মধ্যে পার্থক্য কি ?

(২) খরিপ জোয়ার, রবি জোয়ার ও বাজরার সহিত মিশ্র ফসল হিসাবে কোন কোন ফসলের চাষ করা হয় ?

(৩) তোমার জেলার উপযোগী কোন সংকর ভুট্টার প্রচলন হইয়াছে কি ?

(৪) মারুয়া চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

(৫) তোমার এলাকায় কোন কোন মিলেট ফসলের চাষ হয় ?

সহায়ক পুস্তক

Aiyer, A. K. Yegna Narayan, *Field Crops of India,* Bangolare Press, Bangalore, Mysore State, 1954.

Arakeri, H. R., G. V. Chalam, P. Satyanarayana and Roy. L. Donahue, *Soil Management in India,* Asia Publishing House, Bombay, Second Edition, 1962.

Pugh, B. M. and **C. P. Dutt,** *Crop Production in India,* Allahabad Agricultural Institute, Allahabad, 1940.

Sawhney, K., J. A. Daji and D. Raghavan, Editors, *Handbook of Agriculture,* Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, 1961.

Solomon, S., *Crops of the Bombay State, their Cultivation and Statistics,* Bombay Department of Agriculture, Bulletin 181, 1951

United States Department of Agriculture, *Seeds : The Seed Yearbook of Agriculture,* 1961, U. S. Government Printing Office, Washington, D. C.

Wilson, H. K., *Grain Crops,* McGraw Hill Book Co., Inc., New York, 1955

অষ্টম অধ্যায়

ইক্ষু

(*Saccharum officinarum*)

যে সকল ফসল হইতে চিনি বা শর্করা উৎপন্ন হয় তন্মধ্যে ইক্ষুই হইল প্রধান। অন্যান্য শর্করা উৎপাদনকারী ফসলগুলি হইল শর্করা বীট (sugar beet), জোয়ার ও ভুট্টা। ইহা ছাড়া তাল ও খেজুর গাছ হইতেও শর্করা পাওয়া যায়। তবে ইহাদের মধ্যে ইক্ষু ও শর্করা বীটের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই দুইটি ফসলের মধ্যে ইক্ষু হইতেই একর প্রতি অপেক্ষাকৃত অধিক শর্করা পাওয়া যায়। এইজন্য ইহাকে শর্করা উৎপাদনকারী ফসলের রাজা বলিয়া অভিহিত করা হয়।

ইক্ষু বহুবর্ষজীবী ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ, ইহার কাণ্ড সরস ও মোটা। নরম অবস্থায় সরাসরি চিবাইয়া ইহার রস পান করা যায়। পেষণযন্ত্রের সাহায্যেও রস নিংড়াইয়া পানীয় রূপে গ্রহণ করা যায়; আবার রস হইতে চিনি, গুড় বা সিরাপ (syrup) প্রস্তুত করা যায়। চিনি হইল প্রায় বিশুদ্ধ সুক্রোজ (sucrose), কিন্তু গুড়ে সুক্রোজ, গ্লুকোজ (glucose) এবং লৌহ ও তাম্র প্রভৃতি ধাতব পদার্থ থাকে। এজন্য চিনি অপেক্ষা গুড় অপেক্ষাকৃত অধিক পুষ্টিকর, সিরাপে চিনি ও মাতগুড় (molasses) থাকে। চিনি উৎপাদনের পর যে মাতগুড় পাওয়া যায় তাহাতে মানুষের খাদ্য বা পশু ও হাঁস মুরগীর খাদ্যরূপে ব্যবহার করা যায় অথবা সন্ধান (fermentation) করিয়া কোহলে (alcohol) পরিণত করা যায়। রস নিংড়ানোর পরে কাণ্ড ও পাতার যে বর্জ্যপদার্থ থাকে তাহা জ্বালানি, হাঁস-মুরগীর পালক বিছানা বা কম্পোস্ট তৈয়ারি করিবার জন্য ব্যবহার করা যায়। বাড়ী তৈয়ারিতে ব্যবহৃত আঁশবোর্ডও

(fibre board) ইহা হইতে প্রস্তুত করা যায়। বিভিন্ন প্রকার মোম (wax) ও রজন (resin)ও ইক্ষু হইতে পাওয়া যায়।

কোন্ কোন্ অঞ্চলে ইক্ষু হয়

ইক্ষু দুই প্রকার সরু ও মোটা। প্রথমোক্ত প্রকার ইক্ষু প্রধানত উত্তর ভারতে জন্মায় এবং দক্ষিণ ভারতে প্রধানত শেষোক্ত প্রকার ইক্ষুর চাষ হয়। ইক্ষু উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে ভারতের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এদেশের ইক্ষুর জমির পরিমাণ অন্যান্য যে কোন দেশ অপেক্ষা বেশী। এ জমির শতকরা ৬০ ভাগ উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত এবং ভারতে উৎপন্ন মোট চিনির শতকরা ৪০ ভাগ ঐ রাজ্যে উৎপন্ন হয়। ইক্ষু উৎপাদনে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যসমূহের নাম ক্রমানুসারে দেওয়া হইল: পাঞ্জাব, বিহার, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর ও পশ্চিমবঙ্গ।

প্রকৃতি

ইক্ষু ঘাস গোত্রের অন্তর্গত। কাণ্ডের অংশ হইতে ইহার বংশবৃদ্ধি হয়। প্রত্যেক অংশে দুই বা তিনটি চোখ বা মুকুল থাকে। প্রত্যেক মুকুল হইতে একটি নূতন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। অঙ্কুরোদ্গমের গতি শ্লথ। বিয়ান বা শাখা উদ্ভিদ (মাতৃউদ্ভিদের গোড়া হইতে উৎপন্ন নূতন উদ্ভিদ) প্রচুর হয়। বর্ষাকালে ইক্ষুর বৃদ্ধি দ্রুত হয়। শীতকালে উদ্ভিদের বৃদ্ধি রহিত হয়, কাণ্ডের অগ্রভাগে ফুল আসে এবং শর্করা গঠন সর্বোচ্চ হয়। মূলতন্ত্র সুগঠিত, গুচ্ছ ও গভীর হয় (৩৮ নং চিত্র)।

মৃত্তিকা ও জলবায়ু

ইক্ষু নানাপ্রকার মাটিতে হয়। বেলে বা এঁটেল এবং সামান্য অম্ল হইতে ক্ষারীয় মাটিতে ইক্ষু সাফল্যের সহিত চাষ করা যায়। উত্তম নিকাশী দোআঁশ মাটি ইক্ষুর পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট।

বাৎসরিক ১৫ হইতে ১৫০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে ইক্ষুর চাষ করা যায়। বাৎসরিক ২০ হইতে ৪০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলই ইক্ষুর পক্ষে উৎকৃষ্ট ; তবে যথাসময়ে সেচপ্রয়োগ প্রয়োজন। বৎসরে মোট জলের প্রয়োজন প্রায়
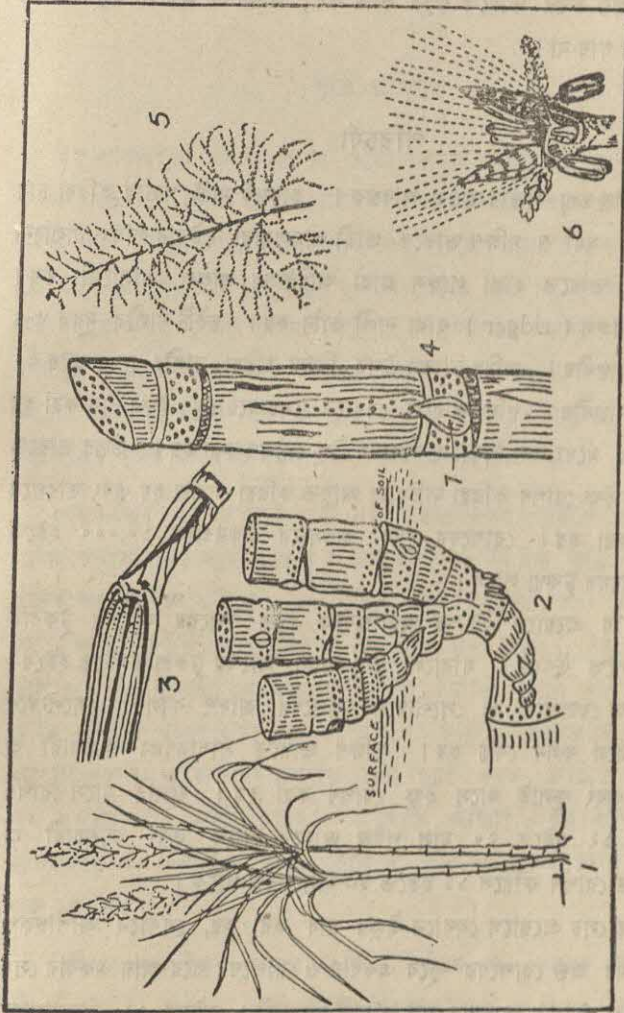
চিত্র নং ৩৮। ইক্ষুগাছ ও তাহার বিভিন্ন অংশ

1. পূর্ণবয়স্ক গাছ ; 2. ইক্ষু গাছের মাটির নীচের অংশ ; 3. পত্রমূল ; 4. মুকুল সহ ইক্ষুদণ্ড ; 5. পুষ্পবিন্যাস ;
6. পুষ্পের অনুমঞ্জরী (spikelet)

[H .R. ARAKERI মহাশয়ের সৌজন্যে]

১০০ ইঞ্চি। ইক্ষুর বৃদ্ধির জন্য দায়ী অন্যান্য কারণসমূহ হইল তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতাসহ দশমাস বৃদ্ধির পরে শুষ্ক শীতকাল ইক্ষুর পক্ষে আদর্শ। এজন্য উত্তর ভারতে ইক্ষুর ফলন কম; কারণ ঐ অঞ্চলে ইক্ষু দশমাস বৃদ্ধির সুযোগ পায় না।

পরিচর্যা

ইক্ষুর বীজতলা গভীর হওয়া আবশ্যক। কাজেই মাটি গভীর করিয়া চাষ করিতে হয়। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে ভারী লাঙ্গলদ্বারা দুইবার লাঙ্গল চালানো হয়। উত্তর ভারতে হাল্কা লাঙ্গল দ্বারা অধিকতর লাঙ্গল চালানো হয়। ভেলীকরা লাঙ্গল (ridger) দ্বারা নালী কাটা হয়। দুইটি নালীর দূরত্ব ৩-৪ ফুট হওয়া বাঞ্ছনীয়। জমির ঢালের উপর নির্ভর করিয়া নালীর দূরত্ব প্রায় ৫০ ফুট হওয়া বাঞ্ছনীয়। দক্ষিণভারতে যেখানে সেচপ্রয়োগে ইক্ষুর চাষ করা হয় তথায় নালীর মধ্যে জল দাঁড়ানো অবস্থায় ইক্ষু রোপণ করা হয়। উত্তর ভারতে শুষ্ক নালীতে ইক্ষু রোপণ করিয়া মাটিদ্বারা আবৃত করিয়া দেওয়া হয় এবং তারপরে জলসেচন করা হয়। রোপণের দূরত্ব অনুসারে একরপ্রতি ১০,০০০ হইতে ১৫,০০০ আখের টুকরা লাগে।

উত্তম সার প্রয়োগে উৎপন্ন অপ্রাপ্তবয়স্ক ইক্ষুর উপরের অংশের টুকরাই রোপণের পক্ষে উৎকৃষ্ট। ধারালো ছুরি দ্বারা আখের টুকরা কাটিতে হইবে। উত্তর ভারতে ফেব্রুয়ারী ও সেপ্টেম্বরে রোপণের আদর্শ কাল। সেপ্টেম্বরে রোপণ করিলে ফলন বেশী হয়। দক্ষিণ ভারতে সাধারণতঃ জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারী এবং জুলাই মাসে ইক্ষু রোপণ করা হয়। জুলাই মাসে রোপণ করিলে ইক্ষু ১২ হইতে ২০ মাস পর্যন্ত জমিতে থাকে এবং জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারীতে রোপণ করিলে ১১ হইতে ১৩ মাস পর্যন্ত থাকে।

নিয়মিত সেচ প্রয়োগে যেখানে ইক্ষুর চাষ করা হয়, সেখানে আশানুরূপ অঙ্কুরোদ্গমের জন্য রোপণের পূর্বে একবার ও রোপণের পরে আর একবার সেচ প্রয়োগ করা হয়। অতঃপর ঋতু ও মাটি অনুযায়ী ৮ হইতে ১২ দিন অন্তর সেচ প্রয়োগ করা দরকার। বেলে মাটিতে ও উষ্ণ, শুষ্ক ঋতুতে অল্প দিন অন্তর সেচ প্রয়োগ করিতে হয়। প্রত্যেকবার জলসেচনে ২½ হইতে ৩ একর ইঞ্চি জলের প্রয়োজন। দক্ষিণ ভারতের অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে ও উত্তর

ভারতে মাত্র ২-৫ বার সেচ প্রয়োগ করা হয়। অধিকতর জলসেচনে ইক্ষুর ফলন সম্ভবত বৃদ্ধি করা যায়।

সার প্রয়োগ

ইক্ষু সাধারণতঃ এক বৎসর বা ততোধিককাল জমিতে থাকে এবং সেহেতু পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ প্রয়োজন। যেখানে সম্ভব, শনের দ্বারা সবুজ সারের চাষ বাঞ্ছনীয়। সবুজ সারের চাষ সম্ভব না হইলে, রোপণের সময় অনুসারে ১০ হইতে ২০ টন গোবর সার বা কম্পোস্ট প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এই গোবর সার বা কম্পোস্টের অর্ধেক পরিমাণ জমি তৈয়ারি করিবার সময় এবং অবশিষ্ট অর্ধেক আখ রোপণের পূর্বে নালীতে প্রয়োগ করিতে হয়। এক একর জমিতে উৎপন্ন ইক্ষু হইতে প্রাপ্ত বর্জ্য পদার্থ হইতে এক একর জমির আবশ্যকীয় কম্পোস্ট প্রস্তুত করা যায়।

কেবল জৈব সার প্রয়োগই যথেষ্ট নয়। উচ্চ ফসল পাইতে হইলে পর্যাপ্ত পরিমাণে রাসায়নিক সার প্রয়োগ প্রয়োজন। ৪০ টন ইক্ষু জমি হইতে ৫০০ পাউণ্ড অ্যামোনিয়ম সালফেট, ৪০০ পাউণ্ড সুপার ফসফেট, ৬০০ পাউণ্ড মিউরিয়েট অফ পটাশ ও ৬০০ পাউণ্ড চূর্ণ চুনাপাথর গ্রহণ করে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, যে সকল বৃক্ষ খাদ্য অপসারিত হইয়াছে সেগুলি পূরণ না করিলে জমির উর্বরতা বজায় রাখা সম্ভব হইবে না। জমিতে সচরাচর যে পরিমাণ সার প্রয়োগ করা হয় প্রয়োজনের তুলনায় তাহা খুবই কম। ভারতে ইক্ষুর ফলন কম হওয়ার ইহা একটি কারণ। যেখানে জাভায় একর প্রতি ৫৬ টন, হাওয়াইতে ৮০ টন ইক্ষু ফলে, সেক্ষেত্রে ভারতের একর প্রতি গড় ফলন মাত্র ১৪ টন।

বিভিন্ন অঞ্চলে ইক্ষুর সারের চাহিদা নির্ণয়ের জন্য অনেক গবেষণা করা হইলেও আরও অনেক তথ্য জনিবার অবকাশ আছে। অঞ্চল বিশেষে বিভিন্ন হারে সার ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়। উত্তর ভারতে একর প্রতি ৩০০ হইতে ১০০০ পাউণ্ড হারে অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রয়োগ করা হয় (৩৯ নং চিত্র)। দক্ষিণ ভারতে ১৮ মাসের ফসলে অনেকক্ষেত্রে একর প্রতি
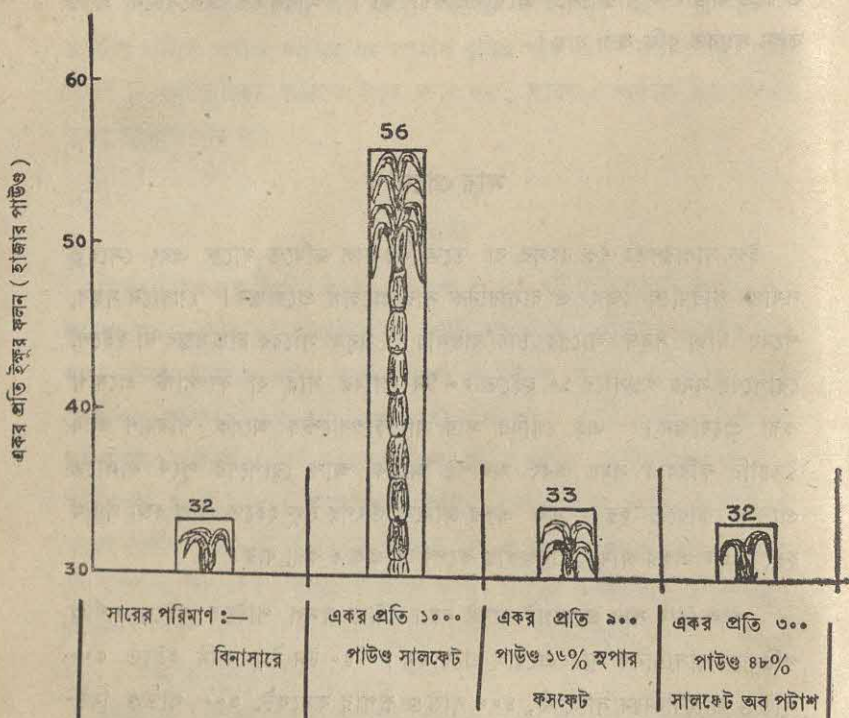
চিত্র নং ৩৯। উত্তর ভারতে সাধারণত নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রয়োগে ইক্ষু সাড়া দেয় ; তবে তিন প্রকার সারেরই মিশ্রণ প্রয়োগ করিলে সম্ভবতঃ সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া যাইবে। [IYER হইতে পুনরঙ্কিত]

১ টন পর্যন্ত অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রয়োগ করা হয়। মহারাষ্ট্র, মহীশূর, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে ফসফেট প্রয়োগেও সাড়া পাওয়া যায়। অন্যান্য রাজ্যে অনুরূপ সাড়া মিলে না। পটাশ প্রয়োগেও ফলন বৃদ্ধিতে বিশেষ কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। অবশ্য পটাশ ও ফসফেট—উভয়েই রসের উৎকর্ষ ও শর্করা উৎপাদন বৃদ্ধি করে।

নানা স্থানে, বিশেষ করিয়া মহারাষ্ট্রে, ইক্ষুতে সার হিসাবে খইলের উপযোগিতা যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে পরীক্ষা চালানো হইয়াছে। দেখা গিয়াছে

আখের উচ্চ ফসল অনায়াসলব্ধ নয়। উপযোগী মাটি ও জাত নিবাচন উত্তম বীজতলা তৈয়ারী, পরিমিত ও যথাসময়ে সার প্রয়োগ, যথাযথভাবে ও যথা পরিমাণে সেচ প্রয়োগ, উত্তম শস্য রক্ষণ ব্যবস্থা ও যথাসময়ে ফসল কাটার উপর ইক্ষুচাষে সাফল্য নির্ভর করে। (পাঞ্জাব রাজ্য)।

প্রস্ফুটিত ফুলসহ সরিষাগাছ। ইহার তৈল রান্নার মাধ্যম হিসাবে ব্যাপক-ভাবে ব্যবহৃত হয়।

গুড় তৈয়ারীর জন্য আখের রস জ্বাল দেওয়া হইতেছে। জ্বালানি হিসাবে নিংড়ানো আখ ব্যবহার করা হইতেছে।

যে খইলের স্থলে রাসায়নিক সার অধিকতর উপযোগী। কারণ রাসায়নিক সারে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় নাইট্রোজেন, ফসফোরস ও পটাশিয়ম অনেক বেশী পরিমাণে থাকে।

রাসায়নিক সার ২ হইতে ৪ মাত্রায় প্রয়োগ করা দরকার। দক্ষিণ ভারতে ৪-৫ মাত্রা ও উত্তর ভারতে ১-৩ মাত্রা সুপারিশ করা হয়। প্রথম মাত্রা রোপণের সময় প্রয়োগ করা হয় এবং ইহা অঙ্কুরোদ্গমে সহায়তা করে। দ্বিতীয় মাত্রা বিয়ান গঠনে সাহায্য করে। তৃতীয় ও ততোধিক মাত্রাগুলি আখের যথাযথ বৃদ্ধি বজায় রাখিবার জন্য প্রয়োজন হয়। সার বিলম্বে প্রয়োগ করিলে, কাণ্ড ইত্যাদির বৃদ্ধিতে বিলম্ব ঘটে, ফলে রসের উৎকর্ষ হ্রাস পায় (চিত্র নং ৪০)।

আগাছা দমন

ইক্ষুর পরবর্তী বলিতে আগাছা দমন ও মাটি তুলিয়া দেওয়া বুঝায়। রাসায়নিক পদ্ধতিতে আগাছা দমন করা যায়। 2, 4-D দুই স্প্রে করা আবশ্যক; প্রথমবার রোপণের পাঁচ দিন পরে এবং দ্বিতীয়বার রোপণের ২০-২৫ দিন পরে। প্রতিবার ১½ পাউণ্ড 2, 4-D অম্ল-সমতুল (acid-equivalent) পরিমাণ 2,4-D প্রয়োগ করিতে হইবে। মহারাষ্ট্র ও মহীশূর রাজ্যে ইক্ষু ক্ষেত্রে বর্ষজীবী উদ্ভিদ ঐভাবে দমন করা হয়। এ রাসায়নিক পদ্ধতির সহিত বিদা দ্বারা মাটি আলগা করিয়া দিলে হাত-নিড়ানি দেওয়ার আবশ্যক হয় না।

আখের গোড়ায় মাটি তুলিয়া দেওয়া অপর একটি প্রধান পরিচর্যা। রোপণের দুই মাস পরে হাল্কা লাঙ্গল দ্বারা অল্প মাটি তুলিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর রোপণের ৪½ হইতে ৫ মাস পরে ভারী ভলী করা লাঙ্গল দ্বারা বেশী মাটি তুলিয়া দেওয়া হয়।

ফসল সংগ্রহ

জাত ও রোপণের ঋতু অনুসারে ১১ হইতে ২০ মাস পরে ইক্ষু পাকে। যে সকল জাতে ফুল ফুটে, ফুল ঝরিতে আরম্ভ করিলে বুঝিতে হইবে যে ইক্ষু কাটিবার সময় হইয়াছে। কাণ্ডের পর্বস্থ মুকুল বা চোখ ফুলিয়া উঠিলেও আখ কাটিবার সময় হইয়াছে বুঝা যায়। অবশ্য আখ পাকিয়াছে কিনা তাহা নির্ণয় করিবার আদর্শ পদ্ধতি হইল যথাযথ যন্ত্র দ্বারা রসস্থ মোট কঠিন পদার্থ ও শর্করার পরিমাণ নির্ণয় করা।
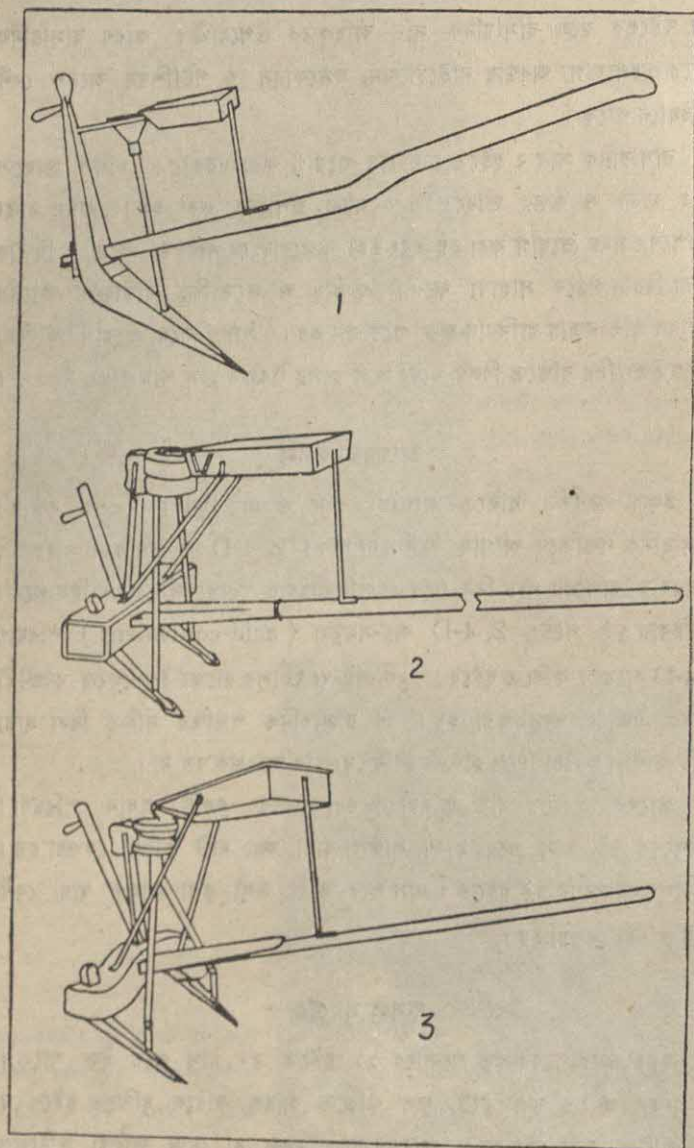
চিত্র নং ৪০। ইক্ষুতে সার প্রয়োগের সরঞ্জাম

1. রোপণের পূর্বে প্রথমবার সার প্রয়োগের জন্য 2. দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার সার প্রয়োগের জন্য ; 3. শেষবার সার প্রয়োগের জন্য

[H· R. ARAKERI মহাশয়ের সৌজন্যে]

বিপণন

ইক্ষু সরাসরি চিবাইয়া বা নিংড়াইয়া রস পান করিবার জন্য বিক্রয় করা যায়। আবার চিনি বা গুড় তৈয়ারি করিবার জন্যও বিক্রয় করা যায়। যেখানে চিনি কল নাই, সেখানে গুড় তৈয়ারি করাই বাঞ্ছনীয়।

গুড় তৈয়ারি করিবার পদ্ধতিতে দুইটি প্রধান ধাপ আছে। একটি হইল ইক্ষু হইতে রস নিংড়ানো এবং অপর ধাপ হইল রস জ্বাল দেওয়া। সাধারণত বলদ বা শক্তি চালিত মাড়াই যন্ত্র দ্বারা রস নিংড়ানো হয়।

উনুনের উপরে বড় কড়াইতে রস জ্বাল দেওয়া হয়। কড়াই-এর আয়তন অঞ্চল বিশেষে বিভিন্ন প্রকার। মহারাষ্ট্র রাজ্যে সর্ববৃহৎ যে কড়াই ব্যবহৃত হয় তাহাতে ৩,৬০০ পাউণ্ড রস ধরে। উত্তর ভারতে ব্যবহৃত কড়াইতে সাধারণতঃ ৫০০ পাউণ্ড রস ধরে। জ্বালানি কম লাগে এইরূপ উন্নত ধরনের চুল্লী উদ্ভাবিত হইয়াছে। সাধারণত আখের বর্জ্য অংশ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

জ্বাল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রস পরিষ্কার করিতে হইবে। এক ঘন্টার মধ্যেই রসের তাপমাত্রা ৮০° হইতে ৮৫° ফা. হইলে প্রথম গাদ (ময়লা) ভাসিয়া উঠে। সাবধানে এই গাদ অপসারণ করা হয়। নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য যোগে অবশিষ্ট ময়লা পরিষ্কার করা হয়। তাপমাত্রা বাড়িয়া ৯৮° ফা পর্যন্ত উঠে এবং প্রায় সমস্ত জল বাষ্পীভূত না হওয়া পর্যন্ত তাপমাত্রা স্থির থাকে। অতঃপর তাপমাত্রা ১১৫°—১২০° ফা. পর্যন্ত উঠিলে উনুন হইতে কড়াই নামানো হয়। এবং প্রায় কঠিন অবস্থায় রস অপর পাত্রে ঢালা হয় এবং ঠাণ্ডা হইলে উহাকে গুড় বলে (চিত্র নং ৪১)।

মুড়ি আখ (Ratoon)

আখ বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। আখ কাটিয়া লইবার পর আখের গোড়া হইতে যে আখ উৎপন্ন হয় তাহাকে মুড়ি আখ বলে। আখ কাটিবার পর ভেলীর মাটিতে লাঙ্গল চালাইয়া দুই সারির মধ্যবর্তী জমির মাটি উত্তমরূপে কর্ষণ করিতে হয়। ৪-৬ সপ্তাহ পরে জলসেচন আরম্ভ করিতে হয়। একর প্রতি ১০০০ পাউণ্ড অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রয়োগ করিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।
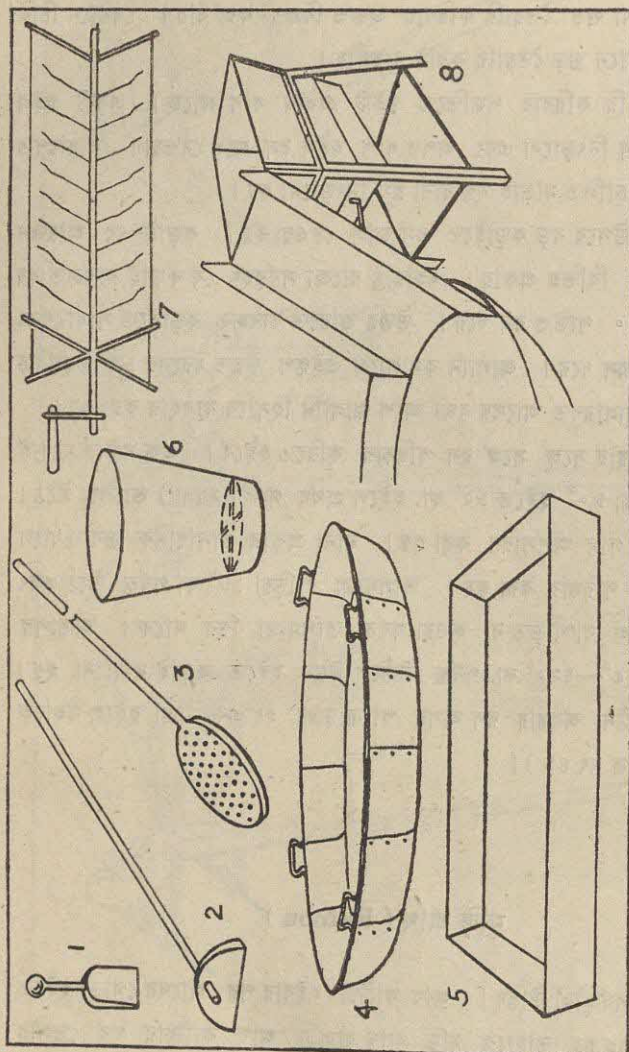
চিত্র নং ৪১। ইক্ষু হইতে গুড় তৈয়ারী করিবার সরঞ্জাম।

1. গুড় চাঁচিবার কাঠের দণ্ড 2. কাঠের কোদাল, 3. কাঠের ঝাঁজরা, 4. রস জ্বাল দিবার কড়াই, 5. গুড় ঠাণ্ডা করিবার কড়াই,
6. ছাঁচ, 7. কাঠের মন্থন দণ্ড, 8. গাদ ছাঁকিবার সরঞ্জাম।

[H. R. ARAKERI মহাশয়ের সৌজন্যে]

জাত

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের উপযোগী উন্নত জাত উদ্ভাবনের জন্য মাদ্রাজ রাজ্যের কোয়েম্বাটুরে বহু গবেষণা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী জাতগুলি হইল : সি-ও ৫২৭, সি-ও ৪১৯, সি-ও ১০০৮, সি-ও ৩১২ ও সি-ও ৬২২।

সংক্ষিপ্তসার

ভারতে ইক্ষু চাষের জমির পরিমাণ যে কোন দেশ অপেক্ষা বেশী, কিন্তু ফলন পৃথিবীর মধ্যে সর্বনিম্ন—একরপ্রতি মাত্র ১৪ টন। উত্তর প্রদেশে মোট জমির পরিমাণ ও মোট ফলন উভয়ই বেশী। ইক্ষু ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ এবং ইহার প্রকৃতি সাধারণ ঘাসের ন্যায়। পৃথিবীর উষ্ণ ও মন্দোষ্ণ মণ্ডলে নানা প্রকার জলবায়ু ও মাটিতে ইক্ষুর চাষ হয়। উত্তম নিকাশী দোআঁশ মাটি ইক্ষুর পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট। ইক্ষু চাষের ব্যাপক প্রসারে নিম্ন তাপমাত্রা প্রধান বাধা। গবেষণার ফলে উন্নত পরিচর্যার প্রবর্তন হইয়াছে। আখের টুকরার মাধ্যমে বংশ-বৃদ্ধি ঘটে। জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর বা জুন-জুলাইতে আখ রোপণ করা হয়। আর্দ্র বা শুষ্ক পদ্ধতিতে ইক্ষু রোপণ করা হয়। একর প্রতি ১০,০০০ হইতে ১৫,০০০ টুকরা লাগে।

জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগে ইক্ষুর ফলন বৃদ্ধি পায়। মহারাষ্ট্র রাজ্যে অনেকক্ষেত্রে ১৮ মাসের ফসলে একর প্রতি প্রায় ১ টন অ্যামোনিয়ম সালফেট বা সমতুল খইল প্রয়োগ করা হয়। ফসফেটঘটিত সারও প্রায় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। ইহা ফলনও বাড়ায় আবার রসের উৎকর্ষও বৃদ্ধি করে। 2, 4-D প্রয়োগ করিয়া আগাছা দমন করা যায়। যথাযথ সেচপ্রয়োগে ইক্ষুর ফলন বাড়ে।

ইক্ষুর রস হইতে গুড় প্রস্তুত করিতে উন্নত চুল্লী ব্যবহার ও রস জ্বাল দেওয়ার উন্নত পদ্ধতি সুপারিশ করা হয়। মাদ্রাজ রাজ্যের কোয়েম্বাটুরে উদ্ভাবিত উন্নত জাত সম্পূর্ণরূপে পুরাতন জাতগুলির স্থান অধিকার করিয়াছে। আখ কাটিয়া লইবার পর গোড়া হইতে মুড়িআখ উৎপন্ন হয়। উন্নত পরিচর্যা ও সার প্রয়োগে উচ্চ ফলন পাওয়া যায়।

প্রশ্ন

১। শর্করা উৎপাদনকারী প্রধান উদ্ভিদগুলির নাম লিখ।

২। তোমার এলাকায় কি কি জৈব ও রাসায়নিক সার কি পরিমাণে এবং কখন প্রয়োগ করা হইবে তাহা লিপিবদ্ধ কর।

৩। রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগে ইক্ষুক্ষেত্রে আগাছা দমন পদ্ধতি সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৪। তোমার এলাকায় ইক্ষু চাষে পুরাতন পরিচর্যার পরিবর্তে কি কি নূতন পরিচর্যা অবলম্বন করা যায় তাহা লিখ।

৫। তোমার এলাকায় কোন কোন জাতের ইক্ষু চাষ করা উচিত এবং স্থানীয় জাতগুলির সহিত উন্নত জাতগুলির বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর।

সহায়ক পুস্তক

Aiyer, A. K. Yegna Narayan, *Field Crops of India*, Bangalore Printing and Publishing Co., Ltd., Bangalore, Mysore State, 1954

Arakeri, H. R., G. V. Chalam, P. Satyanarayana, and Roy L. Donahue, *Soil Management in India*, Asia Publishing House, Bombay, Second Edition, 1962

Arakeri, H. R., *Present Position of Sugar Cane Research and Development in Bombay State*, Sugar Cane Research Station, Padegaon, Maharashtra State (1929-54), 1956

Artech Wager, Ernest, and E. W. Brandes, *Sugar Cane Agriculture Handbook No. 122*, United States Department of Agriculture, Washington D. C. 1958

Bhatta, K. L., *Main Principles of Sugar Cane Cultivation*, Department of Agriculture, Mysore State, and Indian Central Sugar Cane Committee, Information Series Flip Book No. 1, Department of Agriculture, Bangalore, Undated.

Mudaliar, V. T. Subbiah, *Common Cultivated Crops of South India*, Amudha Nilayam Private Ltd., Madras, 1955

Ochse, J. J., M. J. Soule, Jr., M. J. Dijkman and C. Wehlburg, *Tropical and Subtropical Agriculture*, Volumes I and II, The Macmillan & Co., New York, 1961

Sawhney, K., J. A. Daji and D. Raghavan, Editors, *Handbook of Agriculture*, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, 1961

Sugar Cane Cultivation in Bombay State, Director of Printing, Government of Bombay, 1957

Sugar Cane Research in India (A Review), Indian Central Sugar Cane Committee, New Delhi, 1959

Tempany, Harold and D. H. Grist, *An Introduction to Tropical Agriculture*, Longmans, Green & Co., New York, 1958

নবম অধ্যায়

ডালশস্য (Pulses)

ডালশস্য প্রোটিনে সমৃদ্ধ। ইহা ভারতীয়দের একটি প্রধান খাদ্য। অনেক ডালের বীজ অপক্ক অবস্থায়ই খাওয়া হয়; উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতা টুকরা করিয়া কাটিয়া ভূষা তৈয়ারি হয় এবং ইহা প্রোটিন-সমৃদ্ধ উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য। বিভিন্ন কারণে ডালজাতীয় ফসলকে মৃত্তিকা গঠনকারী ফসল বলা হয়। ইহারা শিম্ব গোত্রীয় ফসলের অন্তর্ভুক্ত; কাজেই ইহাদের মূলে অঙ্কুর গঠিত হয়। এই অঙ্কুরস্থিত ব্যাকটিরিয়া বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন বন্ধন করিতে পারে। কাজেই মাটি সমৃদ্ধ হয়। ডালশস্য মূল গভীর স্তরে প্রবেশ করিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরগুলিকে সচ্ছিদ্র করে। ফসলের অগ্রভাগ দ্রুত বৃদ্ধি পায় ও মাটিকে আবৃত করে। ফলে বৃষ্টির ফোঁটা সরাসরি মাটিকে আঘাত করিতে পারে না এবং ভূমিক্ষয় হ্রাস পায়। এজন্য অধিকাংশ ডালশস্যকে ভূমিক্ষয় প্রতিরোধকারী ফসল মনে করা হয়। ইহাদের সবুজ সার ফসলরূপেও ব্যবহার করা যায়। এক কথায় বলা যায় ডালশস্য পরবর্তী ফসলের উপকার করে; সেজন্যে মিশ্র ফসল ও শস্য পর্যায়ে ইহাদের অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয় (চিত্র নং ৪২)।

ভারতের যে কোন অঞ্চলে একটি না একটি ডালশস্যের চাষ হইয়া থাকে। সকল ডালশস্য দুইটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: **খরিপ** ডালশস্য ও **রবি** ডালশস্য। অড়হর, কুরতি কলাই, বরবটি, কালো কলাই প্রভৃতি হইল প্রধান খরিপ ডালশস্য। প্রধান রবি ডাল শস্যগুলি হইল ছোলা, মসুর, মটর ইত্যাদি। (চিত্র নং ৪২)।

চিত্র নং ৪২। ডালশস্য শিম্বিগোত্রীয় উদ্ভিদ। ইহার মূলের অঙ্কুরস্থ ব্যাকটিরিয়া বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন বদ্ধ মাটিকে উর্বর করিয়া তোলো।

[DONAHVE and THORNTON হইতে পুনরঙ্কিত]

উপরোক্ত ডালশস্যের অনেকগুলি মিশ্রফসল হিসাবে তণ্ডুল জাতীয় শস্যের সহিত চাষ করা হয়। যে সকল অঞ্চলে বৎসরে দুই বা তিনটি ফসল করা সম্ভব সে সকল অঞ্চলে ডালশস্য অবিমিশ্র ফসলরূপে চাষ করা যায়। সাধারণত নিশ্চিত বৃষ্টিপাত বা সেচপ্রাপ্ত অঞ্চলে বৎসরে একাধিক ফসলের চাষ করা সম্ভব হয়।

মহারাষ্ট্র রাজ্যে অড়হর মাড়াই করা হইতেছে।
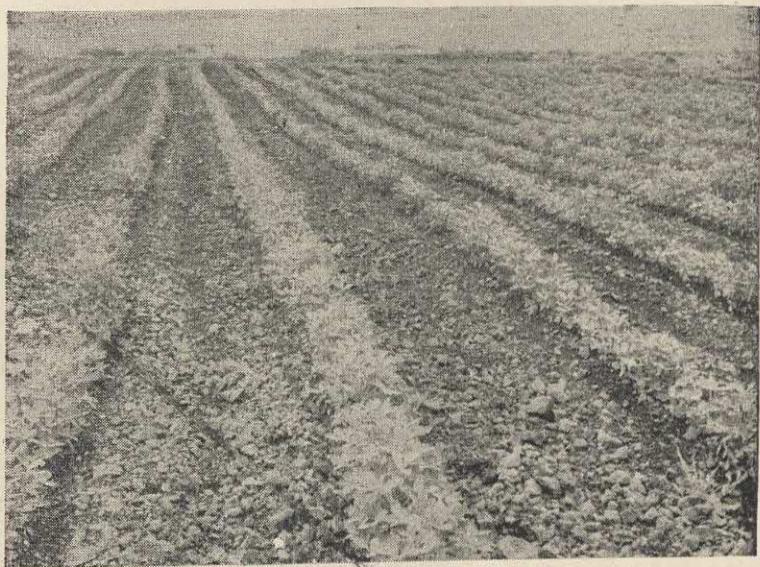
খাইবার বাদাম ও রান্নার মাধ্যম তৈলের জন্য চীনাবাদাম বেশ জনপ্রিয়। (গুজরাট রাজ্য)।

তিল হইতে মূল্যবান রান্নার মাধ্যম তৈল পাওয়া যায় (মহারাষ্ট্র রাজ্য)।

রেড়ি হইতে উৎকৃষ্ট তৈল (রান্নার মাধ্যম নয়) তৈল পাওয়া যায় এবং তাহা রপ্তানি করিয়া দেশের প্রচুর বিদেশী মুদ্রা অর্জন হয় (অন্ধ্রপ্রদেশ)।
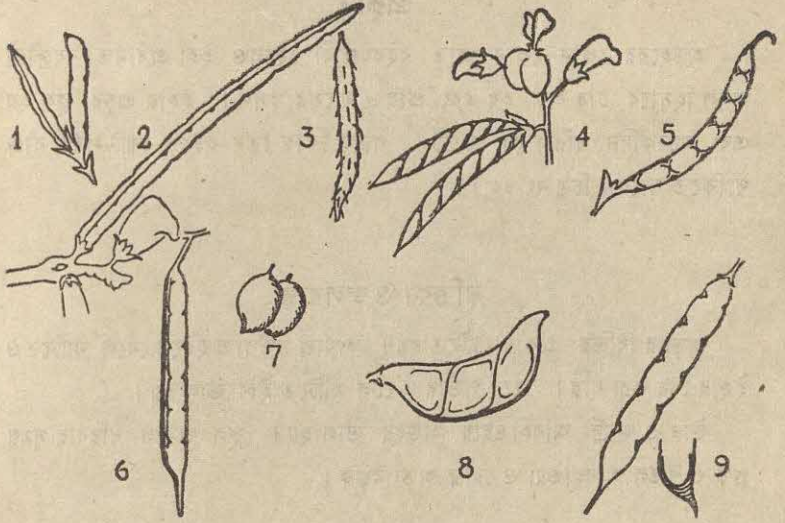
চিত্র নং ৪৩। আমাদের দেশের বিভিন্ন ডালশস্য

1. মুগ ; 2. বরবটি ; 3. কালোকলাই। 4. অড়হর ; 5. কুর্তি কলাই ; 6. গুয়ার ; 7. ছোলা ; 8. সীম : ও 9. মটর। [H. R. ARAKERI মহাশয়ের সৌজন্যে]

ভারতবর্ষে প্রায় ৫ কোটি ৫০ লক্ষ একর জমিতে ডালশস্যের চাষ হয় এবং ডালের মোট ফসল প্রায় ১ কোটি টন। উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ ও বিহার রাজ্যে ডালের এলাকা বেশী। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২০ লক্ষ একর জমিতে ডালের চাষ হয়। ডালের মোট ফলন ৪ লক্ষ টন।

ডালের ফুল সাধারণত ছোট ও রঙিন। বীজ শিম্বের ভিতরে থাকে। সকল ডালশস্যে মূল মাটির গভীরে প্রবেশ করে এবং প্রাধান মূল শাখা মূল সহ সুগঠিত। কয়েকটি ডালশস্যের চাষ প্রণালী নিম্নে বর্ণিত হইল।

অড়হর

(**Pigeon pea, Red gram**) (*Cajanus Cajan*)

ইহা ভারতের প্রায় সর্বত্র মিশ্র ফসলরূপে চাষ করা হয় ইহার বীজ ডাল হিসাবে এবং বীজের খোসা ও গাছের পাতা শস্যখাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

প্রকৃতি

অড়হরের কোন কোন জাত বহুবর্ষজীবী হইলেও ইহা প্রধানত বর্ষজীবী ফসল হিসাবে চাষ করা হয় এবং প্রায় ৮ মাসের ফসল। ইহার প্রচুর ফুল হয় এবং অনেকদিন ধরিয়া ফুল ফোটে। পাকা শিম্বে তিন হইতে ছয়টি পর্যন্ত বীজ থাকিতে পারে (চিত্র নং ৪৩)।

মৃত্তিকা ও জলবায়ু

অড়হর বিভিন্ন প্রকার মাটিতে হয়। পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হইলে বেলে মাটিতেও ইহার চাষ করা যায়। তবে গভীর এঁটেল মাটিতে ইহা ভাল হয়।

উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় অড়হর ভাল হয়। ফুল ও ফল ধরিবার সময় শুষ্ক ও শীতল আবহাওয়া ও রৌদ্র অত্যাবশ্যক।

পরিচর্যা

অড়হর মিশ্র ও অবিমিশ্র ফসল হিসাবে চাষ করা যায়। অবিমিশ্র ফসলরূপে যখন চাষ করা হয় তখন অন্যান্য খরিপ শস্যের মতই ইহার জমি চাষ করা হয়। জুন জুলাই মাসে ৪ ফুট অন্তর সারিতে বীজ বপন করা হয়। ঐ সারিতে বীজের নীচে সুপার ফসফেট প্রয়োগ করিতে পারিলে ভাল হয়। মিশ্র ফসল-রূপে চাষ করিলে সাধারণত প্রতি ষষ্ঠ বা অষ্টম সারিতে অড়হর বপন করা হয়। অনেক সময় প্রধান ফসল ও অড়হরের বীজ একত্র মিশাইয়া বপন করা হয়।

ফসল আহরণ

জানুয়ারীর শেষে বা ফেব্রুয়ারীর প্রথমে অড়হর কাটিবার সময় হয়। লাঠির সাহায্যে পিটাইয়া বীজ ছাড়ানো হয়। একর প্রতি ফলন ৫—১২ মণ।

জাত

বীজের বর্ণ অনুসারে জাতের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। দাক্ষিণাত্যে হলদে জাত এবং দেশের উত্তরাঞ্চলে সাদা জাত অধিকাংশ কৃষক চাষ করিয়া থাকেন।

ছোলা (Gram, Chickpea)

(*Cicer arietinum*)

ভারতে ছোলা চাষের জমি অন্যান্য যে কোন ডাল শস্য অপেক্ষা বেশী এবং ডালশস্যের মোট এলাকার এক তৃতীয়াংশেরও অধিক জমিতে ছোলার চাষ হয়। ছোলা বীজ কাঁচা ও শুষ্ক উভয় অবস্থাতেই মনুষ্য খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ছোলা বীজ অনেকক্ষেত্রে পশুখাদ্য হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। গাছের কচি পাতা সবজিরূপেও ব্যবহৃত হয়। পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে ব্যাপকভাবে ছোলার চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় এক তৃতীয়াংশের বেশী একর জমিতে ছোলার চাষ হয়।

প্রকৃতি

ছোলা অনুচ্চ বর্ষজীবী উদ্ভিদ, উচ্চতা ১½ ফুট হইতে ২ ফুট মাত্র। অনুকূল আবহাওয়ায় ইহার প্রচুর শাখা জন্মায়। পাতা ছোট কিন্তু যৌগিক। ফুল ছোট এবং সাদা বা পাটল বর্ণবিশিষ্ট হয়। বীজগুলি শিম্বের ভিতরে থাকে এবং এক একটি শিম্বে একটি বা দুইটি বীজ থাকে। বীজত্বক সবুজ, তামাটে বা কৃষ্ণবর্ণ হইতে পারে। মূলতন্ত্র মাটির গভীরে প্রবেশ করে এবং বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন বন্ধন করিবার জন্য বহু অঙ্কুর থাকে।

মৃত্তিকা ও আবহাওয়া

ছোলা এঁটেল মাটির ফসল এবং গভীর পলিজ এঁটেল ও কৃষ্ণবর্ণ এঁটেল মাটিতে ফলন ভাল হয়। দোয়াঁশ মাটিতে সেচ প্রয়োগে ফলন ভাল হয়। বেলে মাটি ছোলা চাষের উপযোগী নয়।

শীতকালীন ফসল হইলেও বৃদ্ধির কোন অবস্থাতেই ছোলা তুষারপাত সহ্য করিতে পারে না। শীতল ও শুষ্ক জলবায়ু ছোলার পক্ষে আদর্শ। বপনের পরে অতি বৃষ্টি হইলে অঙ্কুরোদগম হ্রাস পায়।

পরিচর্যা

শীতকালে অবিমিশ্র ফসল হিসাবে বা গম অথবা জোয়ারের সহিত মিশ্র ফসলরূপে চাষ করা হয়। এঁটেল মাটিতে অনেক সময় পূর্ববর্তী খরিপ ফসল কাটিবার পর দ্বিতীয় ফসলরূপে ছোলা চাষ করা হয়। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে ছোলা বপন করা হয়। ১২ ইঞ্চি হইতে ১৮ ইঞ্চি দূরে সারিতে ভারী বপন যন্ত্রের সাহায্যে বীজ বপন করা যায়। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত হাতে ছড়াইয়া বীজবপন করা হয়। কোন পরিচর্যা বা নিড়েন প্রয়োজন হয় না। একর প্রতি ১০০ পাউণ্ড সুপার ফসফেট প্রয়োগে উত্তম সাড়া পাওয়া যায়।

ফসল সংগ্রহ

সবুজ সবজি হিসাবে প্রয়োজন হইলে কচি পাতা ছিঁড়িয়া লওয়া হয়। সবুজ শিম্ব সবজি হিসাবে ব্যবহার করিলে, পুরো গাছই সবুজ অবস্থায় মাটি হইতে উপড়াইয়া ফেলা হয়। বীজের জন্য শিম্ব শুষ্ক হইলে ফসল আহরণ করা হয়। গাছ উপড়াইয়া তুলিয়া লাঠি দিয়া পিটাইয়া বা গরু দ্বারা মাড়াইয়া বীজ পৃথক করা হয়।

সেচবিহীন অবস্থায় একর প্রতি ৩০০ হইতে ৪০০ পাউণ্ড এবং সেচ প্রয়োগে প্রায় ৮০০ পাউণ্ড পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

জাত

পশ্চিমবাংলার অনুমোদিত ছোলার জাতগুলি হইল :

বরবটি (Cowpea)

(*Vigna Catiang*)

সবুজ সার ফসল বা সবুজ সবজি বা শুষ্ক বীজ অথবা কাঁচা বা শুষ্ক পশুখাদ্য হিসাবে অড়হরের চাষ করা হয়। বরবটি খরিপ ও রবি উভয় ঋতুতেই চাষ করা যায়।

১৮ ইঞ্চি দূরে দূরে সারিতে বপন করা হয়। সেচ প্রয়োগে চাষ করিয়া ২½ ফুট হইতে ৩ ফুট দূরে অবস্থিত ভেলীর উভয় পার্শ্বে বীজ বপন করা হয়। একর প্রতি ২৫ হইতে ৩০ পাউণ্ড বীজ লাগে। বপনের পূর্বে সুপার ফসফেট প্রয়োগে উত্তম সাড়া পাওয়া যায়।

মসুর (**Lnetil**)

(*Ervem Lens*)

মসুরের বীজ সচরাচর ডাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় কাঁচা শিম্বও খাওয়া হয়। প্রধানত মধ্য প্রদেশ, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে ইহার চাষ হর।

মসুর বর্ষজীবী উদ্ভিদ এবং প্রায় ১৮ ইঞ্চি উঁচু হয়। কাণ্ডের বর্ণ সবুজ। পত্র যৌগিক এবং অগ্রভাগ আকর্ষে রূপান্তরিত হয়। ফুলগুলি ছোট এবং সাদা বা রঙিন হইতে পারে। মূলতন্ত্র অগভীর।

মাটি ও জলবায়ু

কৃষ্ণবর্ণ এঁটেল মাটি ও ধানের জমিতে মসুর ভাল হয়। ইহা রবি মরসুমের ফসল এবং সাধারণত পূর্ববর্তী খরিপ ফসল আহরণ করিবার পর মসুরের চাষ করা হয়।

পরিচর্যা

লাঙ্গল ও হ্যারো চালাইয়া জমি তৈয়ারী করিয়া বীজ বপন করা হয়। অক্টোবর মাসে বীজ বপন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত হাতে ছড়াইয়া বীজ বপন করা হয়। মসুরে কোন পরবর্তী পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না।

ফসল আহরণ

সাড়ে তিন মাস সময়ে ফসল পাকে। গাছ উপড়াইয়া লাঠি দ্বারা পিটাইয়া বীজ পৃথক করা হয়। একর প্রতি গড়ে ৩০০ হইতে ৪০০ পাউণ্ড ফলন হয়।

খেসারী (*Lathyrus sativas*)

খেসারী একটি উত্তম ডালশস্য এবং পর্যায়ক্রমে চাষের উপযোগী। ইহার বীজ খাইবার পূর্বে উত্তমরূপে সিদ্ধ করা উচিত নতুবা শরীরের নানা অংশের জোড়া শক্ত হইয়া যাইতে পারে। বীজ পশুকে খাওয়ানো হয়। ইহার ভূষাও উত্তম পশুখাদ্য। প্রধানত উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাট ও বিহারে এ ফসলের চাষ হয়।

ইহার গাছ ১½ ফুট উঁচু হইতে পারে। পাতা ছোট ও যৌগিক। ফুলও ছোট এবং হালকা নীল বর্ণবিশিষ্ট। খরিপ ফসল কাটিবার পর মাটিতে যে রস থাকে তাহাতেই ইহার চাষ হয়; ফলে গভীর এঁটেল মাটি খেসারী চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহা রবি মরসুমের ফসল। কাজেই বপনের পরে কোন বৃষ্টিপাত আবশ্যক হয় না। শীতল ও শুষ্ক জলবায়ু ইহার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

পরিচর্যা

বর্ষাকালীন বৃষ্টিপাত শেষ হইয়া গেলে জমি বারংবার লাঙ্গল ও হ্যারো চালাইয়া প্রস্তুত করা হয়। দেশী লাঙ্গল চালাইয়া যে ফালির সৃষ্টি হয় তাহাতে বীজ বপন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত ছড়াইয়া বীজ বপন করা হয়। আবার ধান খেতে ধান কাটিবার পূর্বেই বীজ ছড়ান যায়। এক্ষেত্রে জমি তৈয়ারী করিবার প্রয়োজন হয় না। একর প্রতি ৩০ হইতে ৫০ পাউণ্ড বীজ লাগে।

ফসল কাটিয়া লাঠি দ্বারা পিটাইয়া বা বলদ দ্বারা জড়াইয়া বীজ পৃথক করা হয়। ফলন একর প্রতি ১০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত হইতে পারে। সাধারণত স্থানীয় জাতের চাষ করা হয়।

সংক্ষিপ্তসার

ডালশস্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য ফসল। ইহারা মৃত্তিকার উর্বরতা সাধন করে। মানুষ ও পশুর প্রয়োজনীয় প্রোটিন ডালশস্য হইতে পাওয়া যায়। অড়হর, কুরতি কলাই, বরবটি, কালো কলাই প্রভৃতি হইল প্রধান খরিপ ডাল-

শস্য। প্রধান রবি ডালশস্যগুলি হইল ছোলা, মসুর, মটর, খেসারী ইত্যাদি। অধিকাংশ ডালশস্য তণ্ডুলজাতীয় ফসলের সহিত মিশ্র ফসল হিসাবে চাষ করা হয়। যেখানে বৎসরে দুইটি ফসলের চাষ করা হয় প্রধানত সেখানে ডালশস্য অবিমিশ্র ফসল হিসাবে চাষ করা হয়। ডালশস্য, বিশেষ করিয়া রবি ডালশস্য এঁটেল মাটিতে ভাল হয়। কোন কোন খরিপ ডালশস্য বেলে মাটিতেও চাষ করা যায়। সাধারণ বৃষ্টিপাত ও উষ্ণ জলবায়ুতে খরিপ ডালশস্যের ফলন ভাল হয়। মাটির অবশিষ্ট আর্দ্রতায়, শুষ্ক ও শীতল জলবায়ুতে রবি ডালশস্যের ভাল ফলন পাওয়া যায়। জুন মাসে খরিপ ডালশস্য এবং অক্টোবর-নভেম্বরে রবি ডালশস্য বপন করা হয়। ফসফেটঘটিত সার প্রয়োগে ডালশস্যের ফলন বাড়ে।

প্রশ্ন

১। ডালশস্যের উপযোগিতা কি ?

২। বিভিন্ন ঋতুর বিভিন্ন ডালশস্যের নাম লেখ।

৩। ছোলার চাষ প্রণালী সম্পর্কে যাহা জান লেখ।

সহায়ক পুস্তক

Aiyer, A. K. Yegna Narayan, *Field Crops of India*, Bangalore Press, Bangalore City, Mysore State, 1954

Arakeri, H. R., G. V. Chalam, P. Satyanarayana and Roy L. Donahue, *Soil Management in India*, Asia Publishing House, Bombay, Second Edition, 1962

Pugh, B. M., and C. P. Dutt, *Crop Production in India*, Allahabad Agricultural Institute, Allahabad, 1940

Sawhney, K., J. A. Daji and D. Raghavan, Editors, *Handbook of Agriculture*, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, 1961

Solomon S., *Crops of the Bombay State, their Cultivation and Statistics*, Bombay Department of Agriculture, Bulletin 191, 1951

United States Department of Agriculture, *Seeds : The Yearbook of Agriculture*, 1961, U. S. Government Printing Office, Washington, D. C.

দশম অধ্যায়

তৈলবীজ

যে সকল উদ্ভিদের বীজ হইতে তৈল পাওয়া যায় তাহাদিগকে তৈলবীজ বলে। ভারতে প্রধান তৈলবীজ ফসলসমূহ হইল চীনাবাদাম, তিল, রেড়ি, সূর্যমুখী, তিসি, শ্বেত রাই ও সরিষা। রাই, সরিষা, সূর্যমুখী ও তিসি হইল রবি ফসল এবং চীনাবাদাম, তিল ও রেড়ি হইল খরিফ ফসল।

ভারতের চাষযোগ্য জমির এক-দশমাংশতে তৈলবীজ ফসলের চাষ হয়। ইহাদের বিক্রয় করিয়া ভারতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় এবং ভারতের মুখ্যত নিরামিষ খাদ্যে ইহারা স্নেহপদার্থ যোগায়। অধিকাংশ তৈলবীজ হইতে প্রাপ্ত খইল জমিতে সার এবং হাঁস-মুরগী ও গৃহপালিত পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পাঠক্রম অনুসারে নিম্নে রাই ও সরিষার চাষ প্রণালী বর্ণিত হইল। গুরুত্বপূর্ণ ফসল হিসাবে চীনাবাদামের চাষ প্রণালীও বর্ণনা করা হইল।

রাই ও সরিষা (Rape and Mustard)

(*Brassica napus and Brassica nigra*)

প্রধানত উত্তর ভারতে এবং দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি রাজ্যেও রাই ও সরিষার চাষ হয়। ইহাদের তৈল রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। রাই-এর বীজ পিঙ্গল বা লালচে পিঙ্গল বর্ণবিশিষ্ট এবং ইহার বীজত্বক অমসৃণ। সরিষা বীজ হলদে বা লালচে পিঙ্গল বর্ণবিশিষ্ট এবং ইহার বীজত্বক মসৃণ।

উত্তরপ্রদেশে সর্বাধিক পরিমাণ জমিতে এ তৈলবীজের চাষ হয়। ইহার

সেচ প্রদত্ত জমিতে তুলার চারা নির্গত হইতেছে (মহারাষ্ট্র)। [Roy Sellers মহাশয়ের সৌজন্যে]।

কয়েকটি বীজ আর্দ্র বালিতে রাখিয়া বপনের পূর্বে তুলা বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা ও অন্যান্য অস্বাভাবিকতা নির্ণয় করা যায় ঐরূপ পরীক্ষার বার দিন পরে দেখা যাইতেছে যে ফটোর উপরের চারাগুলি স্বাভাবিক কিন্তু নীচের অংশের চারাগুলি অস্বাভাবিক যে সব তুলার বীজ হইতে স্বাভাবিক চারা পাওয়া যাইবে, কেবল সেগুলিই ব্যবহার করা উচিত United States Department o Agriculture-এর সৌজন্যে)।

গুজরাট রাজ্যের আনন্দে কৃষি কলেজে,
বামে : হুক্কা তামাক, ডাইনে : বিড়ি তামাক।

ফোটা তুলা (উপরে বামে) আহরণের উপযোগী। ইহা হইতে সাদা তন্তু পৃথক করিয়া ও গাঁট বাঁধিয়া কাপড়ের কলে (নীচে, হায়দরাবাদে গরুর গাড়ীতে) কাপড় তৈয়ারীর জন্য পাঠানো হয়। [উপরে : Encyclopaedia Britannica Films, Inc, ও নীচে : Roy L. Donahue মহাশয়ের সৌজন্যে]।

মহারাষ্ট্র রাজ্যের আনন্দে কৃষি কলেজে বিড়ি তামাকের চারা রোপণ।

গোলমরিচের লতা (কেরালা রাজ্য)।

বৃক্ষছায়ায় এলাচি গাছ। ইহার বীজ তরকারি সুস্বাদু করিবার জন্য ও খাওয়ার পরে মশলা হিসাবে ব্যবহার করা হয় (কেরালা রাজ্য)।

হলুদের ক্ষেত। ইহার মৃত্তিকাস্থ রাইজোম খাদ্যে মশলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহার রস হলুদে বর্ণবিশিষ্ট (মহারাষ্ট্র রাজ্য)।

পর যথাক্রমে পাঞ্জাব, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, পশ্চিমবাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্থান। দক্ষিণ ভারতে অল্প জমিতে সাধারণত মিশ্র ফসল (mixed crop) হিসাবে ইহার চাষ হয়।

মৃত্তিকা ও জলবায়ু

রাই ও সরিষার জন্য পলিমাটিই সর্বোৎকৃষ্ট। উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশে লাল দোআঁশ মাটিতেও অনেক সময় ইহাদের চাষ করা হয়।

পরিচর্যা

অন্যান্য রবি (শীতকালীন) ফসলের ন্যায় জমি তৈয়ারি করা হয়। রাই ও সরিষার বীজ যেহেতু ছোট, সেজন্য ১ ইঞ্চির বেশি নীচে বপন করা উচিত নয়।

ফসল আহরণ

বপনের ছয় হইতে সাত সপ্তাহ পরে ফুল ধরিতে আরম্ভ করে এবং পরবর্তী ছয় সপ্তাহে ফসল সংগ্রহের উপযোগী হয়। পুরো গাছ উপড়াইয়া এবং লাঠির সাহায্যে পিটাইয়া বীজ পৃথক করা হয়। একর প্রতি গড়ে ৩০০ হইতে ৪০০ পাউণ্ড ফলন হয়।

চীনাবাদাম (Groundnut)

Arachis hypogaea

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে অতি অল্প জমিতে চীনাবাদামের চাষ হইত। এখন সকল তৈলবীজ ফসলের এলাকার প্রায় অর্ধেক জমিতে চীনাবাদামের চাষ হয়। চীনাবাদামের অন্তর্বীজে শতকরা ৪০ হইতে ৫০ ভাগ ভক্ষ্য তৈল থাকে। ইহার শাখা ও পাতা হইতে প্রস্তুত পশুখাদ্য (ভূষা) খুবই পুষ্টিকর। চীনা-বাদামের খইলে শতকরা ৭'৫ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে এবং ফসফোরস, পটাশিয়ম ও অন্যান্য পোষক দ্রব্যের পরিমাণও বেশী থাকে। কাজেই ইহা

একটি উৎকৃষ্ট হাঁস-মুরগী ও পশুর খাদ্য এবং সার হিসাবেও ইহার উপযোগিতা অন্যান্য খইল অপেক্ষা বেশী।

প্রধানত অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ও গুজরাটে চীনাবাদামের চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গে সামান্য এলাকায় চীনাবাদামের চাষ করা হয়।

প্রকৃতি

তৈলবীজের মধ্যে একমাত্র চীনাবাদামই হইল শিম্বিগোত্রীয় ফসল। চীনাবাদাম প্রধানত দুই শ্রেণীর: সোজা (গুচ্ছ) ও ছড়ানো প্রকৃতিবিশিষ্ট। সোজা প্রকৃতির চীনাবাদাম ১১০ দিনে পাকে, কিন্তু ছড়ানো প্রকৃতির জাতের প্রায় ১৪০ দিন লাগে (চিত্র নং ৪৪ ও ৪৫)।

পাতা যৌগিক এবং পাতার কক্ষে ফুল ধরে। গর্ভাধানের পরে ডিম্বাশয়ের দণ্ড নিচের দিকে বাড়িতে থাকে এবং মাটিতে প্রবেশ করিয়া ডিম্বাশয় শিম্ব গঠন করে (চিত্র নং ৪৬)। শিম্বে সাধারণত দুইটি বীজ থাকে। সোজা প্রকৃতির জাতে শিম্বগুলি প্রধান গাছের নিকটে একটি গুচ্ছে অবস্থান করে। কিন্তু জড়ানো প্রকৃতির জাতে শিম্বগুলি ইতস্তত ছড়ানো থাকে।

মাটি ও জলবায়ু

চীনাবাদাম প্রায় সকলপ্রকার মাটিতেই চাষ করা চলে, কিন্তু উত্তম নিকাশী দোআঁশ মাটিতে ফলন ভাল হয়। পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত বা সেচ প্রয়োগে বেলে মাটিতেও চীনাবাদামের চাষ করা যায়। যে সব মাটি শুকাইলে শক্ত হইয়া যায় তাহা চীনাবাদামের উপযোগী নয়।

প্রধানত খরিপ ঋতুতে জুন হইতে অক্টোবরে চীনাবাদামের চাষ হয়। তবে সেচ প্রয়োগে ফেব্রুয়ারী হইতে জুনেও ইহার চাষ, করা যায়। দীর্ঘকাল ধরিয়া মেঘাবৃত আবহাওয়া চীনাবাদামের প্রতিকূল। ফসল তুলিবার সময় বৃষ্টিপাত ক্ষতিকর। ঐ সময় বৃষ্টি হইলে অন্তর্বীজের উৎকর্ষ হ্রাস পায় এবং মাটি হইতে তুলিবার পূর্বেই শিম্বগুলি অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ করে। বৃদ্ধির কোন অবস্থাতেই চীনাবাদাম শীতল আবহাওয়া সহ্য করিতে পারে না।
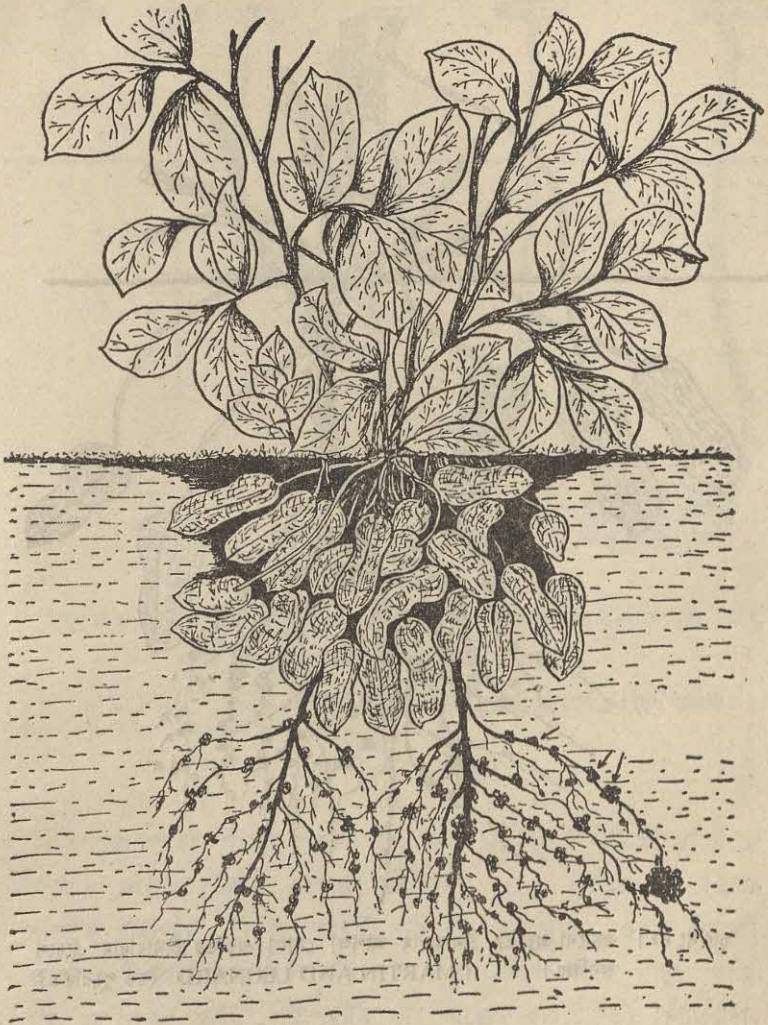
চিত্র নং ৪৪। আমাদের দেশে সচরাচর সোজা প্রকৃতির চীনাবাদামের চাষ হয়।
[MARTIN AND LEONARD হইতে পুনরঙ্কিত]

পরিচর্যা

কয়েকবার লাঙ্গল ও ছারো চালাইয়া আগাছাবিহীন ঝুরঝুরে করিয়া জমি তৈয়ারী করিতে হয়। বপনের জন্য শিম্বের আবরণ হাতে ছাড়ানো
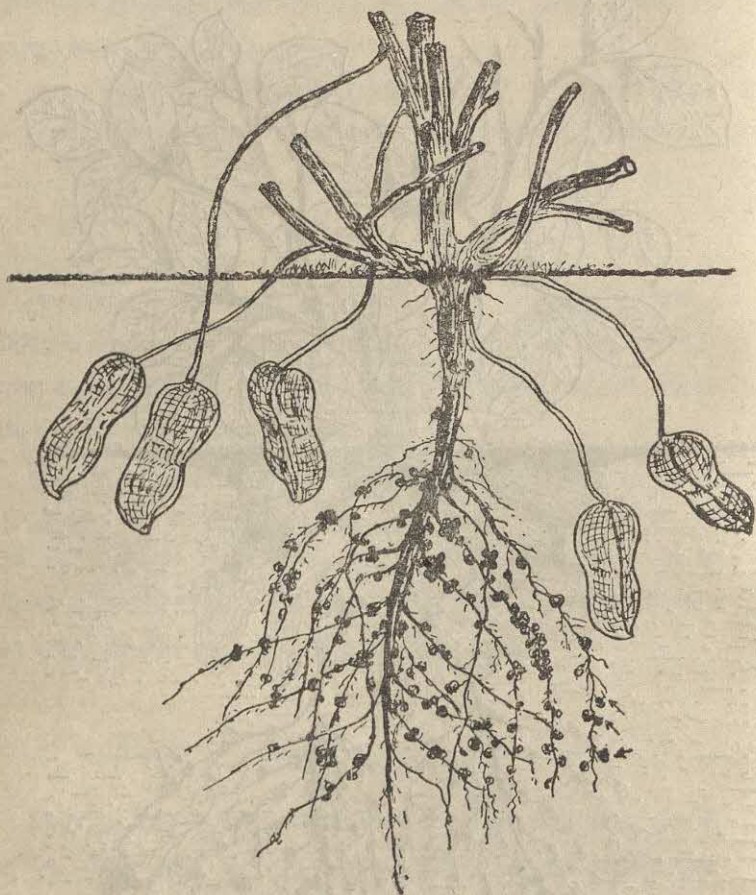
চিত্র নং ৪৫। ছড়ানো প্রকৃতির চীনাবাদাম অপেক্ষা সোজা প্রকৃতির চীনাবাদাম এদেশে জনপ্রিয়। [MARTIN AND LEONARD হইতে পুনরঙ্কিত]

হয় যাহাতে অন্তর্বীজে (বীজ) কোন আঘাত না লাগে। বর্ষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে বা লাঙ্গলের ফালিতে বা হাতে বপন করা হয়। সোজা প্রকৃতির জাত ৯ হইতে ১২ ইঞ্চি দূরে ও ছড়ানো প্রকৃতির জাত ১৫ হইতে ১৮ ইঞ্চি দূরে সারিতে বপন করা হয়। একর প্রতি সোজা প্রকৃতি জাতের ৮০ পাউণ্ড ও ছড়ানো প্রকৃতির জাতের ৫০ পাউণ্ড বীজ লাগে।
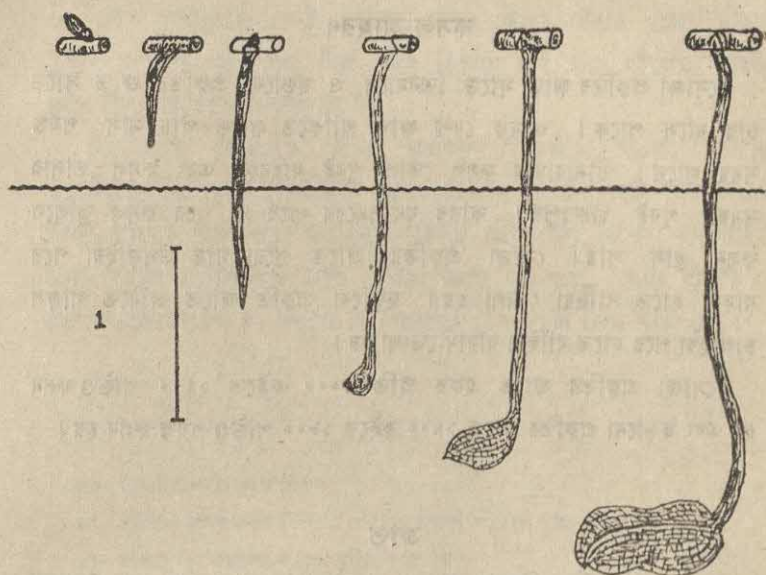
চিত্র নং ৪৬। চীনাবাদামের ফুলের গর্ভাধানের পর, ডিম্বাশয়ের দণ্ড নীচের দিকে বৃদ্ধি পাইয়া মাটির ভিতরে প্রবেশ করে এবং ফল গঠিত হয়।

[WOLFE AND KIPPES হইতে পুনরঙ্কিত]

বপনের পরেই পাখীর উপদ্রব হয় এবং মাটি হইতে বীজ তুলিয়া খাইয়া ফেলে। সেজন্য পাহারা দেওয়ার প্রয়োজন হয়। নিড়েন ও হাতের সাহায্যে আগাছা বিনাশ পরবর্তী পরিচর্যার অন্তর্ভুক্ত। সুপার ফসফেট প্রয়োগে চীনাবাদামের ফলন বৃদ্ধি পায়। যে সকল অঞ্চলে সাড়া পাওয়া যায়, সে সকল অঞ্চলে পটাশঘটিত সার প্রয়োগ করা উচিত। চীনাবাদাম শিম্বিগোত্রীয় উদ্ভিদ হইলেও বৃদ্ধির প্রথম অবস্থায় উদ্ভিদকে সাহায্য করিবার জন্য সামান্য পরিমাণে নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। কোন কোন অঞ্চলে অপ্রধান মৌল, যেমন, বোরোন, জিংক ও ম্যাঙ্গানিজ প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়। একর প্রতি ৪ হইতে ৬ পাউণ্ড বোরাক্স ও সমপরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ সালফেট প্রয়োগে ফলন সম্ভবত বৃদ্ধি পায়।

ফসল আহরণ

সোজা প্রকৃতির জাত সাড়ে তিনমাসে ও ছড়ানো প্রকৃতির জাত সাড়ে চার মাসে পাকে। অনেক দেশী জাত পাকিতে সাড়ে পাঁচ মাস পর্যন্ত সময় লাগে। চীনাবাদাম ফসল তোলা খুবই ব্যয়বহুল এবং ফসল তোলার সময়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যথাসময়ের পূর্বে বা পরে ফসল তুলিলে ফলন হ্রাস পায়। সোজা প্রকৃতির জাতে পুরো গাছ উপড়াইয়া পরে বাদাম হাতে বাছিয়া তোলা হয়। ছড়ানো প্রকৃতি জাতে জমিতে লাঙ্গল চালাইয়া পরে হাতে বাছিয়া বাদাম তোলা হয়।

সোজা প্রকৃতির জাতে একর প্রতি ১০০০ হইতে ১৫০০ পাউণ্ড ফলন হয় এবং ছড়ানো প্রকৃতির জাতে ১৪০০ হইতে ১৮০০ পাউণ্ড পর্যন্ত ফলন হয়।

জাত

দেশী জাতগুলি বিলম্বে পাকে, সহজে রোগাক্রান্ত হয় এবং ইহাদের অন্তর্বীজে তৈলের ভাগ কম থাকে। এ শতাব্দীর প্রথম দিকে বহু নূতন জাত এদেশে আমদানি করা হয় এবং তাহাদের মধ্য হইতে এদেশের উপযোগী জাতগুলি বাছিয়া লওয়া হয়।

সংক্ষিপ্তসার

তৈলবীজ জাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করিয়া বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা যায়। পর্যায়ক্রম চাষের জন্য ও মিশ্র ফসল হিসাবে ইহারা বিশেষ উপযোগী। তৈলবীজ হইতে তৈল ও খইল পাওয়া যায় এবং নানাভাবে ইহাদের ব্যবহার করা হয়। তৈলবীজ ফসলের প্রকৃতি অনেকাংশে ডালশস্যের ন্যায়। গুরুত্বপূর্ণ তৈলবীজ ফসল সমূহ হইল চীনাবাদাম তিল রেড়ি, সূর্যমুখী, তিসি, শ্বেত রাই ও সরিষা। শেষোক্ত চারিটি রবিখন্দের ফসল এবং অবশিষ্ট ফসলগুলি খরিপ খন্দে চাষ করা হয়। খরিপ খন্দের ফসলগুলির মধ্যে চীনাবাদাম দোয়াঁশ মাটিতে এবং অন্যান্যগুলি দোয়াঁশ হইতে এঁটেল মাটিতে চাষ করা যায়। রবিখন্দের ফসলসমূহ অবশ্য এঁটেল মাটিতে চাষ করা হয়, কারণ কেবল এঁটেল মাটিতেই প্রয়োজনীয় জল জমা থাকে।

সরিষা পশ্চিমবঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল, কারণ ইহার তৈল রান্নার প্রধান মাধ্যম। সাধারণত মিশ্র ফসল হিসাবে চাষ করা হইলেও প্রধান ফসল হিসাবেও ইহার এলাকা কম নয়।

চীনাবাদাম ভারতের অতি গুরুত্বপূর্ণ তৈলবীজ ফসল। বর্তমান শতাব্দীতে ইহা খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। চীনাবাদাম শিম্বগোত্রীয় উদ্ভিদ, কাজেই শস্যপর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করিবার পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। চীনাবাদামের জাতগুলিকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; সোজা প্রকৃতি ও ছড়ানো প্রকৃতিবিশিষ্ট। ফসফেট সার প্রয়োগে চীনাবাদাম উত্তম সাড়া দেয়।

প্রশ্ন

১। তৈলবীজ ফসল গুরুত্বপূর্ণ কেন?

২। সরিষা ফসলের গুরুত্ব কি? ইহার চাষ প্রণালী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩। ভারতে চীনাবাদামের এলাকা বৃদ্ধির কারণ কি?

সহায়ক পুস্তক

Aiyer, A. K. Yegna Narayan, *Field Crops of India,* Bangalore Printing and Publishing Co., Ltd., Bangalore, Mysore State, 1954

Arakeri, H. R., G. V. Chalam, P. Satyanarayana, and Roy L. Donahue, *Soil Management in India,* Asia Publishing House, Bombay, Second Edition, 1962

Narayana, G. V. and C. R. Sheshadri, *Groundunt Cultivation in India,* Farm Bulletin No. 2, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi,

Pugh, B. M. and **C. P. Dutt,** *Crop Production in India,* Allahabad Agricultural Institute, Allahabad, 1940.

Sankaran, R., *Indian Oilseed Atlas,* Indian Central Oilseeds Committee, Hyderabad, 1958

Sawhney, K., J. A. Daji and D. Raghavan, Editors, *Handbook of Agriculture,* Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, 1961.

Singh, Dharampal *Rape and Mustard,* Indian Central Oilseeds Committee, Hyderabad, 1958

United States Department of Agriculture, *Seeds : The Seed Yearbook of Agriculture,* 1961, U. S. Government Printing Office, Washington D.C.

একাদশ অধ্যায়

সবজি ফসল ও সবজি বাগান

মানুষের পক্ষে অপরিহার্য বহু ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সবজি হইতে পাওয়া যায়। আবার আমাদের খাদ্যের একটি বৃহৎ অংশ সবজি দ্বারা গঠিত। সাম্প্রতিককালে সবজি চাষ লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে; বিশেষ করিয়া বড় বড় শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে। পশুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সবজির জমির চতুর্দিকে বেড়া দেওয়া প্রয়োজন (৪৭নং চিত্র)।

সবজি শীঘ্র পচিয়া যায়। ইহা সহজে কীটশত্রু ও রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। আবহাওয়ার অতি দ্রুত পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সবজি খুবই অল্প সময়ে খাওয়ার উপযোগী হয়। এজন্য যথাসময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং ফসলের যথাসম্ভব নিকটে সার প্রয়োগ করা উচিত।

অনেকে বাসগৃহের নিকটে ছোট ছোট জমিতে সবজি ও ফলের চাষ করিয়া থাকেন। ইহাকেই সবজি বাগান (Kitchen garden) বলা হয়। অফিস, স্কুল, ক্লাব এবং মন্দিরসংলগ্ন জমিতেও সবজি বাগান করা যাইতে পারে।

উন্নত জাতের ভাল বীজ ব্যবহার সবজি চাষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বহু সবজির বীজ কাশ্মীরে এবং কিছু সবজির বীজ ভারতের বাহিরে উৎপন্ন হয়। পাঠক্রম অনুসারে কয়েকটি সবজির চাষ প্রণালী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বেগুন (Brinjal)

(*Solanum melongena*)

বেগুন খুবই পুষ্টিকর সবজি। ইহা ভিটামিন-এ ও বি-তে সমৃদ্ধ। বেগুন সাধারণত রান্না করিয়া বা ভাজিয়া খাওয়া হয় (৪৮নং চিত্র)।

আহরণ উপযোগী আনারস
(অন্ধ্র প্রদেশ)।

উন্নত জাতের পেঁপে গাছ। ইহাতে স্বল্প উচ্চতায় ফল ধরে, ফলে ফল আহরণে সুবিধা হয়। এই পেঁপে গাছটির বয়স মাত্র ১০ মাস (বীজ হইতে) [অন্ধ্র প্রদেশ]।
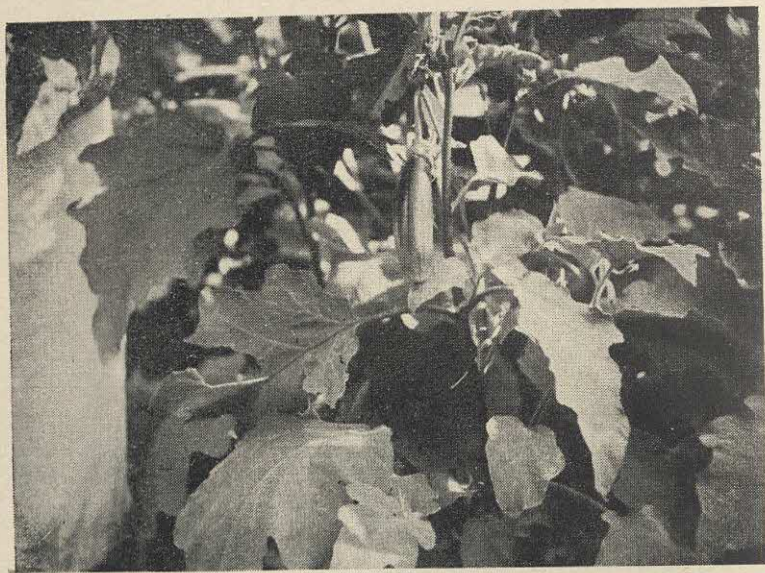
ভারতের সর্বত্র বেগুন সবজি হিসাবে জনপ্রিয় (অন্ধ্র প্রদেশ) ।

বিহারের সাবোরে কৃষি কলেজের ক্ষেত্রে একর প্রতি বাৎসরিক ফলন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পর্যায়ক্রমে আলু (সম্মুখের জমিতে) ও সরিষা (পশ্চাতের জমিতে) চাষ করা হয়।
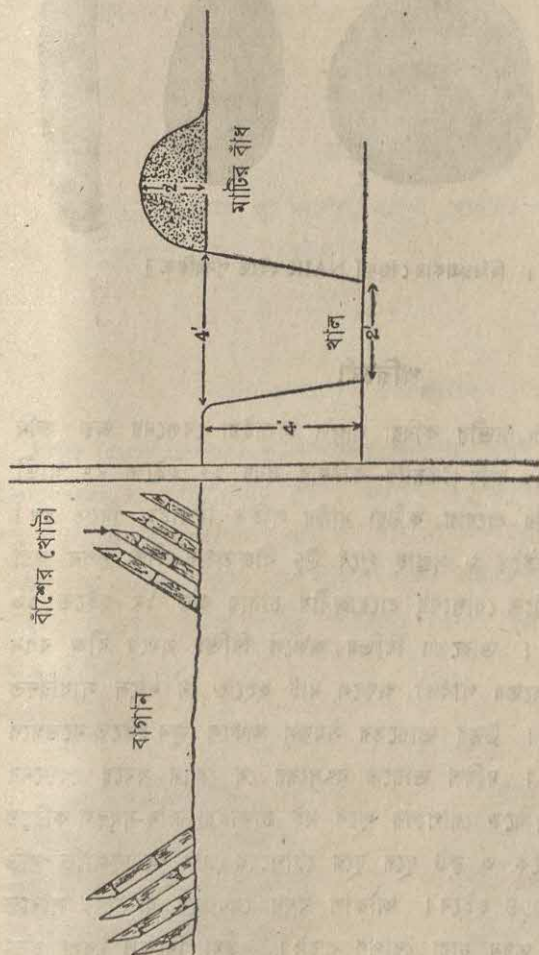
চিত্র নং ৪৭। গৃহপালিত ও বন্য পশু হইতে সবজিবাগান ও বীজতলা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা। বামে বাগানের বেড়া হিসাবে বাঁশের খোঁটার ব্যবহার। ডাইনে—বাগানের চারিদিকে খাল ও বাঁধের ব্যবহার। [SHARMA হইতে পুনরঙ্কিত]
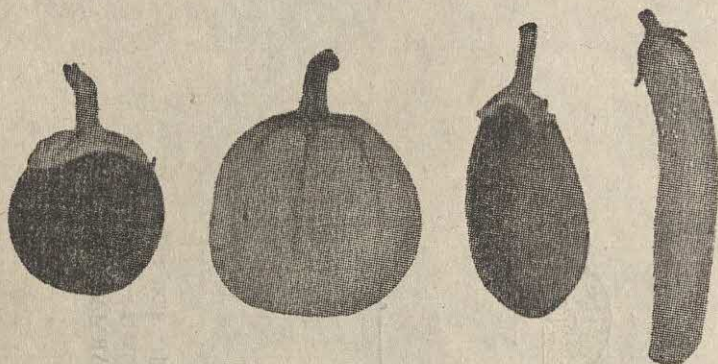
চিত্র নং ৪৮। বিভিন্নপ্রকার বেগুন [NAIK হইতে পুনরঙ্কিত]

পরিচর্যা

৭ হইতে ৮ ইঞ্চি গভীর করিয়া লাঙ্গল চালাইয়া বেগুনের জন্য জমি তৈয়ারি করিতে হয়। জমি তৈয়ারি করিবার সময় ১০ হইতে ২০ গাড়ী কম্পোষ্ট বা গোবর সার প্রয়োগ করিয়া মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। চারা রোপণের ৪ হইতে ৬ সপ্তাহ পূর্বে উঁচু বীজতলায় বীজ বপন করা হয়। এক একর জমিতে রোপণের প্রয়োজনীয় চারার জন্য ১২ হইতে ১৬ আউন্স বীজ লাগে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বীজ বপন করা হয়। উত্তর ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে মার্চ হইতে মে মাসে সাধারণত বীজ বপন করা হয়। উত্তর ভারতের সমতল অঞ্চলে জুন হইতে নভেম্বরে বীজ বপন করা হয়। দক্ষিণ ভারতে বৎসরের যে কোন সময়ে বেগুনের চাষ করা চলে। জমিতে রোপণের পূর্বে মই চালাইয়া জমি সমতল করিতে হইবে এবং উভয় দিকে ৩ ফুট দূরে দূরে রোপণের স্থান আড়াআড়ি দড়ি ফেলিয়া চিহ্নিত করিতে হইবে। আকাশ যখন মেঘাচ্ছন্ন বা যখন সামান্য বৃষ্টিপাত হইতে থাকে তখন চারা রোপণ প্রকৃষ্ট। নতুবা বিকেল বেলা চারা রোপণ করা উচিত। সেচের জন্য জমিতে ৩ ফুট দূরে দূরে নালা করিতে হয়। ভেলীর পাড়ে অর্ধেক নীচে চারা রোপণ করা উচিত। বেলে মাটিতে চারা রোপণের স্থানে রোপণের পূর্বে কম্পোষ্ট বা গোবর সার প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। নিড়েন, আগাছা বিনাশ ও চারার গোড়ায় মাটি তুলিয়া দেওয়া পরবর্তী

পরিচর্যার অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর দুইবার রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিতে হইবে এবং প্রতিবার একর প্রতি ১০০ পাউণ্ড এমোনিয়ম সালফেট প্রয়োগ করা উচিত। চারা রোপণের ১ মাস পরে একবার এবং চারার গোড়ায় মাটি তুলিয়া দেওয়ার সময় আর একবার সার প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

জাত

ব্ল্যাক বিউটি, লঙ ব্ল্যাক, লঙ পার্পল, রাউণ্ড হোয়াইট, মুক্তকেশী ও পুসা পার্পল হইল বেগুনের কয়েকটি উৎকৃষ্ট জাত।

তরমুজ ও কুমড়া ইত্যাদি

খরমুজ (muskmelon) (*Cucumis melo*), তরমুজ (watermelon) (*Colocynthis citrullus*), কুষ্মাণ্ড প্রজাতি (*Cucurbita* species) ও শশা (*Cucumis sativus*) প্রভৃতির চাষ প্রণালী মোটামুটি একপ্রকার। খরমুজ ও তরমুজ পাকা ফল হিসাবে এবং অন্যান্য সবজি রান্না করিয়া খাওয়া হয় (চিত্র নং ৪৯ ও ৫০)। লাউ দিয়া অনেক সময় মিষ্টদ্রব্য তৈয়ারি করা হয় (চিত্র নং ৫১)।
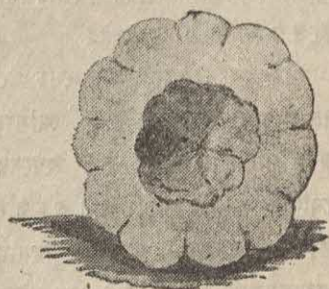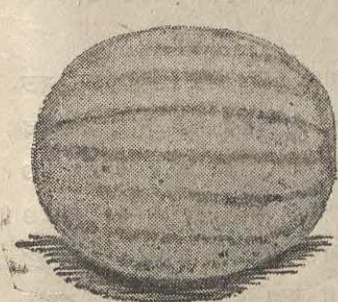
চিত্র নং ৪৯। ভারতের বহু অঞ্চলে ফল হিসাবে খরমুজ বিশেষ জনপ্রিয়। (ডাইনে প্রস্থচ্ছেদ)
[STUCKEY হইতে পুনরঙ্কিত]
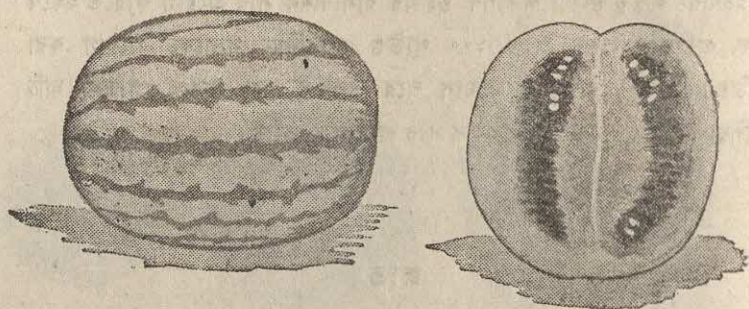
চিত্র নং ৫০। ফল হিসাবে তরমুজও বেশ জনপ্রিয় (ডাইনে দীর্ঘচ্ছেদ)

[STUCKEY হইতে পুনরঙ্কিত]

পরিচর্যা

তরমুজ ও কুমড়া ইত্যাদির জন্য ৫ হইতে ১০ ফুটের চতুষ্কোণ জমি তৈয়ারি করা হয়। এসব জমিখণ্ডের এক পাশে সেচের নালা থাকে। স্বল্প সময়ে পাকে এ প্রকার জাতের সহিত বিলম্বে পাকে এরূপ জাত মিশাইয়া বীজ বপন করা হয়।

প্রতি জমিখণ্ডে গোবর সার উত্তমরূপে মাটির সহিত মিশাইয়া প্রয়োগ করা হয়। প্রতি জমি খণ্ডে ৫ বা ততোধিক বীজ বপন করা হয়। দক্ষিণ ভারতে এপ্রিল হইতে মে মাসে এবং উত্তর ভারতে প্রায় এক মাস পরে বীজবপন করা হয়। দক্ষিণ ভারতে জানুয়ারী হইতে মার্চ এবং উত্তর ভারতে এক মাস পরে বৎসরের দ্বিতীয় ফসল বপন করা চলে। একর প্রতি ২ হইতে ৩ পাউণ্ড বীজ যথেষ্ট।

বীজ বপনের পরেই প্রথম সেচ প্রয়োগ করা উচিত। পরে প্রয়োজন মত সেচ প্রয়োগ করিতে হইবে। আগাছা নিধন ও লতার জন্য মাচা তৈয়ারি পরবর্তী পরিচর্যার অন্তর্ভুক্ত। বপনের এক মাস পরে একর প্রতি ৫০ পাউণ্ড এমোনিয়ম সালফেট এবং আর এক মাস পরে একর প্রতি আরও ৫০ পাউণ্ড এমোনিয়ম সালফেট প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। মৃত্তিকা পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে সুপারফসফেট ও মিউরেট অব পটাশ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কুষ্মাণ্ড গোত্রীয় সবজির জন্য প্রতি মাসে একবার করিয়া প্রতি জমি খণ্ডের মাটি আলগা করিয়া দিতে হয় এবং ৩-৪ ঝুড়ি গোবর সার প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

চিত্র নং ৫১। ভারতের উষ্ণ অঞ্চলে লাউ একটি প্রধান সবজি [MEHTA হইতে পুনরঙ্কিত]

জাত

এ সকল সবজির বহু জাত প্রচলিত আছে। কোন এলাকায় কোন জাত উপযোগী হইবে তাহা জানিবার জন্য স্থানীয় কৃষি কর্মচারীর পরামর্শ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কপি
Cabbage (Cole) Crops

কপি বলিতে আমরা বাঁধাকপি (Cabbage) (*Brassica oleracea*), ফুলকপি (cauliflower) (B*rassica botrytis*) ও ওলকপি (Knolkhol) (*Brassica caulocarpa*) এ তিন প্রকার কপি বুঝি। বাঁধাকপির কোমল পাতা, ফুলকপির পুষ্পমুকুল ও ওলকপির ফোলা কাণ্ড আমরা খাই (চিত্র নং ৫২ ও ৫৩)।
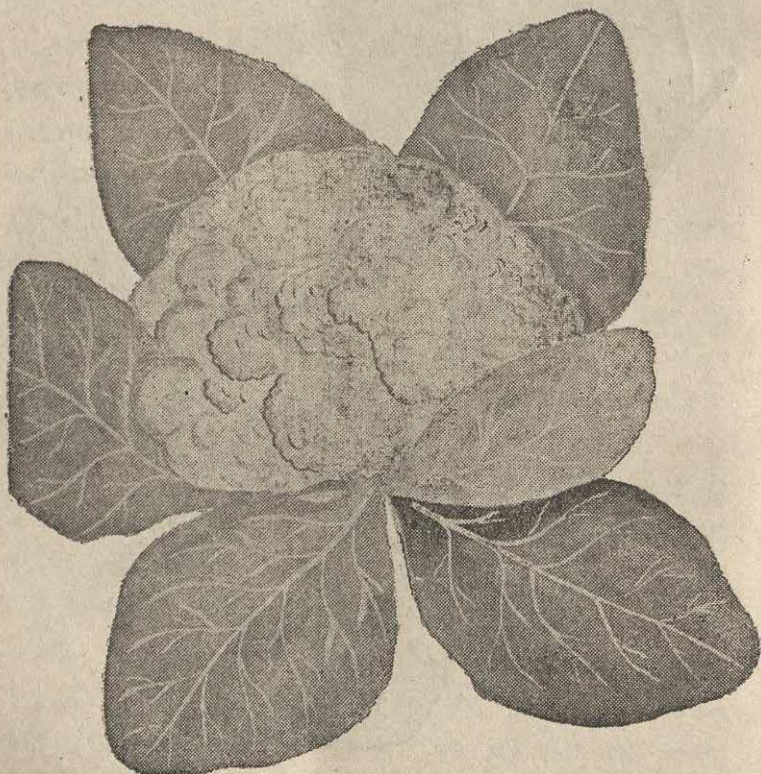
চিত্র নং ৫২। মধ্য ও উত্তর ভারতে ফুলকপি একটি প্রধান সবজি। ইহার সাদা ফুল অংশ খাওয়া হয়। [MEHTA হইতে পুনরঙ্কিত]।
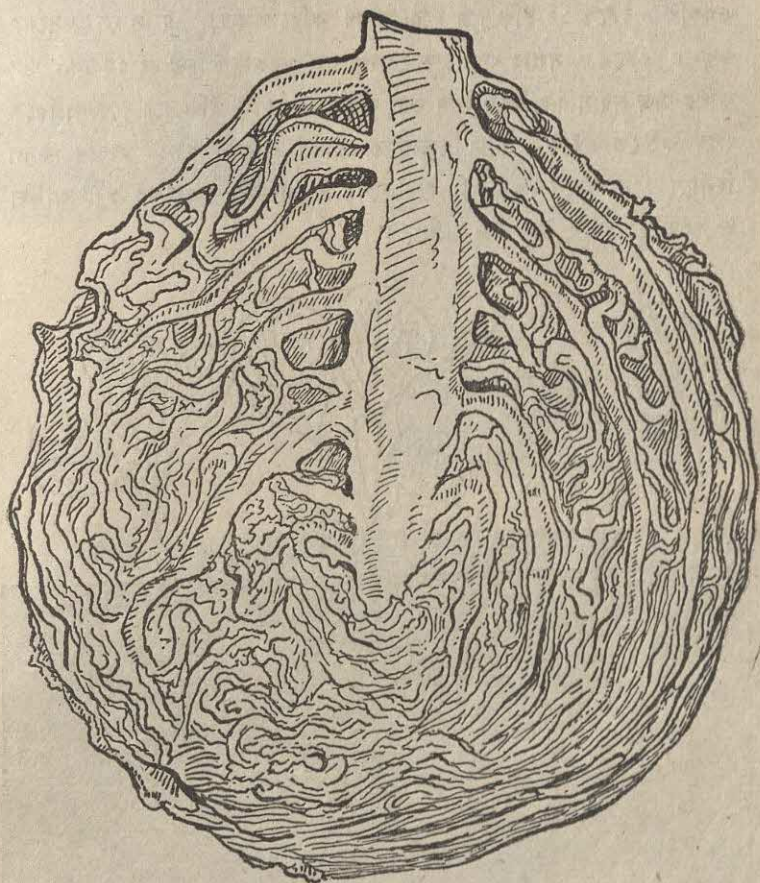
চিত্র নং ৫৩। বাঁধাকপির দীর্ঘচ্ছেদ। ইহা রবি মরসুমের পত্রবহুল জনপ্রিয় সবজি।
[MEHTA হইতে পুনরঙ্কিত]।

পরিচর্যা

গভীরভাবে লাঙ্গল চালাইয়া এবং বারংবার হ্যারো চালাইয়া জমি তৈয়ারি করিতে হয়।

এ সকল সবজি সাধারণত মিশ্রফসল রূপে চাষ করা হয়। বাঁধাকপি ও ফুল কপি প্রধান ফসলরূপে এবং ওলকপি, মূলা ও বীট মিশ্র ফসলরূপে চাষ করা হয়। ফুলকপি ও বাঁধাকপি উভয় দিকে ১৮ হইতে ২৪ ইঞ্চি দূরে দূরে এবং

ওলকপি ৯ হইতে ১২ ইঞ্চি দূরে দূরে রোপণ করিতে হয়। এ সকল ফসলের জন্য ৫ হইতে ৬ সপ্তাহ বয়স্ক চারা রোপণ করা দরকার (চিত্র নং ৫৪)। ওল কপির বীজ সরাসরি জমিতে বপন করা যায়। তবে ১২ ইঞ্চি দূরে দূরে সারিতে বপন করিতে হইবে। চারা ভেলীতে রোপণ করিতে হয়। প্রধান ফসল হিসাবে চাষ করিলে একর প্রতি বাঁধাকপির ১৬ আউন্স, ফুলকপির ১০ আউন্স ও ওলকপির ১৬ আউন্স বীজ লাগিবে।
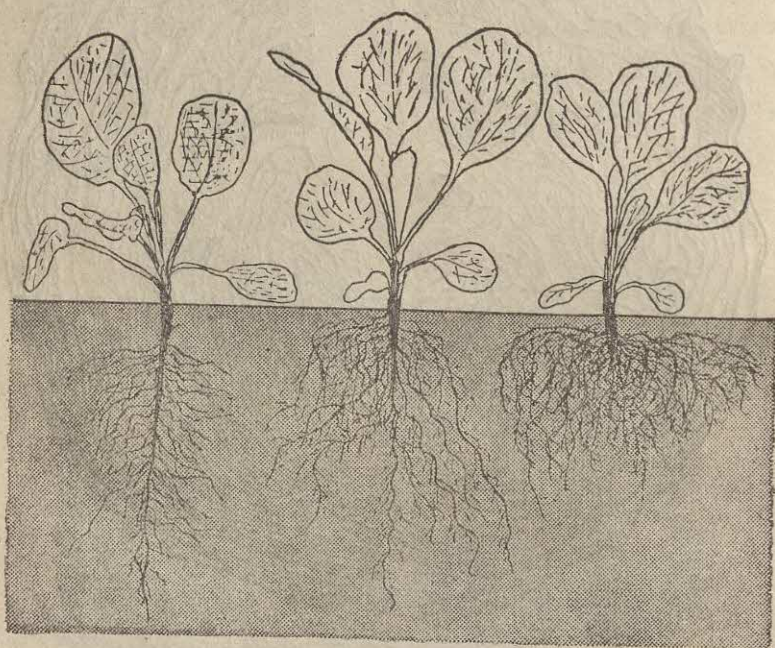
চিত্র নং ৫৪। রোপণ করিলে বাঁধাকপির মূল আরও নিবিড় হয়। বামে : রোপণ করা হয় নাই ; মধ্যে : একবার রোপণ ; ডাইনে : দুইবার রোপণ। [WEAVER হইতে পুনরঙ্কিত]।

জাত

সকল জাতই প্রথমে ভারতের বাহির হইতে আমদানি করা হয়। উত্তর ভারতের কয়েকটি রাজ্যে জাতগুলিকে আরও উন্নত করা হইয়াছে। বাঁধাকপির গোল্ডেন একর, ড্রামহেড ও ড্যানিস বল, ফুলকপির আর্লি স্নোবল, স্নোবল ও আর্লি পাটনা এবং ওলকপির আর্লি হোয়াইট ও হোয়াইট ভিয়েনা জাতগুলি সাধারণত সুপারিশ করা হয়।

উপরে বামে : নারিকেলের দেশ কেরালা। গাছ প্রতি বাৎসরিক গড় ফলন ৩০ হইতে ৬০টি নারিকেল, কিন্তু উত্তম তদারকিতে গাছ প্রতি শতাধিক নারিকেলও পাওয়া গিয়াছে। উপরে ডাইনে : নারিকেলের ছোবড়ার তন্তু হইতে দড়ি প্রস্তুত হয়। নীচে : তৈল প্রস্তুত করিবার জন্য নারিকেলের শাঁস শুকানো হইতেছে।

কমলালেবু ভারতের একটি উত্তম অর্থকরী ফসল (Encyclopaedia Britannica Films, Inc. এর সৌজন্যে)।

তৃষ্ণা নিবারণ, ক্ষুধা নিবৃত্তি এবং আরও বহু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নারিকেল অপরিহার্যভাবে ব্যবহৃত হয় (মহীশূর রাজ্য)।

সবজি বাগান

সবজি বাগানের সুবিধা হইল :

(১) ইহা খাদ্য সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে ;

(২) সবজি বাজার হইতে ক্রয় করা অপেক্ষা নিজের বাগানে সবজি করিতে খরচ কম পড়ে ;

(৩) তাজা সবজি পাওয়া যায় যাহা বাজারে দুর্লভ ;

(৪) ইহা পরিবারের সকলের উপযোগী শখ বলা যাইতে পারে এবং মুক্ত বায়ুতে ব্যায়ামের সুযোগ দেয়।

পরিকল্পনা

সবজি বাগান বলিতে বর্ষার প্রথমে কেবল কয়েকটি সবজি বীজ বপন করাকেই কেহ কেহ বুঝেন। এ প্রকার বাগান হইতে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায় না। অনেকদিন ধরিয়া লাভজনকভাবে ফলন পাইতে হইলে পূর্ব পরিকল্পনা আবশ্যক। বাগানের যথাযথ নকশা তৈয়ারি, বিভিন্ন সবজির জন্য জায়গা নির্বাচন, এবং চারা তৈয়ারি, উৎকৃষ্ট বীজ কোথায় পাওয়া যায়, কখন চারা রোপণ করা হইবে প্রভৃতি সম্পর্কে যথাযথ বিচার বিবেচনা পূর্ব পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

এমনভাবে নকশা তৈয়ারি করিতে হইবে, যাহাতে বাগানের সকল জায়গার সদ্ব্যবহার হয় এবং নকশাটি আকর্ষণীয় হয়। সবজি বাগান বৃহৎ বৃক্ষের অতি নিকটে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। বাগানে নীচু অংশ থাকিলে তাহা মাটি দ্বারা ভর্তি করিতে হইবে এবং জল জমিবার সম্ভাবনা থাকিলে জলনিকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আবার জলসেচনেরও সুবন্দোবস্ত রাখিতে হইবে। বাড়ীর সকল আবর্জনা, পাতা প্রভৃতি পচাইবার জন্য একটি ছোট গর্ত খনন করিতে হইবে।

লতানো সবজি ও গাছ যেমন লেবু বাগানের পশ্চিমদিকে বপন করিতে হইবে। পেপে যে কোন স্থানে বপন করা চলে। বাগানের অবশিষ্ট অংশ তিন বা চার অংশে ভাগ করিতে হইবে যাহাতে শস্য পর্যায় অনুসরণ করা যায়।

বাগানের বিভিন্ন অংশে নিম্নলিখিত সবজিগুলির চাষ করা যায় :

১ নং প্লট—খরিপ : মূলজাতীয় ফসল ও আদা। রবি : বেগুন, টোম্যাটো। (চিত্র নং ৫৫) জলদি খরিপ : ঢেঁড়স।

চিত্র নং ৫৫। বেগুন সবজি বাগানের একটি আদর্শ সবজি। [MEHTA : হইতে পুনরঙ্কিত]

২ নং প্লট—খরিপ : নাবি পত্রবহুল সবজি, যেমন লেটুস। রবি : বেগুন ও কপি।

৩ নং প্লট—খরিপ : টোম্যাটো, কাঁচা লঙ্কা, পত্রবহুল সবজি (চিত্র নং ৫৬)।
রবি : পিয়াঁজ ও রশুন।

৪নং প্লট—খরিপ : ঢেঁড়স ও ফ্রেন্স বীন। রবি : পত্রবহুল সবজি যেমন পালং ও ব্রুসেলস স্প্রাউট (Brussels sprout) (৫৭ নং চিত্র)।

বাগানের উপযোগী শস্যসূচী তৈয়ারী করিবার পর বিভিন্ন সবজি বপনের একটি সময়সূচী তৈয়ারি করিতে হইবে।
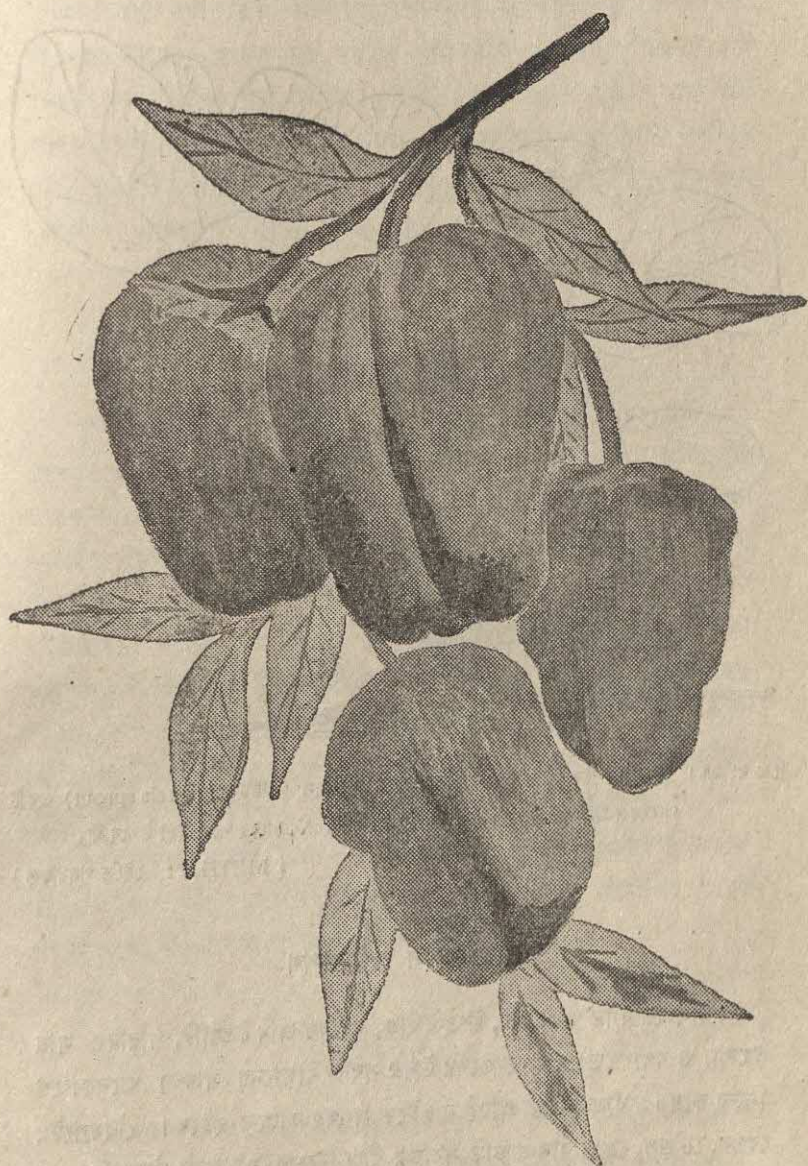
[MEHTA : হইতে পুনরঙ্কিত

চিত্র নং ৫৬। সবজি হিসাবে মিষ্টি লঙ্কাও এদেশে জনপ্রিয়।

চিত্র নং ৫৭। ভারতের শীতপ্রধান অঞ্চলে রবি মরসুমে ব্রুসেলস স্প্রাউট (Brussels sprout) একটি পত্রবহুল জনপ্রিয় সবজি। শীতকালে সবজি বাগানে চাষের পক্ষে ইহা উপযোগী।

[METHA : হইতে পুনরঙ্কিত]

বীজ বপন ও রোপণ

যথাসময়ে বপন ও রোপণ, উৎকৃষ্ট বীজ, যথাযথ জমি তৈয়ারি, পরিমিত সার প্রয়োগ ও যথাযথভাবে জলসেচনের উপর সবজি বাগানের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। বীজ বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। টোম্যাটো, বেগুন, ঢেঁড়স, ফ্রেঞ্চ বীন প্রভৃতি সবজির বীজ নিজের বাগানেই তৈয়ারি করা যায়। এজন্য উৎকৃষ্ট ফলগুলিকে পাকিলে তাহা হইতে বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে। অন্যান্য সবজি যেমন, কপি, কন্দ ও মূলজাতীয় সবজির বীজ বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান হইতে সংগ্রহ করাই বাঞ্ছনীয়।

বাগানে সরাসরি বীজ বপন করিয়া বা অন্যত্র তৈয়ারি চারা রোপণ করিয়া সবজি তৈয়ারি করা যায়। অতি ক্ষুদ্র বীজ ছাই বা বালির সহিত মিশাইয়া ছড়াইতে হইবে। অনেক সময় সবজির বাগানেরই একাংশে বীজতলা চারা তৈয়ারি করিয়া রোপণ করা বাঞ্ছনীয়। বাক্স, টব বা ঝুড়ি মাটি ও সার ভর্তি করিয়া সবজি উৎপাদন করা যায়। চারা রোপণ করিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে চারা সোজা রোপণ করা হয়, মূল যেন পার্শ্বে বা উপরের দিকে হেলিয়া না থাকে।

সার প্রয়োগ

অধিকাংশ সবজি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এজন্য প্রচুর মাত্রা রাসায়নিক ও জৈব সার প্রয়োগ করা দরকার। রাসায়নিক সার অল্প মাত্রায় এবং অল্প কয়েকদিন অন্তর অন্তর প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। কোন কোন ফসল যেমন পত্রবহুল সবজিতে নাইট্রোজেন ঘটিত সার জলের সঙ্গে মিশাইয়া প্রয়োগ করা উচিত। জল ছড়াইবার ঝারিতে জলের সহিত এমোনিয়ম সালফেট বা ইউরিয়া গুলিয়া প্রয়োগ করা চলে। অবশ্য সার মিশ্রিত জল ছড়াইবার অব্যবহিত পরেই জল ছিটাইতে হইবে যাহাতে সবজির পাতা সারপ্রয়োগ হেতু পুড়িয়া না যায়। মাটিতে সার প্রয়োগ করিতে হইলে তাহা হাতে করাই বাঞ্ছনীয়। সবজি কাণ্ডে অতি নিকটে যাহাতে সার না পড়ে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অনেক সবজিবাগানে এই ভুল করা হয় এবং ফলে সবজিপাতা পুড়িয়া যায়। রাসায়নিক সার সবজি কাণ্ড হইতে ২ ইঞ্চি দূরে ও ২ ইঞ্চি মাটির নীচে প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। সার প্রয়োগের পরেই বাগানে যথেষ্ট পরিমাণে জলসেচন করা দরকার।

পরবর্তী পরিচর্যা

প্রতিদিন সবজিবাগানে একবার যাওয়া দরকার। এবং প্রতিটি গাছের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আগাছা অপসারণ এবং মাটি আলগা করিয়া দেওয়া সবজিবাগানের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিচর্যা। মাটির আর্দ্রতা যখন উপযুক্ত

অবস্থায় থাকে তখনই মাটি আলগা করিয়া দেওয়া উচিত। মাটি যখন অতি আর্দ্র বা অতি শুষ্ক অবস্থায় থাকে তখন মাটি আলগা করা উচিত নয়। সেচ প্রয়োগের তিন-চারদিন পরই হইল মাটি আলগা করিবার প্রকৃষ্ট সময়। গাছের গোড়ায় মাটি তুলিয়া দিবার প্রয়োজন হইলে তাহা যথাসময়ে করিতে হইবে। কোন সবজিকে খাড়া রাখিবার জন্য বা লতাইবার জন্য কাঠি বা মাচা তৈয়ারি করিয়া দিতে হইবে। কীটশত্রু ও রোগ দমন পরবর্তী পরিচর্যার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। কীটশত্রু দমনের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হইল কীট দেখা মাত্রই তাহা হাতে বাছিয়া ফেলা। অবশ্য অনেক কীটশত্রু হাতে ধরা যায় না। ইহাদের দমন করিবার জন্য কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। রোগ ও কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, কারণ অধিকাংশ ঔষধ প্রাণী ও মানুষের পক্ষে বিষাক্ত।

সংক্ষিপ্তসার

সবজি মানুষের দেহরক্ষাকারী খাদ্য। ইহারা ভিটামিন ও খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ। ভারতে সবজি খাওয়ার পরিমাণ খুবই কম। দেশের কোন কোন অঞ্চলে সবজি উৎপাদন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গ্রহণ করা হইয়াছে। বিভিন্ন সবজির স্থানীয় জাত ছাড়া বিদেশ হইতে আমদানি করা অনেকগুলি জাতও চাষ করা হয়। বাজারের নিকটবর্তী অঞ্চলে সাধারণত সহজে পচনশীল সবজির চাষ করা হয়। কোন কোন সবজি বৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া চাষ করা হয়, তবে অধিকাংশ সবজিতে সেচ প্রয়োগ আবশ্যক। সবজি সাধারণত নিবিড়ভাবে চাষ করা হয়। গোবর সার বা কম্পোষ্ট এবং রাসায়নিক সার সবজিতে প্রচুর পরিমাণে প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয়। গভীর কর্ষণ ও ঘন ঘন নিড়েন দিলে সবজির ফলন বৃদ্ধি পায়। কোন কোন ফসলের গোড়ায় মাটি তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক। সবজিবীজ উৎপাদন ও বণ্টনের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকায় নির্ভরযোগ্য বীজ সংগ্রহ করা একটি সমস্যা।

মূল ও কাণ্ডপ্রধান ফসলে প্রচুর ফলন হয়। ভারতে সবজির উপর গবেষণা সীমাবদ্ধ। সবজিবাগান সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্যও দেওয়া হইল।

প্রশ্ন

১। সবজি খাওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা কি ?

২। সবজি চাষের মুখ্য সমস্যাগুলি কি কি ?

৩। তোমার এলাকার একটি প্রধান সবজির চাষপ্রণালী যাহা জান লেখ।

৪। মূলপ্রধান সবজি কি কি ?

৫। সবজিবাগানের নক্সা তৈয়ারি করিবার সময় কোন্ কোন্ বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে ?

সহায়ক পুস্তক

Ochse, J. J., M. J. Soule, Jr,, M. J. Dijkman and C. Wehlburge, '*Tropical and Subtropical Agriculture*,' Volumes I and II, The Macmillan Co., New York, 1961

Sawhney, K. J. A. Daji and D. Raghavan, Editor, *Handbook of Agriculture*, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, 1961.

Shoemaker, J. S. *Vegetable Crops Growing*, John Wiley and Sons, Inc ; New York, 1953.

Tempany, Harold and D. H. Grist, *An Introduction to Tropical Agriculture*, Longmans, Green & Co., New York, 1958

Thapar, A. R., *Horticulture in the Hill Région of North India*, Directorate of Extension, Ministry of Food and Agriculture, New Delhi, 1960

Thomson, H. C., *Vegetable Crops*, McGraw Hil Book Co,, Inc., New York, 1949

United States Department of Agriculture, *Seeds : The Yearbook of Agriculture*, 1961, U. S. Government Printing Office, Washington, D. C.

দ্বাদশ অধ্যায়

গো-মহিষাদির তদারক

(Cattle Management)

গো-মহিষাদির প্রজনন

অতি দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে গরু ও মহিষের সংখ্যা প্রচুর হওয়া সত্ত্বেও তাহারা দুধও বেশী দেয় না, আবার ভারী লাঙ্গলও টানিতে পারে না। উৎকৃষ্ট বৎস উৎপাদন দৈবাৎ ঘটে, কারণ উৎকৃষ্ট ষাঁড়কে সাধারণত বলদ করিয়া দেওয়া হয় এবং ভার বহনের কাজের জন্য বিক্রয় করা হয়। প্রজননের জন্য নিকৃষ্ট ষাঁড়গুলি পড়িয়া থাকে।

ভারতের প্রয়োজন উৎকৃষ্ট গাভী যাহারা প্রচুর দুধ দেয় এবং নিয়মিত বৎস উৎপাদন করে। এঁড়ে বাছুর বয়প্রাপ্ত হইয়া যেন আশানুরূপ ভার বহন করিতে পারে এবং বকনা বাছুর বড় হইয়া তাহাদের মাদের সমান দুধ দিতে পারে। আদিকালে প্রাকৃতিক নিয়মে গাভী বৎসরে একটি বৎস প্রসব করিত এবং ঐ বাছুরের প্রয়োজনীয় পরিমাণ দুধ দিত। গাভী এখনও বৎসরে একটি বৎস প্রসব করে, কিন্তু মানুষ নির্বাচিত প্রজননবিদ্যা এবং উন্নত খাদ্য ও পরিচর্যা প্রয়োগ করিয়া একটি গাভী হইতে বিশ পঁচিশটি বৎসর প্রয়োজনীয় দুধ দোহন করে। বর্তমানে দুগ্ধ মানুষের পুষ্টিসাধনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে কোন কোন জাতকে প্রচুর মাংস উৎপাদনকারী এবং কোন কোন জাতকে প্রচুর দুগ্ধ উৎপাদনকারী জাতরূপে উন্নত করা হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে বর্তমানে পৃথিবীতে বৎসরে যে পরিমাণ দুগ্ধ উৎপন্ন হয় তাহা

ভারতের ৩৪ কোটি গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল ও ঘোড়ার পশুখাদ্য সচরাচর কাস্তে দ্বারা কাটা হয় (পার্শ্বে) এবং মাথায় করিয়া বহন করা হয় (নীচে) [অন্ধ্র প্রদেশ]।

ট্যাপিওকা কাষ্ঠল উদ্ভিদের স্ফীত মূল বিশেষ। ফটোতে ট্যাপিওকা গাছের সঙ্গে কেরালা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক ডঃ এ. আব্রাহাম মহাশয়কে দেখা যাইতেছে। ইনি ট্যাপিওকার বহু নূতন জাত উদ্ভাবন করিয়াছেন। কেরালায় চাউলের পরিবর্তে ট্যাপিওকা খাওয়া হয়।

সেচ প্রয়োগে এবং পর্যাপ্ত সার প্রয়োগে চাষ করিতে পারিলে ন্যাপিয়ার ঘাসে প্রচুর ফলন হয় (অন্ধ্র প্রদেশের অরাকু উপত্যকা)।

২২ পাউণ্ড বোতলে ভরিয়া একটির মাথার সহিত অপরটি তলা লাগাইয়া সারিতে সাজাইলে, ঐ সারি বা লাইন পৃথিবীকে ৪০০ বার বেষ্টন করিবে।

যথাযথ প্রজনন, যথাযথ পুষ্টিসাধন, অকর্মণ্য পশুর যথাযথ অপসারণ ও যথাযথ পরিচর্যা দ্বারা আমাদের পশুসমূহের উন্নয়ন সম্ভব এবং ইহাদের পালন লাভজনক করিয়া তোলা যায়। যথাযথ প্রজনন বলিতে বৎসে যে সকল গুণাগুণ ও উৎকর্ষ থাকা দরকার সে সকল গুণাগুণসম্পন্ন ও সেরূপ উৎকৃষ্ট গাভীর সহিত উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের মিলন ঘটানো বুঝায়। যথাযথ পুষ্টিসাধন বলিতে পশুর দেহরক্ষা ও তাহাকে উৎপাদনক্ষম রাখিবার উপযোগী সুষম খাদ্যপ্রদান বুঝায়। অকর্মণ্য পশুর যথাযথ অপসারণ বলিতে যে সকল পশুপালন লাভজনক নয় তাহাদের হত্যা করা বা তাহারা যাহাতে আবার নিকৃষ্ট বৎস উৎপাদন করিতে না পারে সেজন্য বলদ করা বুঝায়। ইহা প্রজননের অঙ্গবিশেষ। যথাযথ পরিচর্যা বলিতে পশুর যথাযথ পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা তথা যথাযথ বাস-গৃহ, যত্ন ও স্বাস্থ্যপ্রদ ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা বুঝায়। পশু হইতে সর্বোচ্চ উৎপাদন পাইতে হইলে উপরোক্ত চারিটি বিধান একসঙ্গে অনুসরণ করিতে হইবে।

প্রজনন একাধারে শিল্প ও বিজ্ঞান বিশেষ। ইহার কয়েকটি সাধারণ নিয়ম আছে। গোপ্রজননে সাফল্য অর্জন করিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মনে রাখা প্রয়োজন ঃ

(১) স্থানীয় আবহাওয়া ও উৎপন্ন পশুখাদ্য, মাটির প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া, ঐ সকল অবস্থায় যে সকল জাত উপযোগী তাহাদের ভিতর হইতে সযত্নে সর্বোৎকৃষ্ট জাতটি নির্বাচন করিতে হইবে ;

(২) প্রজনন আরম্ভ করিবার পূর্বে নির্বাচিত জাতটির আকৃতি, বর্ণ, অভ্যাস, স্বাস্থ্য ও উৎকর্ষ সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট মাপকাঠি স্থির করিতে হইবে। দুগ্ধ উৎপাদন ও ভারবহন ক্ষমতা—এ দুইটি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মাপকাঠি স্থির করিতে হইবে ;

(৩) মাপকাঠি অনুসারে কেবল আদর্শ পশুকেই প্রজননের জন্য নিয়োগ করিতে হইবে এবং আদর্শ হইতে নিম্নমানের পশুকে পরিত্যাগ করিতে হইবে ;

(৪) যে সকল পশুর পূর্ব ইতিহাস, পিতামাতার বিবরণ এবং দুগ্ধ

প্রদান বা ভার বহন ক্ষমতা অজ্ঞাত সেগুলিকে প্রজননের জন্য নিয়োগ করা উচিত নয় ;

(৫) পিতামাতায় যাহা অপূর্ণ আছে তাহা বংশধরে যাহাতে পূরণ হয়, সেভাবে পশুর মিলন ঘটানো উচিত ;

(৬) কোন দুর্বল বৈশিষ্ট্যযুক্ত পশু দ্বারা প্রজনন অপরিহার্য হয় তবে ঐ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পশুর সহিত মিলন ঘটানো উচিত ;

(৭) ষাঁড়ের আকার, শক্তি ও স্বাস্থ্য এবং গাভীর কমনীয় ও মাতৃ-বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(৮) বৃদ্ধ, দুর্বল এবং বিকলাঙ্গ পশুর সাহায্যে প্রজনন কখনও করা উচিত নয়। ইহাদিগকে নির্দ্বিধায় হত্যা করিতে হইবে। তাহা হইলে পশুর সংখ্যাও হ্রাস পাইবে এবং সুস্থ, সবল ও উৎকৃষ্ট পশুপালন লাভজনক, আনন্দদায়ক ও গর্বের বস্তু হইয়া উঠিবে ;

(৯) পশুর পূর্বপুরুষের ইতিহাস, বংশধর, আকৃতি ও উৎপাদন প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া সতর্কতার সহিত প্রজননের জন্য পশু বাছিয়া লইতে হইবে।

(১০) বংশধরে যে বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকা দরকার, প্রজননের জন্য নির্বাচিত পশুর ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা একান্ত আবশ্যক ;

(১১) নিকট-সম্পর্কীয় পশুদের মধ্যে যেমন, পিতার সহিত কন্যার, পুত্রের সহিত মায়ের, বা ভ্রাতার সহিত ভগ্নীর মিলন (inbreeding) বাঞ্ছনীয় নয়। ঐ সকল ক্ষেত্রে বংশধরদের প্রজনন ক্ষমতা, আকার, শৌর্য ও দৈহিক শক্তি হ্রাস পায়। একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত কিন্তু নিকট-সম্পর্কীয় নয়, এরূপ দুইটি বিভিন্ন পশুর মধ্যে মিলন (linebreeding) অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট পন্থা ;

(১২) প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পূর্বেই যাহাতে গর্ভ সৃষ্টি না হয় বা আকস্মিক প্রজনন না ঘটে সেহেতু অপ্রাপ্তবয়স্ক বকনা ও এঁড়ে বাছুরকে পৃথক রাখিতে হইবে বা প্রজননের অনুপযোগী এঁড়ে বাছুরগুলিকে বলদ করিয়া দিয়া প্রজননের উপযোগী পশুগুলিকে আলাদা রাখিতে হইবে।

(১৩) পশুর খাদ্য ও পানীয় জল, বাসগৃহ, পরিচর্যার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। গোশালা, গোচারণভূমি ও ব্যায়ামের স্থানে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির প্রতি সবিশেষ নজর দিতে হইবে ;

(১৪) গো-প্রজননবিদের ধৈর্য, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তি এবং গো-পালন সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞান-এ গুণগুলি থাকা একান্ত আবশ্যক।

(১৫) গো-প্রজননবিদের অবশ্যই সকল পশুর উৎপাদন, তাহাদের বংশ-বিবরণ বা কুলজী এবং তাহাদের বংশধরদের সম্পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা উচিত।

ষাঁড় সাধারণত তিন বৎসর বয়সে প্রজননের উপযোগী হয় এবং আট হইতে দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রজনন করিতে পারে। সচরাচর ৫০টি গাভীর জন্য একটি ষাঁড়ই যথেষ্ট। ২১ মাস বয়স হইলে বকনা বাছুর ষাঁড়ের সহিত সংসর্গ করিবার উপযোগী হয়, অবশ্য উত্তমরূপে সুষম খাদ্য সরবরাহ করিতে পারিলে ১৮ মাস বয়স্ক বকনা বাছুরেরও গর্ভ সঞ্চার করা যায়। গাভী সাধারণত গড়ে ২৮৩ দিন অন্তঃস্বত্বা থাকে ; মহিষের গাভী ৩১৫ হইতে ৩৩২ পর্যন্ত অন্তঃস্বত্বা থাকিতে পারে।

গো-মহিষাদির খাদ্য ও খাদ্য প্রদান প্রণালী

গো-মহিষ তৃণজীবী পশু। মানুষ যে সকল উদ্ভিজ্জ খাদ্য খায় না, তাহা খাইয়াই ইহারা বাঁচে। ইহাদের শরীরকে রসায়নাগার বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, কারণ ঐ শরীরের ভিতরে খাদ্য অবিরাম দুগ্ধ, মাংস ও কাজ করিবার শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে থাকে। গো-মহিষ হইতে সর্বোচ্চ উৎপাদন পাইতে হইলে উহাদিগকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে খাদ্য প্রদান করিতে হইবে। গাভী সম্পর্কে 'দুধ মুখ দিয়া প্রবেশ করে'—এ পুরাতন প্রবচনের মধ্যে সত্য লুকাইয়া আছে। আমরা যদি আমাদের গাভী হইতে প্রচুর দুধ আশা করি তবে সেই দুধের উপাদানসমূহ পশুর খাদ্যের মাধ্যমে তাহার শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইতে হইবে। ভারবহন কাজের জন্য বলদ এবং প্রজননের জন্য ষাঁড় ও গাভীর বেলায়ও ঐ একই কথা খাটে।

পশুপালন হেতু খরচের একটি প্রধান অংশ হইল পশুখাদ্যের জন্য খরচ। সুষম খাদ্য পশুকে দিতে হইলে খরচ হইবেই। অনেক কৃষক খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস করিয়া ব্যয় হ্রাস করেন। কিন্তু ইহাতে লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না, বরঞ্চ হ্রাস পায়। কম খাওয়াইলে দেহের বৃদ্ধি অনুসারে, পরিমাণমত খাওয়ানো

অপেক্ষা অবশ্যই খরচ বেশী হয়। দুগ্ধ উৎপাদন বা কাজ অনুসারে শক্তি কম গ্রহণ করিলে দেহের ওজন ও দুগ্ধ উৎপাদন হ্রাস পায়। অবশ্য যদিও পশুকে পরিমিত পরিমাণে খাওয়ানো উচিত, তবে অতিভোজনও কখনও উচিত নয়। স্বল্পভোজনের ন্যায় অতিভোজনও লোকসানজনক। অতিভোজন দুই কারণে উচিত নয়ঃ (ক) ইহাতে খাদ্যের অপচয় ঘটে এবং (খ) পশুর স্বাস্থ্যহানিও ঘটিতে পারে।

অবশ্য পরিমিত পরিমাণে যথাযোগ্য খাদ্য পশুর সম্মুখে রাখিয়া দিলেই পশুকে লাভজনক ও সফলভাবে খাওয়ানো হয় না। পশুকে খাওয়ানোর ব্যাপারে এমন কতকগুলি প্রাথমিক নিয়ম মানিতে হইবে, যাহার সহিত আসল খাওয়ানোর সম্পর্ক খুবই কম বা সম্পর্ক একেবারে নাই বলিলেই চলে। প্রথমতঃ, প্রদত্ত খাদ্য খাইয়া পশু তাহাকে মানুষের প্রয়োজনীয় উৎপাদন বা কাজে পরিবর্তিত করিতে পারে কিনা তাহা জানা অপরিহার্য। দ্বিতীয়তঃ, গো-পালককে গো-পালন শিল্পে খুবই অভিজ্ঞ হইতে হইবে। যাহাতে সকল সময় পশুদের স্বাস্থ্য বজায় থাকে পশুর স্বাভাবিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে গো-পালককে সকল সময় বিশেষ নজর রাখিতে হইবে এবং পশু কখনও অসুস্থ বোধ করিলে সত্বর যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, পশুর পুষ্টিতত্ত্বের মৌলিক নিয়মগুলি সম্পর্কে গো-পালককে ওয়াকিবহাল থাকিতে হইবে। গো-উন্নয়নের প্রধান দুইটি কারণের মধ্যে খাওয়ানোটাই হইল প্রধান, কারণ পশুকে উত্তমরূপে না খাওয়াইলে কেবল প্রজনন দ্বারা পশুর উন্নয়ন সম্ভব নয়।

মানুষ এবং অন্যান্য পশুর ন্যায়, গরু নিজের দেহরক্ষার জন্য খাদ্য ব্যয় করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা দ্বারা উৎপাদন করে বা কাজ বা উভয় উদ্দেশ্যে ব্যয় করে। অভিজ্ঞ গো-পালক, পশুর দেহরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণের উপরে যে পরিমাণ খাদ্য পশু লাভজনকভাবে ব্যবহার করিতে পারে, ঠিক সেই পরিমাণ খাদ্য প্রদান করেন। পশুকে যথাযথভাবে খাওয়াইতে অবশ্যই খরচ হইবে, কিন্তু উৎপাদনক্ষম পশুর পিছনে ঐ খরচ করিলেও মোট লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

খাদ্যের পোষক পদার্থ (nutrients) দেহের তাপ ও শক্তি যোগায়, দেহের কলা গঠন ও ক্ষয়পূরণ করে এবং দেহের বিভিন্ন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। জল পোষক পদার্থ বহন ও দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে। পশু দেহের শতকরা ৭৫ ভাগ এবং দুগ্ধের শতকরা ৮৭ ভাগ জল দ্বারা গঠিত। দৈনিক প্রত্যেক পশুর খাওয়ার

জন্য ৮ গ্যালন এবং স্নান ও অন্যান্য কাজের জন্য আরও ৮ গ্যালন জলের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

খাদ্যের পোষক পদার্থগুলি হইলঃ প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ পদার্থ, খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন। প্রোটিন নাইট্রোজেন-ঘটিত জটিল যৌগিক পদার্থ, তথা অনেকগুলি অ্যামাইনো এসিড (amino acid) দ্বারা গঠিত—দেহের কলা গঠন ও ক্ষয়পূরণ এবং বৃদ্ধির পক্ষে তাহা অপরিহার্য। কোন কোন প্রোটিন, যেমন দুধ, মাংস, মাছ ও ডিমে যে প্রোটিন থাকে তাহাতে মানুষের পক্ষে অপরিহার্য প্রায় সকল অ্যামাইনো এসিডই বর্তমান থাকে।

কার্বোহাইড্রেট, যেমন শর্করা, শ্বেতসার, কাষ্ঠল-তন্তু প্রভৃতি মুখ্যত শক্তি ও তাপ উৎপাদন করে। অতিরিক্ত ক্যালরি মাংসপেশী ও যকৃৎ-এ সঞ্চিত হয় এবং অবশিষ্ট ক্যালরি দেহের চর্বি ও দুগ্ধের স্নেহ পদার্থে পরিবর্তিত হয়।

খাদ্যের চর্বিও তাপ ও শক্তি যোগায়। অতিরিক্ত চর্বি দেহের চর্বিরূপে সঞ্চিত থাকে।

খাদ্যে খনিজ পদার্থ অল্প পরিমাণে থাকে। এই খনিজ পদার্থসমূহের মধ্যে হাড় গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়ম ও ফসফোরস, রক্ত গঠনের জন্য আবশ্যকীয় আইরন, কপার ও কোবাল্ট এবং বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য আইওডিন থাকে। ঐ খনিজ পদার্থসমূহের মধ্যে ম্যাঙ্গানিজ, পটাশিয়ম, সোডিয়ম, সালফার, ক্লোরিন, ম্যাগনেসিয়ম, ফ্লুরিন এবং সিলিকানও উপস্থিত থাকে। সকল গো-মহিষের খাদ্যে সাধারণ লবণ বা আইওডিন যুক্ত লবণ থাকা দরকার। খনিজ লবণ পরিপাক করিবার প্রয়োজন হয় না। খাদ্য নালীতে নিঃসৃত তরল পদার্থে ইহারা দ্রবীভূত হয় বলিয়া ইহা সহজেই দেহে শোষিত হয়। দেহের বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য বজায় এবং উচ্চ উৎপাদনের জন্য ভিটামিন অপরিহার্য। গো-মহিষের প্রয়োজনীয় ভিটামিন তাজা সবুজ খাদ্য, ঘাস ও খড়ে উপস্থিত থাকে।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে, সাধারণ ঘাস এবং লুসার্ন, পারসিয়ান ক্লোভার, বারসিম প্রভৃতি শিম্বিগোত্রীয় উদ্ভিদের মিশ্রণ উত্তম পশুখাদ্য। তাহার দেহের ওজনের ১০ ভাগের ১ ভাগ ওজনের ঐ মিশ্রণ ব অন্য খাদ্য পশুর দৈনিক প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশের গাভীর গড় ওজন ৬৫০ পাউণ্ড এবং দৈনিক দুগ্ধ উৎপাদন ১০ পাউণ্ডের বেশী নয়। বলদ ও ষাঁড়ের ওজন সামান্য বেশী। এই ওজনের গাভীকে দৈনিক ৬৫ পাউণ্ড ঐ মিশ্রণ, যেমন ৪০ পাউণ্ড ঘাস এবং

২৫ পাউণ্ড শিম্বিগোত্রীয় পশুখাদ্য দিলেই চলে। এরূপ মিশ্রণে শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ (৪৮ হইতে ৫০ পাউণ্ড) জল এবং ২৫ ভাগ শুষ্ক পদার্থ (১৫ হইতে ১৬ পাউণ্ড) থাকে। ঐ পরিমাণ খাদ্যে পশুর পক্ষে অপরিহার্য প্রায় সকল পোষক পদার্থই উপস্থিত থাকে।

ঐ ২৫ শুষ্ক শতাংশ পদার্থের মধ্যে মাত্র তিন-পঞ্চমাংশ সহজপাচ্য এবং অবশিষ্ট অংশ অব্যবহৃত থাকে ও গোবররূপে নির্গত হয়। পশুর উৎপাদন ক্ষমতা, খাদ্যের প্রাপ্যতা ও চলতি বাজার দর অনুসারে প্রয়োজন হইলে গো খাদ্যের ঐ মিশ্রণ পরিবর্তন করা যাইতে পারে। প্রতি ১০০ পাউণ্ড দেহের ওজনের জন্য ২ পাউণ্ড করিয়া শুষ্ক গমের খড় (ভূষা) বা জোয়ারের ডাঁটা দিলেও অনুরূপ পুষ্টিকর খাদ্যের কাজ হইবে। বিকল্পে প্রতি ১০০ পাউণ্ড দেহের ওজনের জন্য ১ পাউণ্ড শুষ্ক খড় জাতীয় খাদ্য ও ৩ পাউণ্ড তাজা ঘাস দিলে চলিবে। অর্থাৎ একটি সাধারণ গাভীকে শুষ্ক খড় (dry roughage) খাওয়াইলে দৈনিক প্রায় ১৩ পাউণ্ড ভূষা বা জোয়ারের ডাঁটা এবং শুষ্ক খড় ও তাজা ঘাস মিশাইয়া খাওয়াইলে দৈনিক ৬·৫ পাউণ্ড ভূষা বা জোয়ারের ডাঁটা এবং ২০ পাউণ্ড তাজা ঘাস লাগিবে।

সাধারণ গরু অপেক্ষা দুধ বেশী দেয় বা কাজ বেশী করে, এরূপ গাভী বা বলদের খাদ্যের পরিমাণও সে অনুপাতে বাড়াইতে হইবে। সারবান খাদ্যের (concentrates) মিশ্রণ খাওয়াইয়া খাদ্যের এই বাড়তি চাহিদা মিটানো যায়। ছোলা, ভূষি, যব ও খইল যথাক্রমে ৫ : ৩ : ২ : ১·৫ অনুপাতে মিশাইয়া এই মিশ্রণ তৈয়ারি করা যায়। সাধারণ দৈনিক দুগ্ধ উৎপাদন ১০ পাউণ্ডের অধিক প্রতি পাউণ্ড উৎপন্ন দুগ্ধের জন্য অর্ধ পাউণ্ড ঐ মিশ্রণ দিতে হইবে, অবশ্য পশু যদি প্রয়োজনমত খড় জাতীয় খাদ্য পায়।

পশুকে খাওয়াইবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সর্বদা মনে রাখিতে হইবে :

১। পশুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়াইতে হইবে; কিন্তু অপরিমিত পরিমাণে নয় ;

২। প্রত্যেক পশুকে পৃথকভাবে খাওয়ানো বাঞ্ছনীয় ; যে সকল পশু দুধ বেশী দেয় বা কাজ বেশী করে, তাহাদের অধিক পরিমাণে এবং উৎকৃষ্ট খাদ্য দেওয়া উচিত ;

৩। পশু খাদ্যের মিশ্রণ এমনভাবে তৈয়ারি করিতে হইবে যাহাতে ঐ মিশ্রণ

সহজপাচ্য ও সুস্বাদু হয়। সহজপাচ্য ও সুস্বাদু খাদ্য পশু পেট ভরিয়া খায় এবং উৎপাদনও করে বেশী। প্রতিদিন একই প্রকার খাদ্য না দিয়া নানা প্রকার খাদ্য দিলে পশুর ক্ষুধা এবং খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধি পায়;

৪। গো-মহিষের খাদ্যে অবশ্যই পরিমিত পরিমাণে সাধারণ লবণ মিশাইতে হইবে (দৈনিক প্রত্যেক পশুর খাদ্যে ২ আউন্স করিয়া);

৫। খাদ্য যথাযথ মাত্রায় রেচক হওয়া বাঞ্ছনীয়;

৬। পশুর খাদ্যে হঠাৎ কোন পরিবর্তন করা ঠিক নয়। কোন পরিবর্তন অপরিহার্য মনে করিলে তাহা ধীরে ধীরে করা উচিত;

৭। প্রতিদিন একই সময়ে খাওয়ানো উচিত;

৮। পশু, বিশেষতঃ দুগ্ধবতী গাভীর প্রতি দয়ালু ব্যবহার বাঞ্ছনীয়;

৯। পশুকে প্রতিদিন যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা দরকার;

১০। কোন পশুপালন লাভজনক কিনা তাহা জানিবার জন্য পশুর খাদ্য ও উৎপাদনের সঠিক হিসাব রাখা উচিত। যদি দেখা যায় যে, কোন বিশেষ পশু-পালন লাভজনক নয় তবে ঐ পশু বিক্রয় করিয়া দেওয়া উচিত।

পশুর বাসস্থান

আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পশুকে নীচু, অন্ধকার ছোট ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। তাহাতে সূর্যালোক ও মুক্ত বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। ইহাদের গঠন, বায়ু চলাচল ও জলনিকাশের ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। এইসকল গৃহের দুর্গন্ধযুক্ত উষ্ণ বদ্ধ বাতাসে পশুর দম বন্ধ হইয়া আসে, ইহাদের অস্থায়ী, উঁচু নীচু ও ভিজা মেঝে পশুদের পক্ষে আরামপ্রদ নয়। এরূপ অবস্থায় আমাদের দেশে পাঁজরা-সর্বস্ব দুর্বল পশু বাস করে।

গোশালা দেখিতে সুদৃশ্য বা ব্যয়সাধ্য করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা আরামপ্রদ ও পরিষ্কার হওয়া চাই এবং ইহাতে যেন প্রচুর পরিমাণে আলো-বাতাস প্রবেশ করিতে পারে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে যে গাভী বাস করে তাহার নিকট হইতে প্রচুর দুধ বা যে বলদ বাস করে তাহার নিকট হইতে আশা-নুরূপ কাজ পাওয়া যায় না। গোশালার মেঝে সিমেন্ট কংক্রিট দ্বারা তৈয়ারি

করিতে হইবে এবং মেঝের উপরিতল মসৃণ করা উচিত নয়। মসৃণ হইলে পশু পিছলাইয়া পড়িতে পারে। গোশালায় বড় বড় জানালা রাখিতে হইবে যাহাতে আলো বাতাস অবাধে প্রবেশ করিতে পারে। গোশালায় প্রতি পশুর এমন পরিমাণ জায়গা রাখিতে হইবে যাহাতে পশু শুইয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু আবার খুব বেশী জায়গা রাখিলে পশু ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইবে এবং গোবর ও প্রস্রাবের উপরেই শুইয়া পড়িবে। দৈর্ঘ্যে ৫ ফুট ও প্রস্থে ৪ ফুট স্থান আমাদের দেশের গরুর পক্ষে যথেষ্ট। পশুর খাওয়ার পাত্র বা ডাবা প্রস্থে ২½ ফুট এবং মলমূত্রের নালার প্রস্থ ১½ ফুট হওয়া বাঞ্ছনীয়। সকল কোণগুলি গোল করিয়া তৈয়ারি করা দরকার। গোশালা নির্মাণ কাজে সিমেন্ট ব্যবহার করিতে হইবে। সমস্ত গৃহের কোথাও কোন খোঁজ বা খাঁজ থাকিবে না। খোঁজ থাকিলে পশুর চামড়া, পা বা স্তনে আঁচড় লাগিতে পারে। খাঁজ থাকিলে তাহাতে ময়লা জমে এবং বিভিন্ন কীট বংশবৃদ্ধি করে। গোশালার দেওয়াল সিমেন্ট দ্বারা পালেস্তারা করিতে হইবে এবং ন্যূনপক্ষে প্রায় ৮ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত চুনকাম করা দরকার।

গোশালার জন্য নির্দিষ্ট স্থান শুষ্ক এবং চারিপার্শ্বস্থ স্থানসমূহ হইতে সামান্য উঁচু হওয়া বাঞ্ছনীয়। যাহাতে প্রচুর মুক্ত বায়ু ও সূর্যালোক পাওয়া যায়, সেজন্য গোশালার জন্য নির্দিষ্ট স্থান মনুষ্য আবাসস্থল হইতে বেশ দূরে হওয়া উচিত। উত্তম জল নিকাশ ব্যবস্থা এবং বিশুদ্ধ জল সরবরাহের ব্যবস্থা অবশ্যই রাখিতে হইবে।

পশুর রোগ

গৃহপালিত পশুর নানাপ্রকার রোগ হয়। কোন কোন রোগ ছোঁয়াচে এবং অতি দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে, ফলে গো-পালক আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হন। অনেক সময় পরজীবী দ্বারা পশু আক্রান্ত হয়। উকুন, মাইট (mite) এবং আরও কয়েকপ্রকার রক্তপায়ী কীট পশুর চামড়ায় বাস করে এবং নানাপ্রকার কৃমি প্রভৃতি পশুদেহের ভিতরে বাস করে। এইসকল পরজীবী কীট ক্ষতিকর; কারণ দুগ্ধ উৎপাদন, শক্তি উৎপাদন বা পশুর শরীর গঠনের জন্য যে খাদ্য দেওয়া হয় তাহার একাংশে এইসকল কীট ভাগ বসায়। কোন কোন কীট

আবার পশুর রক্ত শোষণ করে, ফলে পশু অস্থির হইয়া পড়ে এবং পশুদেহের যে অংশে রক্ত শোষিত হয় তাহা ফুলিয়া উঠে। অযত্ন ও অব্যবস্থা, অধিক কাজ করানো, অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান ও পরিবেশ, ত্রুটিপূর্ণ পানীয় জল ও খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা প্রভৃতির ফলে অন্যান্য অ-ছোঁয়াচে রোগগুলির আবির্ভাব ঘটে। যথাযথভাবে খাওয়াইলে ও যত্ন করিলে পশুর রোগ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে পশু কর্মচঞ্চল, চটপটে ও সতর্ক থাকে। ইহারা নিয়মিত ও স্বাভাবিকভাবে খায় ও ঘুমায়। ইহাদের মুখ ভিজা থাকে এবং চামড়া নরম ও পরিষ্কার এবং চকচকে থাকে। স্বচ্ছন্দে ও বিনা যন্ত্রণায় ইহারা নিত্যকর্ম স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন করে। বিশ্রামকালে ইহারা অনেকক্ষণ ধরিয়া জাবর কাটে। ইহার দেহভঙ্গিমা সহজ ও সরল। দেখিলে ইহাদের তুষ্ট বলিয়া মনে হয়। স্বাস্থ্যের উপরোক্ত লক্ষণগুলির কোন একটির বৈসাদৃশ্য দেখা গেলে কোন রোগের আক্রমণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। রুগ্ন পশু জাবর কাটা বন্ধ করে, ইহার দুগ্ধ উৎপাদন হ্রাস পায় এবং ইহা অনেক সময় খোঁড়াইয়া চলিতে থাকে। অনেক সময় ইহাদের চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করে, নাক স্ফীত হয় এবং মুখ ও কর্ণ ঝুলিয়া পড়ে। মুখ, নাসারন্ধ্র বা চক্ষু হইতে একপ্রকার তরল পদার্থ নির্গত হইতে পারে, ক্ষুধা হ্রাস এবং শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে। দলবদ্ধভাবে চলিবার সময় রুগ্ন পশু পিছাইয়া পড়ে এবং অনেক সময় চলিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। ইহাদের দৃষ্টি উৎকণ্ঠিত ও বিষন্ন বোধ হয়। রুগ্ন পশুর গোবর শক্ত বা তরল হইতে পারে; ইহাদের মূত্রও অতিশয় রঙিন হইতে পারে। ইহাদের চামড়া অপেক্ষাকৃত শক্ত হইতে পারে এবং ইহারা অস্বাচ্ছন্দ্য বা যন্ত্রণার লক্ষণ প্রকাশ করে। ইহাদের দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়াসমূহ বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে।

ছোঁয়াচে রোগসমূহের মধ্যে, গো-বসন্ত (rinderpest), গলাফুলা (haemorrhagic septicaemia), ব্ল্যাক কোয়ার্টার (blackquarter), বিষফোড়া (anthrax), জলাতঙ্ক (rabies), খুরা গোগ (foot-and-mouth disease), ছোঁয়াচে গর্ভপাত (contagious abortion), ক্ষয়রোগ (tuberculosis), প্লুরোনিউমোনিয়া (Pleuropneumonia) প্রভৃতি রোগ খুবই সাংঘাতিক। মোটামুটি হিসাবে দেখা যায়, ভারতে প্রতি বৎসর প্রায়

২০ লক্ষ পশু এইসকল ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হয় এবং প্রায় ২ লক্ষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অবশিষ্ট পশু রোগমুক্ত হইলেও অনেকদিন ধরিয়া উৎপাদন ও কাজের অনুপযোগী অবস্থায় থাকে। পশুর অন্যান্য পরজীবী ও অ-ছোঁয়াচে রোগগুলি হইল কাণপাকা (tympanites), শ্বাসকষ্ট (choking), উদরাময় (diarrhoea), রক্তামাশয় (dysentry), কোষ্ঠবদ্ধতা (constipation), কাশি ও জ্বর (conghs and colds), ফুসফুসের প্রদাহ বা নিউমোনিয়া (Pneumonia), পালান-ফুলা (inflammation of the udder), স্তন-দুগ্ধজনিত জ্বর (milk fever), চর্মরোগ (skin diseases) ও ক্ষত (injuries)। এই সকল রোগেও বহু পশু অকালে মারা যায়। ফলে দেশের কোটি কোটি টাকার অপচয় ঘটে।

যথাযথ যত্ন, পরিচর্যা ও সতর্কতা অবলম্বন করিলে, প্রায় সকল ছোঁয়াচে ও অ-ছোঁয়াচে রোগই প্রতিরোধ করা সম্ভব। কোন পশুতে রোগের কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী পাস করা পশু-চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। হাতুড়ে চিকিৎসককে ডাকার অর্থই হইল ঝুঁকি নেওয়া।

নিম্নে খুরা রোগ ও গো-বসন্ত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইল।

এঁসো বা খুরা রোগ (**Foot and Mouth Disease**)

এই রোগে প্রধানতঃ গরু, মহিষ ও ছাগল আক্রান্ত হয়। ইহা অতি প্রবল, তীব্র সংক্রামক ও ছোঁয়াছে রোগ। এক শ্রেণীর ভাইরাস এই রোগের মূল কারণ। রোগাক্রান্ত পশুর মুখ হইতে পশুর লালা নিঃসৃত হয় এবং এই লালা রাস্তা, ঘাস, খাদ্য ও পানীয় পাত্রের সংস্পর্শে আসে এবং সুস্থ পশু ঐ পাত্র হইতে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করিবার সময় বা ঐ রাস্তা দিয়া চলিবার কালে সহজেই আক্রান্ত হইয়া পড়ে। আক্রান্ত পশু, কীটপতঙ্গ, হাঁস-মুরগী, পাখি, কুকুর বা গো-পালকের মাধ্যমেও এই রোগ ছড়াইয়া পড়িতে পারে। গরুর সকল ছোঁয়াচে রোগের মধ্যে ইহাই সর্বাধিক সংক্রামক। ভাইরাস পশুর দেহে সংক্রামিত হইবার ৩-৪ দিন পরে রোগের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। এই রোগ গড়ে ১০-১৫ দিন স্থায়ী হয়। ভাইরাস '৮ দিন পর্যন্ত সক্রিয় থাকিতে পারে। একবার আক্রান্ত হইলে পশুর দেহে কয়েক মাসের বেশী প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মে না। ফলে একই পশু একাধিকবার এই রোগে আক্রান্ত হইতে পারে।

লক্ষণ (Symptom)

প্রবল জ্বর হয়। তাপাঙ্ক ১০৩° ফা. পর্যন্ত উঠিতে পারে। মুখ, শিং ও দেহের অন্যান্য প্রান্তসমূহ গরম হয়, পদতল কোমল হইয়া পড়ে, লালা নিঃসৃত হয়। গরু খোঁড়াইতে আরম্ভ করিলে বুঝিতে হইবে যে ঐ রোগ হইয়াছে। খঞ্জত্ব প্রকাশ পাইবার দ্বিতীয়দিনে মুখে ও জিহ্বায় এবং গাভীর বেলায় বাঁটেও ফোস্কা দেখা যায় এবং সহসা ফাটিয়া ঘায়ের সৃষ্টি করে। পায়ের খুর ও চামড়ার সংযোগস্থলে এবং খুরের ফাঁকেও ফোস্কা দেখা যায়।

কোন ক্ষেত্রে কেবল মুখ, কোন ক্ষেত্রে কেবল খুর, আবার কোন ক্ষেত্রে ঐ উভয় অশংই আক্রান্ত হয়। এজন্য এ রোগকে ফুট এণ্ড মাউথ (foot and mouth) রোগ বলা হয়। রোগের তীব্রতা যত বৃদ্ধি পায়, লালা নিঃসরণও তত বাড়ে, খঞ্জত্বও বৃদ্ধি পায়। উপযুক্ত যত্ন নিলে পশু খুব কম ক্ষেত্রে মারা যায় এবং ১০-১৫ দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে। কিন্তু অবহেলা করিলে বা আক্রান্ত পশুকে দিয়া কাজ করাইলে, পায়ের লক্ষণগুলি আরও প্রকট হইয়া পড়ে, পা ফুলিয়া যায় এবং ১০-১২ দিনে পশু মারা যাইতে পারে।

অনেকে গো-বসন্ত রোগের সহিত ইহাকে ভুল করিয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে যে খুরা রোগে তরল বাহ্যি হয় না।

চিকিৎসা

রুগ্ন পশুর বাসস্থান শুষ্ক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর হওয়া বাঞ্ছনীয়; নতুবা রোগ আরও বাড়িয়া যাইতে পারে। রোগীর যথাযথ যত্ন লওয়া দরকার। আক্রান্ত অংশগুলি জীবাণুনাশক ঔষধদ্বারা উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলিতে হইবে এবং যাহাতে মাছি বসিতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আক্রান্ত পা প্রথমে গরমজল ও পরে জীবাণু নাশক ঔষধে ধুইয়া জিংক (zinc) ও লেড (lead) লোশন ৫% বা সালফানোমাইড অয়েন্টমেন্ট (sulphanomide ointment) প্রয়োগ করিতে হয়। জ্বর না কমা পর্যন্ত সালফানোমাইড বড়ি খাওয়ানো যায়। পেনিসিলিন (একসঙ্গে ৬০ লক্ষ)-ও প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

গাভী আক্রান্ত হইলে তাহার পালান এবং বাঁটও উপরোক্তভাবে ধুইয়া

ফেলিতে হয়। নাতি উষ্ণ জলে ফট্‌কিরি ও বোরিক এসিড মিশাইয়া মুখ ও জিহ্বা ধুইয়া ফেলিতে হয়। তারপর বোরো-গ্লিসারিন প্রয়োগ করা দরকার।

জ্বরের সময় পানীয় জল বা মণ্ডে পটাসিয়ম ক্লোরেট বা নাইট্রেট প্রয়োগ করা দরকার। খুর খসিবার সম্ভাবনা দেখা দিলে পেনিসিলিন সূচী বা টেরামাইসিন প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

সতর্কতা

আক্রান্ত পশুর, বিশেষতঃ বাঁটে ক্ষত হইলে ঐ পশুর দুধ কখনও মানুষের খাওয়া উচিত নয়। আক্রান্ত পশুকে পৃথক স্থানে রাখিতে হইবে এবং সংক্রামক রোগের অন্যান্য ব্যবস্থাসমূহ অনুসরণ করা দরকার। সর্বশেষ রোগীর আরোগ্য লাভ বা মৃত্যুর পনরদিন পরে রোগের প্রাদুর্ভাব দূরীভূত হইয়াছে বলিয়া ধরা যায়।

পথ্য

তাজা কচি ঘাস চিটাগুড়ে জল মিশাইয়া, পাতলা চাউলের মণ্ড, সামান্য লবণসহ ভূষি বা চিটাগুড়সহ ছাতু খাইতে দেওয়া যাইতে পারে।

গো-বসন্ত (**Rinderpest**)

অনেক অঞ্চলে এ রোগের নাম গুটি বা শীতলা বা Cattle plague। টাইফয়েডের ন্যায় ইহা অতি সংক্রামক জ্বর। রোগের উপসর্গ হঠাৎ দেখা দেওয়া, তীব্র জ্বর ও অত্যধিক সংক্রামতা, সহসা মৃত্যু অন্ত্র ও মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ফোস্কা প্রভৃতি এ রোগের বৈশিষ্ট্য। গরু-মহিষ ছাড়া ভেড়া ও ছাগলও এ রোগে আক্রান্ত হয়। সমতলভূমির অপেক্ষা পার্বত্য অঞ্চলের পশু সহজে আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত পশু শতকরা ৯০ হইতে ১০০ টি ক্ষেত্রে মারা যায়। অবশ্য একবার আরোগ্যলাভ করিলে পশুর দেহে সারা জীবনকালের জন্য প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মে। খাদ্য, খড় ও অন্যান্য সংক্রমিত দ্রব্য এবং আক্রান্ত পশুর প্রত্যক্ষ

স্পর্শে এই রোগ এক পশু হইতে অন্যান্য পশুতে সংক্রামিত হয়। আক্রান্ত পশুর মলমূত্র, নিঃসৃত লালা ও রক্ত অত্যন্ত সংক্রামক।

লক্ষণ

হঠাৎ এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং একত্রে অনেকগুলি পশু আক্রান্ত হয় এবং অতি দ্রুত এ রোগ বিস্তারলাভ করে। অতি তীব্র জ্বর হয় এবং আক্রমণের তৃতীয় চতুর্থ দিনে জ্বর দ্রুত বাড়িয়া ১০৪°-১০৫° ফা. পর্যন্ত উঠে এবং পরে জ্বর ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে থাকে। মৃত্যুর পূর্বে দেহের তাপাঙ্ক স্বাভাবিক অপেক্ষা নীচে নামিয়া যাইতে পারে। এ রোগের অন্যান্য প্রাথমিক উপসর্গগুলি হইল (rumination) বন্ধ হওয়া, গরম মুখ, বিষণ্ণ ভাব, তীব্র তৃষ্ণা, শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত মল, কোষ্ঠবদ্ধতা, বাঁকান পিঠ ও মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে রক্তসঞ্চয়। ধীরে ধীরে এ সকল উপসর্গের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, মাড়ির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী লাল হইয়া যায়, কোষ্ঠবদ্ধতা আরও তীব্র হয়, মল শ্লেষ্মা ও রক্তদ্বারা আবৃত থাকে এবং অতি কষ্টে নির্গত হয়। মলদ্বার ও যোনির (vagina) শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী লাল হইয়া যায়। পরে পশু মাথা একপাশে গুঁজিয়া শুইয়া পড়ে এবং চক্ষু ও নাসারন্ধ্রদ্বয় হইতে প্রচুর শ্লেষ্মা নির্গত হইতে থাকে। ইহার পরে পাতল উদরাময় (diarrhoea) দেখা দেয়। প্রথমে জলের ন্যায় পাতলা মলের সঙ্গে রক্ত ও শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত ছোট ছোট শক্ত ঢেলার মত পদার্থ নির্গত হইতে থাকে। পরে কেবল হল্‌দে বাদামী বর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত তরলপদার্থ নির্গত থাকে। ইহার সঙ্গে রক্ত ও শ্লেষ্মার টুকরা থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট দেখা দেয়। দুই হইতে ছয়দিনের মধ্যে আক্রান্ত পশুর মৃত্যু ঘটে। মাড়ি ও মুখের ঘা এবং অনেকক্ষেত্রে গলকম্বল কুঁচকি, পালান, স্কন্ধদেশ ও পেটের চামড়ায় ফোস্কা এবং নাসারন্ধ্র, চোখ ও মুখ হইতে গাঢ় পদার্থ নিঃসরণ এ রোগের প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা

এ রোগের কোন চিকিৎসা নাই। তবে সুস্থ পশুতে যাহাতে রোগ ছড়াইতে

না পারে, সেজন্য সেগুলি আক্রান্ত পশু হইতে পৃথক করিয়া জি-টি-ভি (G. T. V. অর্থাৎ Goat Tissue Vaccine) টিকা দেওয়া দরকার। উহাদের দিকে সকল সময় নজর রাখিতে হইবে এবং মাঝে মধ্যে তাহাদের দেহের তাপমাত্রা লইয়া দেখিতে হইবে তাহাদের মধ্যে কোন পশু আক্রান্ত হইয়াছে কিনা।

আক্রান্ত পশুর পানীয় জলে ২% পটাসিয়ম পারমাঙ্গানেট বা ½-১% কারবোলিক এসিড প্রয়োগ করা উচিত। রুগ্ন পশুর তাপমাত্রা খুব বাড়িয়া গেলে সালফানোমাইড দেওয়া যাইতে পারে। সর্বশেষ পশুর আরোগ্যলাভ বা মৃত্যুর ১০ দিন পরে রোগের প্রাদুর্ভাব দূরীভূত হইয়াছে ধরা যায়।

পথ্য

পথ্য তরল হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাঁচা বেলসিদ্ধ, চাউলের মণ্ড প্রভৃতি খাইতে দেওয়া যাইতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

আমাদের দেশে পশুর সংখ্যা প্রচুর এবং যথাযথ প্রজনন, যথাযথ পুষ্টিসাধন, অকর্মণ্য পশুর যথাযথ অপসারণ ও যথাযথ পরিচর্যা দ্বারা ইহাদের উন্নয়ন সম্ভব। পশুকে পরিমিত পরিমাণে সুষম খাদ্য দিলে তাহার নিকট হইতে সর্বোচ্চ উৎপাদন আশা করা যায়। পশুর বাসস্থান আরামপ্রদ ও পরিষ্কার হওয়া উচিত এবং তাহাতে প্রচুর পরিমাণে আলো-বাতাস চলাচলের সুযোগ থাকা দরকার। যথাযথ যত্ন ও পরিচর্যা করিলে পশুর সকল রোগই প্রতিরোধ করা যায়।

প্রশ্ন

১। গো-প্রজননে সাফল্য অর্জন করিতে হইলে কোন কোন নিয়মগুলি মানা উচিত?

২। লাভজনকভাবে পশুকে খাওয়াতে তুমি কি সুপারিশ কর?

৩। পশুর আদর্শ বাসস্থান কিরূপ হওয়া উচিত?

৪। রুগ্ন পশুর লক্ষণ কি?

সহায়ক পুস্তক

Aggarwala, A. C., '*Feeding and Milking of Cows in India,*' Gulab Chand Kapur & Sons, Lahore (out of print), 1931.

Evans, Everett F., and Roy L. Donahue, '*Exploring Agriculture,*' Printice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, U. S. A,, Second Edition, 1962.

Randhawa, M. S., *Agriculture and Animal Husbandry in India,*' Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, 1958.

Sinha, S. N. (Editor), *Tweed's Cow Keeping in India,* Fifth Edition, Thacker, Spink & Co., Ltd., Calcutta, 1931.

United States Department of Agriculture, *Animal Diseases, The 1956 Yearbook of Agriculture,* Washington D.C., U.S.A.

Whyte, R. O., *The Grassland Fodder Resources of India,* Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, 1957.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

হাঁস-মুরগীর তদারকি (Poultry Management)

ডিম ফুটানো ও ডিম-ফুটানো যন্ত্রের ব্যবহার

(Incubation and incubator management)

মুরগী-পালনে সাফল্য অর্জন করিতে হইলে মুরগী তদারকি ব্যবস্থা উত্তম হওয়া বাঞ্ছনীয়। মুরগীর ব্যবসায় সাফল্য বা অসাফল্য সম্পূর্ণরূপে যে ব্যক্তি তদারকি করে তার উপর নির্ভর।

দুই প্রকারে ডিম ফুটানো যায়। **স্বাভাবিক উপায়ে** ডিম ফুটানো (natural incubation) বা মুরগীর দেহের নীচে ডিম ফুটানো এবং **কৃত্রিম উপায়ে** ডিম ফুটানো বা যন্ত্রের সাহায্যে ডিম ফুটানো। বর্তমান অবস্থায় আমাদের দেশে উভয় প্রথাই চলিতে পারে। কালক্রমে ডিম-ফুটানো যন্ত্র স্বাভাবিক উপায়ে ডিম ফুটানোর স্থান অধিকার করিবে ; কারণ কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটাইতে খরচ কম পড়ে এবং একসঙ্গে অনেক ডিম ফুটানো যায়।

স্বাভাবিক উপায়ে ডিম ফুটানো

আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষণপ্রাপ্ত ডিম ফুটাইবার লোক (hatcherymen) ও ডিম-ফুটানো যন্ত্রের সংস্থান না হওয়া পর্যন্ত স্বাভাবিক উপায়ে ডিম ফুটানো প্রচলিত থাকিবে।

প্রধানত ডিম উৎপাদনের জন্যই মুরগী পালন করা হয়। ডিমে তা দিতে দিলে মুরগীর উৎপাদন বন্ধ হইয়া যায় ; ফলে মুরগী পালনে আয় হ্রাস পায়।

কাজেই যত বেশী ডিম আবৃত করিতে পারে, ততগুলি মুরগীর নীচে সাজাইয়া দিতে হইবে। একসঙ্গে একটি মুরগী ১০ হইতে ১৫টি ডিমে তা দিতে পারে। এক সঙ্গে কয়েকটি মুরগীকে তা দিতে বসাইলে, এক সপ্তাহ পরে ডিমগুলি আলোর সামনে ধরিয়া অ-নিষিক্ত ডিমগুলিকে বাছিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। এক বা একাধিক মুরগীকে নূতন ডিমে তা দেওয়া যাইতে পারে। এক সপ্তাহ পরে আলোর সামনে ধরিয়া বাছিয়া ফেলিয়া যে ডিমগুলি রহিল সেগুলিকে একত্র করিয়া যত কম সংখ্যক মুরগীর নীচে সম্ভব, তা দিতে দেওয়া যাইতে পারে। দুইটি মুরগীর তা দেওয়া ডিম হইতে যতগুলি শাবক হইবে সেগুলিকে একটি মুরগীর তত্ত্বাবধানে দিয়া অপর মুরগীটিকে আবার ১০ হইতে ১৫টি ডিমে তা দিতে বসানো যাইতে পারে। উষ্ণ আবহাওয়ায় একটি মুরগী প্রায় ২৫টি শাবকের তত্ত্বাবধান করিতে পারে।

স্বাভাবিক উপায়ে ডিম ফুটাইবার ব্যয় হ্রাস করিবার অপর একটি উপায় হইল, মুরগীর নীচে যে দিন ডিম বসানো হইল সেই দিনেই ডিম ফুটানো যন্ত্রেও ডিম বসানো। উভয় ক্ষেত্রেই প্রায় একই দিনে শাবক নির্গত হইবে এবং যন্ত্রে ফুটানো শাবকগুলিকে রাত্রিবেলা ঐ মুরগীর নীচে রাখিয়া দিলে সে স্বভাবতই ঐগুলিকে নিজের শাবক ভাবিয়া পালন করিবে। যদিও একটি মুরগী মাত্র ১০ হইতে ১৫টি ডিমের উপর বসিতে পারে এবং তাহা হইতে ৮ হইতে ১২টি শাবক নির্গত হয়, ইহা এক সঙ্গে প্রায় ২৫টি শাবক পালন করিতে পারে।

গ্রামে উন্নত জাতের মুরগী পালন প্রচলনে প্রধান আপত্তি হইল এই যে, ইহারা ডিমে তা দিতে চায় না। অপর কথায় বলা যায় উন্নত জাতগুলি হইতে ডিমে তা দেওয়ার বংশগত ধারাটিই অপসারণ করা হইয়াছে। ফলে গ্রামবাসী চিন্তান্বিত, কারণ উন্নত জাত পালন করিলে তিনি ডিমে তা দেওয়ার মুরগী পাইবেন না। স্বাভাবিক উপায়ে ডিম ফুটানোর পদ্ধতি হইতে কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটানোর পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়ার পথে ইহা প্রকৃতই একটি সমস্যা। অবশ্য যে সব মুরগী-পালক মুরগী পালনকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিতে চান, তাঁরা ক্রমশঃ কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটানোর পদ্ধতি গ্রহণ করিবেন।

কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটানো

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মুরগীর ব্যবসা যেরূপ প্রসারলাভ করিয়াছে, ভারতেও

অনুরূপ প্রসার ঘটিলে, আগামী ১০ বৎসরে ডিম ফুটানোর যন্ত্র তা দেওয়া মুরগীর স্থান অধিকার করিবে। ইহার অনেকগুলি কারণ আছে ঃ

১। ডিম ফুটাইবার কাল নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কারণ এজন্য মাতা-মুরগী খুঁজিবার প্রয়োজন হয় না ;

২। মুরগী-পালকের প্রয়োজনমত একবারে যতগুলি প্রয়োজন ততগুলি ডিম ফুটানো যায় ;

৩। স্বাভাবিক উপায়ে ডিম ফুটানো অপেক্ষা যন্ত্রে ডিম ফুটাইলে শাবকের হার বেশী পাওয়া যায় ;

৪। কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটানো ও কৃত্রিম উপায়ে শাবক পালনে শিকারী প্রাণী, পরজীবী কীট ও রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস পায়।

ডিম ফুটানো যন্ত্র দুই প্রকার ঃ ক্যাবিনেট (Cabinet) শ্রেণী। অধিকাংশ ছোট যন্ত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অপেক্ষাকৃত বড় পাখাযুক্ত ফোর্স্ড ড্রাফ্ট (forced-draft) শ্রেণী। শেষোক্ত শ্রেণীর যন্ত্র শাবক-ব্যবসায়ীদের নিকট খুবই জনপ্রিয় ; কারণ ইহাতে শাবক উৎপাদনে ব্যয় কম হয়। তাপ-মাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্রসমূহ স্বয়ংক্রিয়। যন্ত্রের বাহিরে তাপমাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধিতে ভিতরে তাপমাত্রার তারতম্য বিশেষ ঘটে না। ছোট ক্যাবিনেট শ্রেণীর যন্ত্রে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করিতেই অনেক সময় নষ্ট হয়।

কৃত্রিম উপায়ে মুরগীর শাবক উৎপাদনে আরও নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ করা দরকার। সন্তোষজনকভাবে যন্ত্র চালাইবার জন্য যন্ত্র নির্মাতার নির্দেশসমূহ মানিয়া চলা উচিত। ক্যাবিনেট শ্রেণীর যন্ত্রে ১০১ হইতে ১০২° ফা. এবং ফোর্স্ড ড্রাফ্ট শ্রেণীর যন্ত্রে ৯৯·৫ হইতে ১০০° ফা. পর্যন্ত তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করিবার নির্দেশ থাকে।

৫৮ ও ৫৯ নং চিত্রে প্রদর্শিত বাঁশের ঝুড়ি বা শক্ত কাগজের বাক্সে একদিন বয়স্ক শাবক দূরদেশে চালান দেওয়া যায়। ডিমের কুসুমে প্রকৃতি এমন খাদ্যের ব্যবস্থা রেখেছেন যে ডিম ফুটিয়া বাহির হইবার পরও দুই বা ততোধিক দিন শাবক ঐ খাদ্যেই বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কাজেই একদিন বয়স্ক শাবক যদি দুইদিনের মধ্যে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইয়া যায় তাহা হইলে ইহারা উত্তম অবস্থায়ই পৌঁছে। শাবক চালান দেওয়ার ঝুড়ির তলদেশে শুষ্ক খড় বিছাইয়া দেওয়া দরকার। ঝুড়ির এক একটি ঘরে ২০ হইতে ২৫টি শাবক একত্র রাখা দরকার যাহাতে একে অন্যকে উষ্ণ রাখিতে পারে
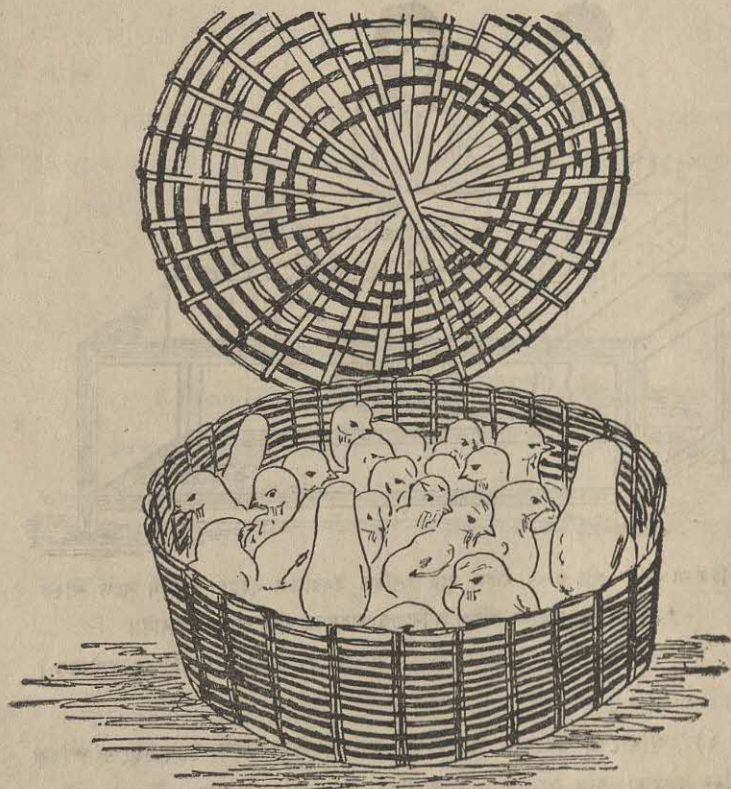
চিত্র নং ৫৮। ঢাকনি উত্তমরূপে লাগাইলে, একদিন বয়স্ক শাবক সস্তায় বাঁশ হইতে তৈয়ারী ঝুড়িতে চালান দেওয়া যায়।

[EARL N. MOORE মহাশয়ের সৌজন্যে]

কোন্ কোন্ কারণ ডিম হইতে শাবক নির্গমনকে প্রভাবিত করে ?

(Factors affecting hatchability)

যে কোন উপায়ে ডিম ফুটানো হোক না কেন, ডিম হইতে শাবক নির্গমনকে বহু কারণ প্রভাবিত করে। দুঃখের বিষয়, ডিম বসানোর পূর্বেই কোন ডিমের শাবক উৎপাদন ক্ষমতা আছে কিনা তাহা জানা সম্ভব নয়। ডিম হইতে শাবক নির্গমনকে প্রভাবিত করে, এরূপ কয়েকটি কারণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :
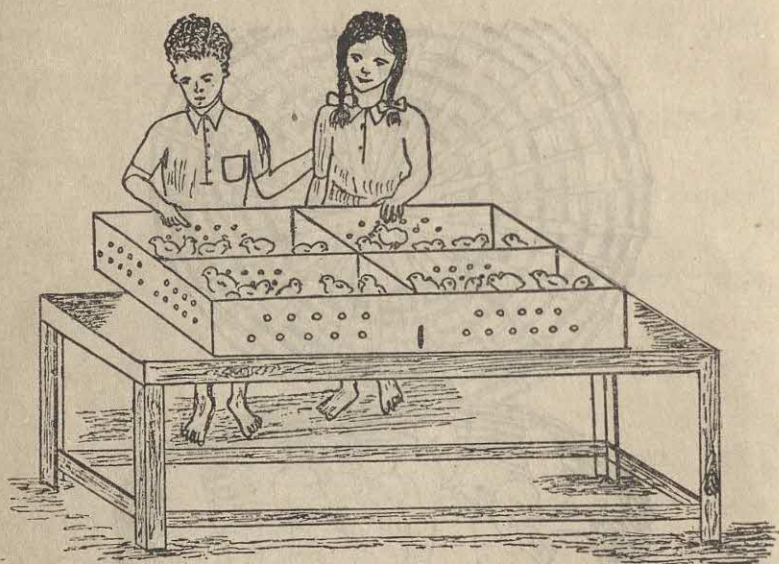
চিত্র নং ৫৯। প্রায় ৩০০০ মাইল দূরে অবস্থিত ইসরায়েল হইতে একদিন বয়স্ক শাবক উড়োজাহাজে করিয়া আনিলেও তাহাদের স্বাস্থ্য খারাপ হয় নাই।

[EARL N. MOORE মহাশয়ের সৌজন্যে]

১) আমাদের দেশের অধিকাংশ স্থানের উচ্চ তাপ ডিম হইতে শাবক নির্গমন ক্ষমতা হ্রাস করে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য গ্রীষ্মকালে দিনে অন্ততপক্ষে চারবার ডিম সংগ্রহ করিয়া ঠাণ্ডা ও আর্দ্র স্থানে রাখিতে হইবে;

২) প্রথম বৎসর ডিম দিতেছে, এরূপ মুরগীর ডিমের, অপেক্ষাকৃত বয়স্ক মুরগীর (রাজহংসীর বেলায় ঠিক নয়) ডিম অপেক্ষা শাবক উৎপাদন ক্ষমতা অধিক ;

৩) কম সংখ্যক ডিম দেয় এরূপ মুরগীর ডিম অপেক্ষা বেশী ডিম দেয় এরূপ মুরগীর ডিম হইতে শাবক উৎপাদনের হার বেশী ;

৪) নিকট-সম্পর্কীয় মোরগ মুরগীর সংযোগের ফলে উদ্ভূত ডিম হইতে শাবক উৎপাদনের হার কম ;

৫) মুরগীর খাদ্যে ভিটামিন এ. ডি. ও রিবোফ্ল্যাবিন (riboflavin) কম থাকিলে ডিম হইতে শাবক উৎপাদনের হার কম হয় ;

৬) ফাটা, বিকৃত আকার, খুব বড় বা খুব ছোট ডিম বা যে সকল ডিমের

খোলস সচ্ছিদ্র বা খুবই পাতলা সে সকল ডিম হইতে শাবক নির্গমনের হার কম হয় ;

৭) ডিম-ফুটানো যন্ত্র যথাযথ নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারিলেও ডিমের শাবক উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়। এজন্য যন্ত্র নির্মাতার নির্দেশ যথাযথ অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়।

শাবক পালন যন্ত্রের ব্যবহার ও শাবক পালন

(**Brooder management and brooding**)

আমাদের দেশে কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটানোর যখন ব্যাপক প্রচলন হইবে তখন কৃত্রিম উপায়ে শাবক পালনও জনপ্রিয় হইয়া উঠিবে।

স্বাভাবিক উপায়ে শাবক পালন অপেক্ষা কৃত্রিম উপায়ে শাবক পালনের সুবিধাসমূহ হইল :

১) প্রয়োজন মত সংখ্যক শাবক পালন একসঙ্গে আরম্ভ করা যায় ;

২) বৎসরের যে কোন সময় শাবক পালন করা যায় ;

৩) শাবকের বৃহৎ দল পালন করিলেও তাহাতে মৃত্যুর হার অতিশয় কম ;

৪) কৃত্রিক উপায়ে শাবক পালনে রোগ কম, পরজীবী ও শিকারী প্রাণীর উপদ্রব হ্রাস পায়, অবশ্য ইহা সম্পূর্ণরূপে উত্তম তদারকি ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে।

আধুনিক, স্বল্পব্যয় সাপেক্ষ কৃত্রিম শাবক পালন পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিকহাল হইয়া কৃত্রিম উপায়ে শাবক পালন পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। যথাযথ পরিচর্যা ও আধুনিক শাবক পালন যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে শাবক পালন মোটেই কঠিন নয়।

অপেক্ষাকৃত বয়স্ক মুরগীর স্থলে নূতন মুরগী পালনের উপর মুরগী ব্যবসায়ের সাফল্য নির্ভর করে। দেখা গিয়াছে যে এক বৎসর ডিম দিবার পর মুরগীর ডিম উৎপাদন হ্রাস পায়। এজন্য প্রতি বৎসর বয়স্ক মুরগীগুলি বিক্রয় করিয়া তৎস্থলে নূতন মুরগী পালন করা উচিত। এজন্য প্রতি বৎসর নূতন মুরগী পালন করা কর্তব্য। কাজেই প্রতি বৎসর একদল নূতন শাবক পালন করা দরকার।

শাবক পালন যন্ত্র (Brooders)

শাবককে নিরাপদে ও স্বাচ্ছন্দ্যে রাখাই শাবক পালন যন্ত্রের প্রধান কাজ। শাবক পালন যন্ত্র নানাপ্রকার হইতে পারে। পালক বা কাপড়ের তৈয়ারি শাবক পালন যন্ত্রে কোন প্রকার তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। তিনদিকে ঘেরা ও একদিকে খোলা একটি বাক্সের উপর হইতে পালক বা গরম পালকের ফালি টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। পালক বা কাপড় শাবকের প্রায় ২ ইঞ্চি উপরে থাকে। স্বাভাবিক ভাবে শাবক পালনের ন্যায় শাবকগুলি পালক বা কাপড়ের নীচে ঠাসাঠাসি করিয়া থাকিয়া পরস্পরকে উষ্ণ রাখে। আমাদের দেশের জলবায়ুতে এই প্রকার যন্ত্রে ২৫টি বা ততোধিক শাবক রাখিলে শাবকগুলি পরস্পরকে উষ্ণ রাখিতে পারে। এপ্রকার যন্ত্র নির্মাণ ও চালনার ব্যয় খুবই কম, কারণ কোন তাপ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয় না। শীতকালে বা ঝড়ের সময় বাতাস বন্ধ করা যায়, এরূপ একটি উষ্ণ ঘরে শাবক পালন যন্ত্রটি রাখিতে হইবে। গ্রীষ্মকালে শাবকগুলিকে শীতল ও ছায়াযুক্ত স্থানে রাখা আবশ্যক।

আমাদের দেশের একটি জনপ্রিয় শাবক পালন যন্ত্রের ছবি ৬০ নং চিত্রে প্রদত্ত হইল। এ সকল যন্ত্রে বিদ্যুৎ দ্বারা তাপ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কেরোসিন তৈল ব্যবহৃত হ্যারিকেন লণ্ঠনও ব্যবহার করা যায়। ১০ হইতে ৫০টি শাবকের দলের জন্য হ্যারিকেন লণ্ঠন বেশ উপযোগী।

শাবকের তদারকি
(Management of young stock)

শাবকের তদারকি ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে :

(১) খাওয়ার পাত্র যথেষ্ট পরিসর হওয়া দরকার ;

(২) জল পান করিবার পাত্র যথেষ্ট পরিসর হওয়া আবশ্যক ;

(৩) সকল বয়সের নিম্ন মানের মুরগী অপসারণ ;

(৪) অক্টোবর হইতে মার্চ—এই ছয়মাসের দিনগুলি ছোট হওয়ায় কৃত্রিম আলো ব্যবহার করিয়া দেহের বৃদ্ধি ও ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি করা দরকার ;
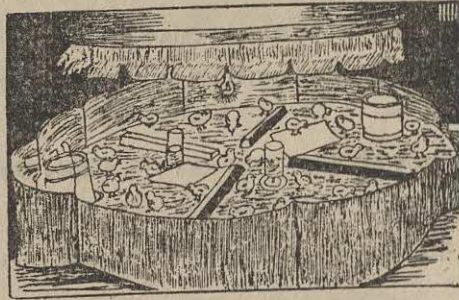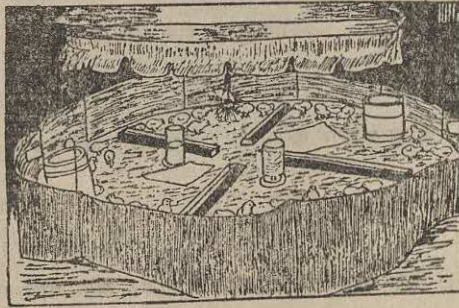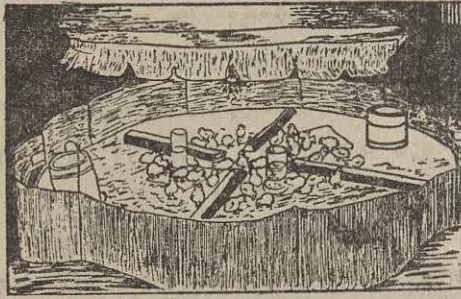
চিত্র নং ৬০। শাবক পালন যন্ত্রে বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে তাপ সঞ্চার করা যায়। আলোর পরিমাণ ও অবস্থান শাবকের গতিবিধি দেখিয়া নির্ণয় করা যায়—

উপরে: যদি আলোর পরিমাণ খুব কম হয় বা আলো খুব দূরে থাকে তবে শাবকেরা একত্র হইয়া পরস্পরকে উষ্ণ রাখিতে চেষ্টা করে।

মধ্যে: যদি আলোর পরিমাণ খুব বেশী হয় বা আলো খুব কাছে থাকে তবে শাবকেরা শাবক পালন যন্ত্রের প্রান্তে চলিয়া যায়।

নীচে: যদি দেখা যায় যে শাবকেরা পালন যন্ত্রের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে, তাহা হইলে আলোর অবস্থান ও পরিমাণ সঠিক হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

[EARL N. MOORE মহাশয়ের সৌজন্যে]

(৫) যাহাতে খাদ্যের অপচয় রোধ হয় এবং খাদ্য পরিষ্কার থাকে সেজন্য উপযোগী খাদ্য পাত্র ব্যবহার করা প্রয়োজন ;

(৬) সকল সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য ও জল মজুত রাখিতে হইবে ;

(৭) শাবককে স্বাচ্ছন্দ্যে ও শিকারী প্রাণী হইতে নিরাপদে রাখিবার উপযোগী বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে ;

(৮) প্রতিদিন নিয়মিত শাবকের পরিচর্যা করিতে হইবে ;

(৯) লেগহর্ণ (Leghorn) প্রভৃতি ছোট প্রজাতির জন্য প্রতিটি মুরগীর জন্য ৩ বর্গফুট এবং রোড আইল্যাণ্ড রেড (Rhode Island Red) প্রভৃতি বড় প্রজাতির জন্য ৩·৫ বর্গফুট মেঝের সংস্থান রাখিতে হইবে।

খাদ্য-পাত্রে জায়গা (**Feeder space**)

সকল শাবক যাহাতে একসঙ্গে খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে, সেজন্য খাদ্য পাত্রে সকলের জায়গা হওয়া দরকার। ৮ ফুট দীর্ঘ খাদ্য পাত্র ব্যবহার করা যাইতে পারে। বয়স অনুসারে প্রত্যেক শাবকের জন্য খাদ্য পাত্রে নিম্নলিখিত পরিমাণ জায়গা থাকা দরকার ঃ

১। একদিন বয়স্ক শাবকের জন্য এক রৈখিক ইঞ্চি জায়গা ;

২। তিন সপ্তাহ হইতে ছয় সপ্তাহ বয়স্ক ১০০ শাবকের জন্য ১৭৫ রৈখিক ইঞ্চি জায়গা ;

৩। সাত সপ্তাহ হইতে বার সপ্তাহ বয়স্ক ১০০ শাবকের জন্য ৩০০ রৈখিক ইঞ্চি জায়গা ;

৪। বার সপ্তাহের অধিক বয়স্ক ১০০ শাবকের জন্য ৪০০ রৈখিক ইঞ্চি জায়গা।

জল-পাত্রে জায়গা (**Watering space**)

মুরগী পালন কেন্দ্রে সারা বৎসর ধরিয়া যথেষ্ট পরিমাণে পরিষ্কার, টাটকা ও ঠাণ্ডা জলের ব্যবস্থা রাখা দরকার (৬১ ও ৬২ নং চিত্র)। গ্রীষ্মকালে জলের অপেক্ষাকৃত বেশী জায়াগা রাখিতে হইবে। সাধারণ আবহাওয়ায় ১০০ শাবকের জন্য নিম্নলিখিত পরিমাণ পরিসর রাখিতে হইবে ;

চিত্র নং ৬১। একটি মাটির থালায় জলভর্তি একটি মাটির কলসী উপুর করিয়া রাখিয়া সকল বয়সেরই মুরগীর উপযোগী জলপাত্রের ব্যবস্থা করা যায়। জলের উপরিতল বরাবর মাটির কলসীতে একটি ফুটো রাখিতে হইবে। [NAIDU হইতে পুনরঙ্কিত]

১। একদিন হইতে তিন সপ্তাহ বয়স্ক শাবকের জন্য ২০ রৈখিক ইঞ্চি জায়গা বা ২ গ্যালন জলের ফোয়ারা ;

২। তিন সপ্তাহ হইতে বার সপ্তাহ বয়স্ক শাবকের জন্য ৪০ রৈখিক ইঞ্চি জায়গা বা ৩ গ্যালন জলের ফোয়ারা ;

৩। বার সপ্তাহ হইতে পূর্ণ বয়স্ক মুরগীর জন্য ৫০ রৈখিক ইঞ্চি জায়গা বা ৪ গ্যালন জলের ফোয়ারা ;

৪। গ্রীষ্মকালে উপরি উক্ত জায়গার দেড়গুণ পরিসর রাখিতে হইবে।

অন্যান্য সুপারিশ (**other recommendations**)

বিভিন্ন বয়সের শাবককে একত্র রাখা বাঞ্ছনীয় নয়। কোন অবস্থাতেই শাবক ও পূর্ণবয়স্ক মুরগী একত্র পালন উচিত নয়। বিভিন্ন বয়সের মুরগী একত্র পালন করিলে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক মুরগীর কীট ও রোগ শাবকে
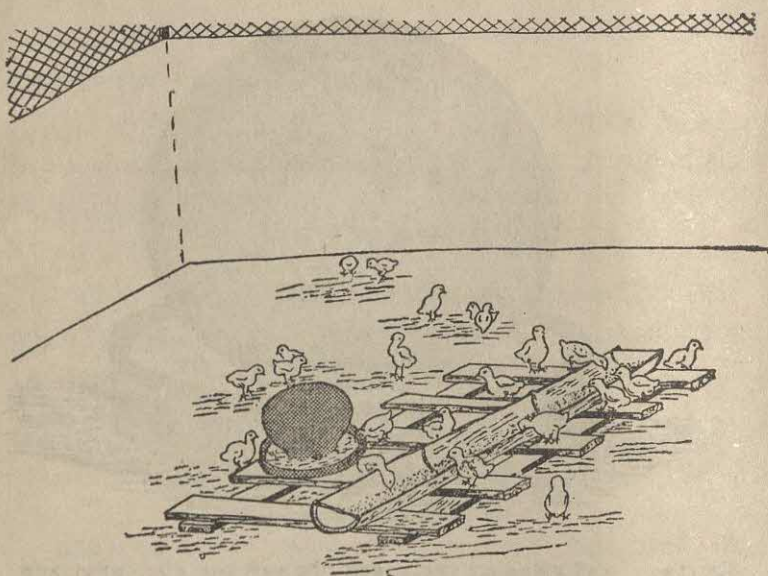
চিত্র নং ৬২। ধুলো যাহাতে কম পড়ে সেজন্য জল ও খাদ্য পাত্র পাটাতনের উপর রাখা উচিত।
[EARL N. MOORE মহাশয়ের সৌজন্যে]

সংক্রামিত হইবে। মুরগীগুলি যাহাতে যথাযথ বাড়িতে পারে এবং বেশী জায়গা পায়, এজন্য মোরগগুলিকে পৃথক রাখিতে হইবে। যাহাতে পরস্পর বেশী ঠোকরা-ঠুকরি করিতে না পারে সেজন্য এক সপ্তাহ বয়স হইলে পাখীর উপরের ঠোঁটের অর্ধেক কাটিয়া ফেলা উচিত।

নির্বাচন (Culling)

যে সকল পাখী পালন লাভজনক নয় সেগুলি বিক্রয় করিয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয়। যে সকল পাখীর জীবনীশক্তি কম, বিকলাঙ্গ বা অপেক্ষাকৃত ধীরে বৃদ্ধি হয় সেগুলি সাধারণত ডিম কম দেয়। যে সকল পাখীর ডিম উৎপাদন ক্ষমতা বেশী সেগুলিকে প্রজননের জন্য নির্বাচন করিয়া রাখা উচিত। মুরগীর পালকে উন্নত করিতে হইলে ঐ সকল মুরগীর সহিত বাছাই উন্নত মোরগের মিলন ঘটানো বাঞ্ছনীয়।

নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি অনুসরণ করিয়া মুরগী বাছাই করা যায় (৬৩ ও ৬৪ নং চিত্র) ঃ

	যে সকল মুরগী বেশী ডিম দেয়	যে সকল মুরগী কম ডিম দেয়
ঝুঁটি	বৃহৎ, লাল, মোমের মত মসৃণ	ছোট, ফ্যাকাশে বর্ণবিশিষ্ট ও শল্কবিশিষ্ট (scaly)
চক্ষু	উজ্জ্বল, উদ্গত (prominent)	অনুজ্জ্বল, কোটরগত
ডিম নির্গমন পথ	বড়, আর্দ্র, প্রশস্ত, পাটলবর্ণবিশিষ্ট	ছোট, কুঞ্চিত, শুষ্ক, সাদাটে বা হলদে বর্ণবিশিষ্ট
পিউবিক (pubic) হাড়দ্বয়ের মধ্যস্থ পরিসর	তিন বা ততোধিক আঙ্গুল প্রশস্ত	অনধিক দুই আঙ্গুল প্রশস্ত
উদর	নরম, নমনীয়	শক্ত, অনমনীয়

বাসগৃহ (Housing)

নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করাই বাসগৃহের প্রধান উদ্দেশ্য। (১) মেঝেতে খড় বিছাইয়া মুরগীর গৃহ তৈয়ারি করা যায়। (২) তার বা বাঁশের চটাদ্বারা নির্মিত মেঝেসহ খাঁচার অর্ধেক ছাদ দ্বারা আবৃত অবস্থায় মুরগীর বাসগৃহ নির্মাণ করা যায়। (৩) আবার প্রত্যেক মুরগীর জন্য পৃথক খাঁচাও নির্মাণ করা যাইতে পারে। ঘরে বা খাঁচায় আবদ্ধ করিয়া রাখিলে শ্রম-ব্যয় হ্রাস পায়, জায়গা কম লাগে এবং শিকারী প্রাণী ও চোরের উপদ্রবও হ্রাস পায়। এই প্রকার খাঁচা বা ঘর নির্মাণ করিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন নির্মাণব্যয় বেশী না পড়ে। খাঁচায় আবদ্ধ করিয়া রাখিলে পাখীকে অবশ্যই স্বাচ্ছন্দ্যে ও আরামে রাখিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। গ্রীষ্মকালে পাখীদের ঠাণ্ডা রাখা অনেকক্ষেত্রেই
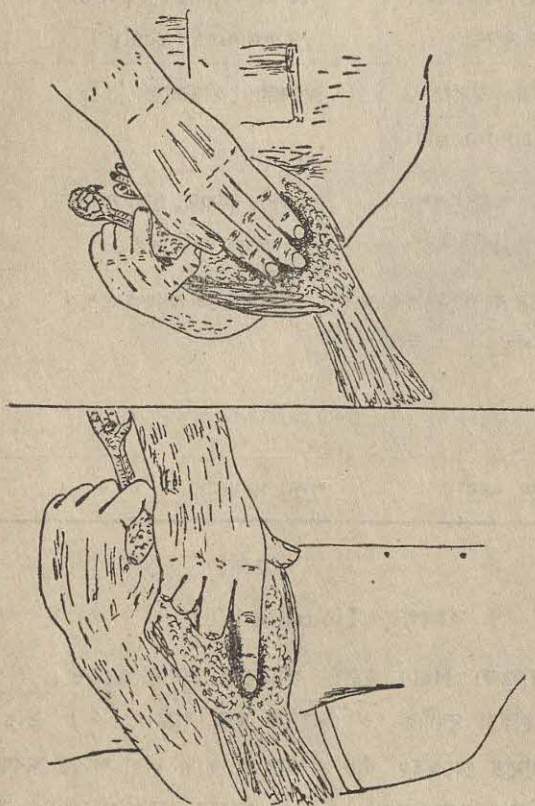
চিত্র নং ৬৩। শ্রোণী হাড়দ্বয়ের মাঝে আঙ্গুল দিয়া অনুভব করিয়া মুরগা নির্বাচন করা যায়। যদি হাড়দ্বয়ের মাঝের ফাঁক তিন আঙ্গুল (বামে) হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে ঐ মুরগী ভালই ডিম দিবে। যদি ঐ ফাঁক (ডাইনে) এক আঙ্গুল হয় তবে ঐ মুরগা ভাল ডিম দিবে না বুঝিতে হইবে এবং তাহাকে বিক্রয় করিয়া দেওয়া উচিৎ। [NAIDU হইতে পুনরঙ্কিত]
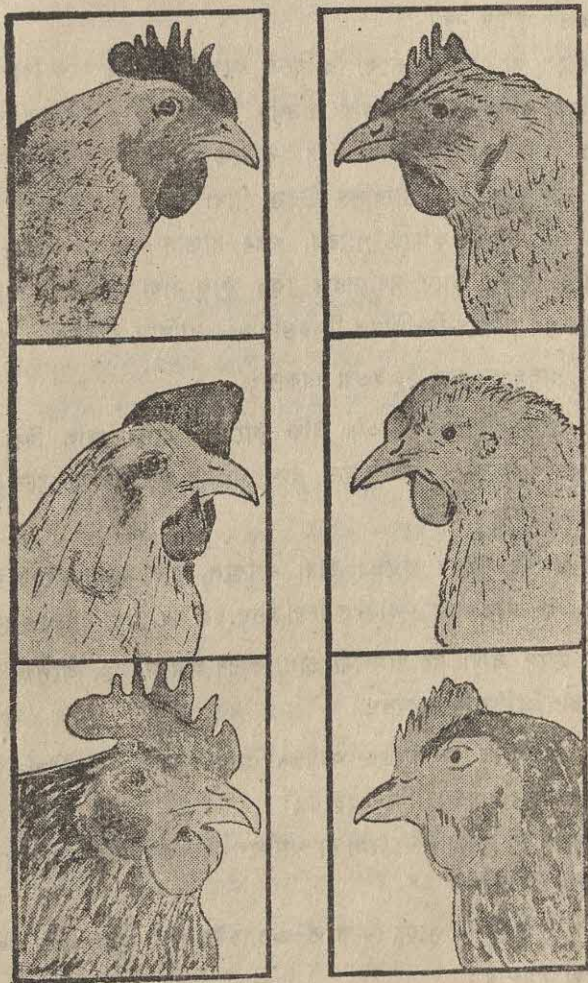
চিত্র নং ৬৪। মাথার অবস্থা দৃষ্টে মুরগা নির্বাচন করা যায়। উপরের দুইটি মুরগা হোয়াইট রক। মাঝের দুইটি হোয়াইট লেগহর্ণ ও নীচের দুইটি নিউ হ্যাম্পশায়ার (New Hampshire) প্রজাতির। প্রত্যেক জোড়ায় বামে অঙ্কিত মস্তকবিশিষ্ট মুরগী ভাল ডিম দেয়, আর ডাইনে অঙ্কিত মস্তকবিশিষ্ট মুরগা ভাল ডিম দেয় না।

[PYNE হইতে পুনরঙ্কিত]

সম্ভব হয় না; কিন্তু পার্বত্য অঞ্চল ব্যতিরেকে অন্যত্র শীতকালে কোনরূপ অসুবিধা হওয়া উচিত নয়।

গ্রীষ্মকালে মুরগীকে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখিতে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হইবে। কি প্রকার বাসগৃহ নির্মাণ করা হইবে সে সম্পর্কে মুরগীপালক গোপালকের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারে। আমাদের দেশে সাধারণত ছাদ উঁচু এবং চারিদিক উন্মুক্ত রাখা হয়। ইহার ফলে সহজে আলো ও বায়ু চলাচল করিতে পারে। গরম বাতাস যাহাতে সহজে নির্গত হইতে পারে সেজন্য ছাদে মধ্যরেখায় কিছু ফাঁক রাখা দরকার। আমাদের দেশে মুরগীর গৃহ নির্মাণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখিতে হইবে :

(১) বাসগৃহের ছাদ উঁচু হওয়া দরকার ;

(২) গৃহের চারিদিক ৩/৪ ইঞ্চি ফাঁকের তারের জাল দিয়া ঘেরা দরকার। প্রবল বায়ু ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য বাঁশ বা চটের বেড়ার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে ;

(৩) ছাদের উপরে গাছের ছায়া থাকিলে ভাল, নতুবা ছাদের উপরে ঘাস বা খড় দিয়া গ্রীষ্মকালে তাহা জল দিয়া ভিজাইয়া ঘর ঠাণ্ডা রাখিতে হইবে ;

(৪) ছাদে সাদা রঙ লাগানো ভাল, কারণ অন্যান্য রঙ অপেক্ষা সাদা রঙ অধিক তাপ প্রতিফলিত করে ;

(৫) গ্রীষ্মকালে জলপাত্রের আয়তন প্রায় দেড়গুণ বাড়াইয়া যথেষ্ট শীতল পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে ;

৬) গ্রীষ্মকালে চারিদিক খোলা না থাকিলে মেঝের উপরে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে ;

৭) অপরাহ্নে মুরগীর গৃহের মেঝেতে জল ছিটানো বা মুরগীগুলির উপরেই জলসিঞ্চন করা দরকার ;

৮) ভোর ৪ টা ৩০ মিনিট হইতে দিনের আলো না ফোটা পর্যন্ত কৃত্রিম আলোকের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কারণ ভোরবেলার শীতল আবহাওয়ায় মুরগী বেশী খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে। দিনে যখন খুব গরম পড়ে তখন মুরগী বেশী খাইতে চায় না ;

৯) নিকটে যদি আর কোন অধিকতর আরামপ্রদ বাসস্থান থাকে, তবে মুরগীগুলিকে ঐ গৃহে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।

মহারাষ্ট্রের আমেদনগর জেলার এক কৃতী মুরগীপালক তাঁহার মুরগীগুলিকে গাছে উপরে থাকিতে দেন। শিকারী প্রাণীদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য গাছের গুঁড়ি বেষ্টন করিয়া তার কাঁটার বেড়া থাকে। ঘরে আবদ্ধ হইয়া থাকা অপেক্ষা রাত্রে গাছের উপর ঘুমানো নিশ্চয়ই মুরগী অধিক পছন্দ করে। মুরগীর বাসগৃহ নানাপ্রকার হইতে পারে। এ সম্পর্কে ৬৫ নং চিত্র বাসগৃহের নমুনা দেখানো হইয়াছে।

বাসগৃহের আয়তন

সকল বয়সের মুরগীর জন্যই মেঝেতে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্থান থাকা দরকার। জায়গা কম হইলে শাবকের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং মুরগীর ডিম উৎপাদন হ্রাস পায়।

মেঝের উপর যদি শাবক পালন করা হয়, তবে শাবক প্রতি এক বর্গফুট জায়গা থাকা দরকার। ৬ সপ্তাহ বয়সে জায়গার পরিমাণ শাবক প্রতি ২ বর্গফুট হওয়া উচিত। বিদ্যুতচালিত' শাবক পালন যন্ত্রে প্রতি তলায় (৩ ফুট × ৬ ফুট) ৫ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত ৭৫ টি শাবক রাখা যায়। পাঁচ সপ্তাহ পরে ইহাদের অপেক্ষাকৃত বড় জায়গায় স্থানান্তরিত করা উচিত।

প্রাপ্তবয়স্ক দেশী বা লেগহর্ণ প্রজাতির জন্য মুরগী পিছু ৩ বর্গফুট এবং রোড আইল্যাণ্ড রেড জাতীয় অপেক্ষাকৃত বড় মুরগী পিছু ৩·৫ বর্গ ফুট জায়গা রাখিলেই চলিবে। মুরগীর গৃহ পরিচালকের বাসস্থানের নিকটবর্তী হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্ধিষ্ণু শাবকদের প্রাপ্তবয়স্ক মুরগী হইতে যতদূরে সম্ভব পালন করা উচিত। বাসগৃহের চতুর্দিকে ছায়া ও ঘাস থাকিলে গৃহ অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে। মুরগীর বাসগৃহের দৈর্ঘ্য পূর্ব-পশ্চিমে হওয়া উচিত। তাহা হইলে গ্রীষ্মকালের সকাল ও বিকেল বেলা মুরগীর গায়ে রৌদ্র কম পড়ে।

আমাদের দেশে বাঁশের তৈরী গৃহের খরচ কম পড়ে। এ প্রকার গৃহ নির্মাণকার্যে যে কাঠের খুঁটি ব্যবহৃত হইবে তাহা সেগুন কাঠের হওয়া বাঞ্ছনীয়। নতুবা তাহা ক্রীয়সোট (creosote) বা আলকাতরা দ্বারা রঙ করিয়া দেওয়া উচিত যাহাতে উই আক্রমণ করিতে না পারে। গৃহের চারিদিকে ২ হইতে ৩ ফুট উঁচু দেওয়ালের উপরে ৩/৪ ইঞ্চি ফাঁকের তারের জাল বা বাঁশের বেড়া দেওয়া যাইতে পারে। চৌকা গৃহ অপেক্ষা লম্বা গৃহে ব্যয় বেশী হয়।

শাবক পালন গৃহ

1. দরজা
2. শাবকদের জন্য পথ
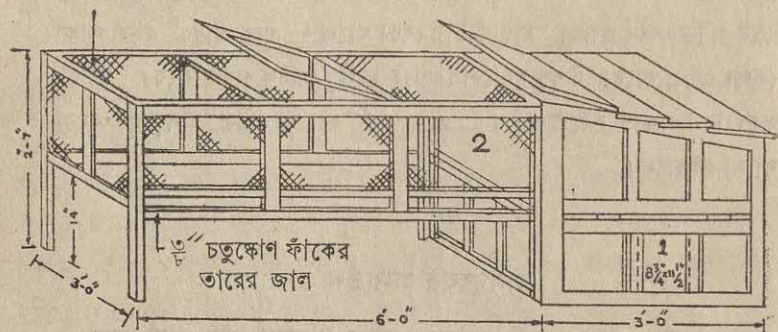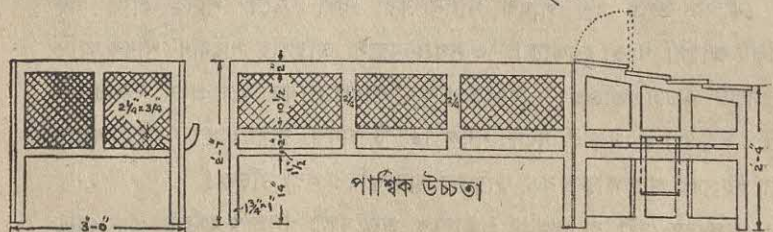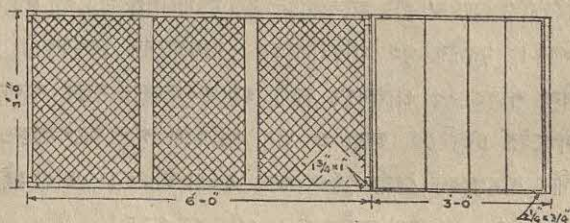
শাবক পালন গৃহ

ছাদের নক্সা

চিত্র নং ৬৫। নূতনদিল্লীস্থ ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ কর্তৃক পরিকল্পিত উপরে অঙ্কিত ভ্রাম্যমান শাবক পালন গৃহপালক নিজেই তৈয়ারি করিতে পারেন এবং ইহাতে ৫০ হইতে ১০০টি শাবক পালন করা যায়। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক মুরগী হইতে কীট ও রোগসংক্রমণ এবং চোর শিকারী পাখী, ইঁদুর প্রভৃতি হইতে ঐরূপ গৃহে শাবকেরা রক্ষা পায়। সামনে তারের জাল দিয়া ঘেরা অংশ এবং পিছনে শীতকালে শাবককে উষ্ণ রাখিবার জন্য আলোসম্বলিত একটি বাক্স লইয়া ঐ শাবক পালনগৃহ গঠিত। [ICAR পুস্তিকা নং ৮৬,১৯৫৭ হইতে সংগৃহীত]
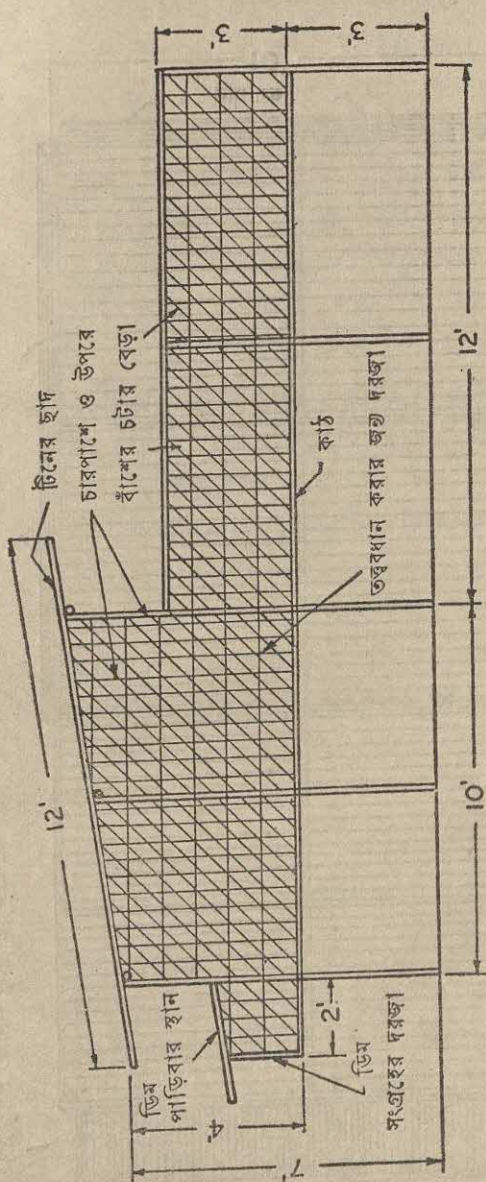
চিত্র নং ৬৬। ১০০টি প্রাপ্তবয়স্ক মুরগার উপযোগী সূর্যালোকিত বারান্দাসহ বাঁশের তৈয়ারী মুরগার গৃহ। লোহার টিনের চালের স্থলে খড়ের ছাউনি এবং বাঁশের বেড়ার স্থলে লোহার জাল ব্যবহার করা যায়। গৃহের সম্মুখে ও পার্শ্বে খাদ্য ও জলপাত্র স্থাপন করা যায়। মেঝের নক্সার জন্য ৬৬(ক) নং চিত্র দেখুন।
[EARL N. MOOR মহাশয়ের সৌজন্যে]
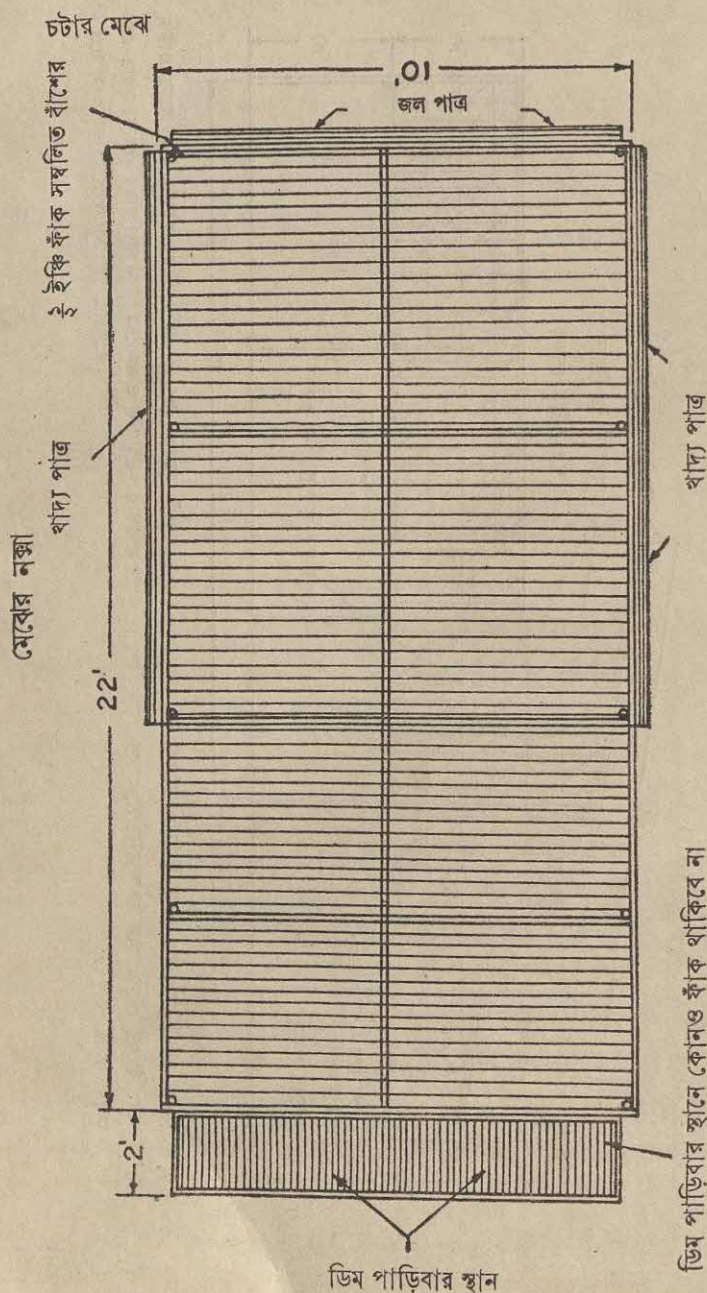
চিত্র নং ৬৬(ক)। ১০০টি প্রাপ্তবয়স্ক মুরগীর উপযোগী সূর্যালোকিত বারান্দাসহ বাঁশের তৈয়ারী মুরগার গৃহের মেঝের নকসা (পার্শ্ব নকসার জন্য ৬৬নং চিত্র দেখুন)। (অনেকে আধ ইঞ্চির বদলে এক ইঞ্চি দূর দূর বাঁশ পাতিবার পক্ষপাতী)। [EARL N. MOORE মহাশয়ের সৌজন্যে]

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১০ ফুট চওড়া ও ১০০ ফুট দীর্ঘ গৃহে ১০০০ বর্গফুট মেঝের জন্য ২২০ রৈখিক ফুট ভিত নির্মাণ করিতে হইবে। অপরপক্ষে ২০ ফুট চওড়া ও ৫০ ফুট দীর্ঘ গৃহের ১০০০ বর্গফুট মেঝের জন্য মাত্র ১৪০ রৈখিক ফুট ভিতের প্রয়োজন হয়। সরু গৃহ অপেক্ষা চওড়া গৃহ অপেক্ষাকৃত শীতল হয় (চিত্র নং ৬৬ ও ৬৭)।

১০ হইতে ২৫ টি মুরগীর খাঁচা আমাদের দেশে জনপ্রিয় হইতে পারে।

১৫ হইতে ৭৫ টি মুরগী থাকিতে পারে স্থায়ী চড়িবার স্থান সহ এরূপ স্থায়ী মুরগীর গৃহ আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায়। এ সকল গৃহে প্রায়ই পরজীবী ও রোগের উপদ্রব হয়। গৃহের উঠানে প্রায়ই কোন ঘাস থাকে না; মুরগীগুলি কীট অধ্যুষিত ঐ উঠানেই চরিয়া বেড়ায় ও রোগাক্রান্ত হয়। এ প্রকার গৃহের নির্মাণ ও মুরগী পালন ব্যয় বেশী বলিয়া এবং রোগের উপদ্রব বেশী হয় বলিয়া বহুদেশে এ প্রকার গৃহ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

অপেক্ষাকৃত বড় আকারের ঘরে ১ হইতে ৫ ইঞ্চি পুরু করিয়া খড় বিছাইয়া ঘরে আবদ্ধ রাখিয়া মুরগী পালনে খরচ অনেক কম পড়ে। ধানের তুষ, খড়, চীনাবাদামের খোসা, পাতা, নিংড়ানো আখ, কাঠের গুঁড়া বা এসকল পদার্থের মিশ্রণ মেঝেতে ছড়ানো যায়। এক বৎসর ধরিয়া এ সকল পদার্থ পাখীর মলের সহিত মিশ্রিত হয় এবং ধীরে ধীরে পচিতে আরম্ভ করে। ক্রমে ইহা উত্তম সারে পরিণত হয়। গো-মহিষের খাদ্য হিসাবেও ইহা ব্যবহার করা যায়। ইহা প্রোটিনে সমৃদ্ধ এবং খাদ্যমান তুলাবীজ বা চীনাবাদামের খইলের সমতুল্য।

সরঞ্জাম

মুরগী পালনে যথাযথ সরঞ্জামের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যথাযথ খাদ্য পাত্র ব্যবহৃত না হইলে খাদ্যের অপচয় হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ত্রুটিপূর্ণ খাদ্য পাত্র ব্যবহারের ফলে মুরগীর খাদ্য মিশ্রণের এক-তৃতীয়াংশ নষ্ট হইতে পারে। শাবকেরা যাহাতে খাদ্য ঠোকরাইয়া বাহিরে ফেলিতে না পারে সেজন্য খাদ্যপাত্র যথেষ্ট গভীর হওয়া আবশ্যক। খাদ্যপাত্রের এক-তৃতীয়াংশ হইতে অর্ধাংশের বেশী ভর্তি না করিলে খাদ্যের অপচয় হ্রাস পায়। খাদ্যপাত্রের উপরে তারের সংলগ্ন রোলারের জন্য মুরগী খাদ্য পা দিয়া ছড়াইতে পারে না।

মুরগী পালনে ন্যূনতম ব্যয় হয় জল সরবরাহে। শীতল, টাটকা ও বিশুদ্ধ
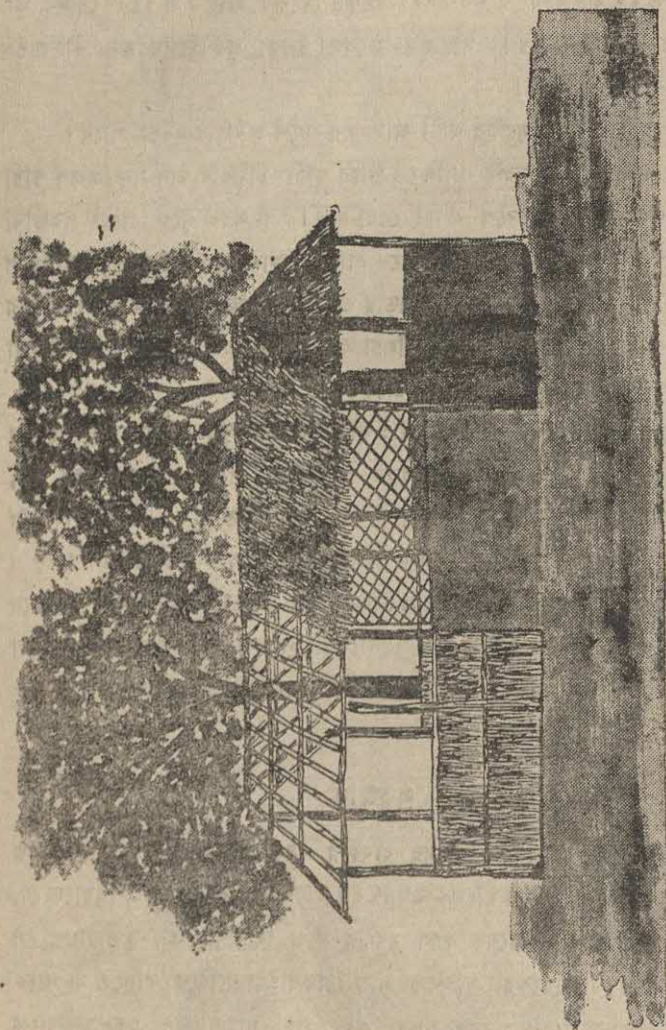
চিত্র নং ৬৭। গাছের ছায়াতে নির্মিত বাঁশের তৈয়ারী মুরগীর গৃহ এদেশের অধিকাংশ অঞ্চলের পক্ষে আদর্শ। চিত্রে অঙ্কিত গৃহটির নির্মাণ সম্পূর্ণ হয় নাই।
[EARL N. MOORE মহাশয়ের সৌজন্যে]

জল যাহাতে সকল সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। খাদ্য অপেক্ষা ওজনে দ্বিগুণ জল মুরগী পান করে।

মাটির জলপাত্র সকল গ্রামে পাওয়া যায়, দামেও সস্তা। এরূপ পাত্রে জল পরিষ্কার ও শীতল থাকে। মুরগীর পাল বড় হইলে লম্বা লোহার জলপাত্র ব্যবহার করা যাইতে পারে, কারণ তাহাতে প্রত্যেক মুরগীর জলপানের যথেষ্ট জায়গা থাকে। জলের একটি সরু ধারা সারাক্ষণ ধরিয়া পাত্রে গড়াইলে সারা দিন ধরিয়া সকল বয়সের মুরগী বিশুদ্ধ ও টাটকা জল পায়। ইহাতে শ্রমিক ব্যয়ও হ্রাস পায়। জলের সরবরাহে ঘাটতি থাকিলে বড় মুরগী পালন কেন্দ্রে ফ্লোট বাল্‌ব (float valve) সহ স্বয়ংক্রিয় জলপাত্র ব্যবহার করা যাইতে পারে। সারাদিন ধরিয়া পর্যাপ্ত পরিমাণে মুরগীকে জল সরবরাহ করিতে হইবে, কারণ মুরগী একবারে জল কম পান করিলেও ঘন ঘন জলপান করে।

সংক্ষিপ্তসার

যথাযথভাবে খাওয়াইতে এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে পালন করিতে পারিলে হোয়াইট লেগহর্ন ও রোড আইল্যাণ্ড রেড প্রভৃতি উন্নত প্রজাতির মুরগী বৎসরে ১৫০ হইতে ২৫০ পর্যন্ত ডিম দেয়। দেশী মুরগী বৎসরে গড়ে মাত্র ৫৩টি ডিম দেয়। এই অধ্যায়ে বর্ণিত উপায়ে পালন করিতে পারিলে দেশী এবং উন্নত, উভয় শ্রেণীর মুরগীরই উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। উন্নত প্রজাতির মুরগীর ডিমের ওজন দেশী মুরগীর ডিম অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ। সম্প্রতি আমাদের দেশে মুরগীকে উন্নত করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে।

বহু শতাব্দী পূর্ব হইতে ভারতে মুরগী পালন প্রচলিত। নানা কারণে এই পালন পদ্ধতিকে আধুনিক করিয়া তোলা উচিত। মুরগী পালন আমাদের দেশের অবস্থায় বিশেষভাবে উপযোগী ; কারণ ইহাতে জমি কম লাগে ; ইহা আরম্ভ করিতে টাকা বেশী লাগে না ; তিন হইতে ছয় মাসের মধ্যে আয় হইতে আরম্ভ করে ; অবসর সময় লাভজনকভাবে যাপন করা যায় ; তণ্ডুল বহুল খাদ্যকে ডিম প্রোটিনে সমৃদ্ধ করে ; প্রতি পাউণ্ড মাংস উৎপাদনে অন্যান্য যে কোন প্রাণী অপেক্ষা মুরগী কম খাদ্য গ্রহণ করে ; আমাদের দেশে প্রজননের উপযোগী যথেষ্ট মোরগ মুরগী আছে ; মুরগী পালনে ব্যবহার করা যায় এরূপ বহু উপজাত বর্তমানে নষ্ট হয় ; মাংস ও ডিমের দাম, বিশেষ

করিয়া বৃহৎ শহরের নিকটে, মুরগী পালন লাভজনক হইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

প্রজননের অনুপযোগী এবং স্বল্প উৎপাদনশীল মুরগী অপসারণ করিয়া মুরগী পালনে লাভ বৃদ্ধি করা যায়। মুরগী পালনকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিলে এই বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।

• সকল মুরগী যাহাতে একসঙ্গে খাইবার জায়গা পায়, এরূপ বড় খাদ্যপাত্রের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। খাদ্যপাত্র যথেষ্ট গভীর হওয়া দরকার যাহাতে পাত্রে পর্যাপ্ত খাদ্য থাকে। উপযোগী খাদ্য পাত্রের অর্ধাংশের বেশী ভর্তি করা উচিত নয়, যাহাতে খাদ্যের অপচয় হ্রাস পায়। মুরগী যাহাতে সকল সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পায় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কারণ সকল পোষক পদার্থের ইহাতেই সবচাইতে ব্যয় কম হয় এবং গ্রীষ্মকালে মুরগীকে শীতল রাখিতে ইহা সাহায্য করে।

প্রশ্ন

১। কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটানো ও শাবক পালনের সুবিধা কি?

২। গ্রীষ্মকালে মুরগীকে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখিতে যে ৯টি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে তাহা লেখ।

৩। শাবকের তদারকি ব্যবস্থায় কোন কোন বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে?

সহায়ক পুস্তক

American Poultry Association, Inc, '*American Standard of Perfection*, Station A, Box 104, Atlanta, Georgia, U.S.A., 1958.

Biester, H. E. and L. H. Schwarte, '*Diseases of Poultry*' Iowa State College Press, Ames, Iowa, U.S.A., 1952.

Bose, S., *Indian Poultry Gazette*, Poultry Research Division, Indian Veterinary Research Instititute, Izatnagar, U. P.

Botsford, Harold E., *The Economies of Poultry Management*, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1952.

Hartman, R. C., *Keeping Chickens in Cages*. Roland C. Hartman Redlands California, U.S.A., 1951.

Hutt, F. B., *Genetics of the Fowl,* McGraw-Hill Book Company, Inc.. New York. 1949.

Jull, M. A., *Poultry Husbandry,* McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, 1951.

Marsden, Stanley J,, and J. Holmes Martin, *Turkey Management,* The Interstate, Danville, Illinois, U.S.A., 1955.

Naidu, P. M. N , *Keeping Poultry in India,* Indian Council of Agricultural Research, New Delhi. 1959.

Payne,L. F., and T. B. Avery, *International Poultry Guide for Flock Selection,* American Poultry and Hatchery Federation, Kansas City, Missouri, U. S. A., 1950

Randhawa, M. S., *Agriculture and Animal Husbandry in India* Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, 1958.

Romanoff, Alexis, and Anastasia J. Romanoff, *The Avian Egg,* John Wiley & Sons, Inc., New York, 1949.

Snyder, John M., Olin A. Rowoth, John C. Scholes and Clarence E. Lee, *Profitable Poultry Management, Duck Management and Turkey Management* Beacon Milling Co , Cayuga, New York, 1958.

Taylor, L. W., *Fertility and Hatchability of Chicken and Turkey Eggs,* John Wiley & Sons, Inc., New York, 1949.

Winter. A. R. and Funk, E. M., *Poultry Science and Practice,* J. B. Lippincott Company, Philadelphia, Pennsylvania. U. S. A., 1951

Wirthmore Poultry Service Department, *Timely Topics on Poultry Management,* 12th Edition, Charles M. Cox Co., Boston, Massachusetts, U. S. A., 1956.

চতুর্দশ অধ্যায়

হাঁস-মুরগীকে খাওয়ানো, তাহাদের স্বাস্থ্য ও বিপণন

(Poultry-Feeding, Health, and Marketing)

মুরগী পালনে খাদ্যের ব্যয়ই সর্বাপেক্ষা বেশী, কারণ সমস্ত ব্যয়ের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ হইল খাদ্যের জন্য ব্যয়। আমাদের দেশে মুরগী পালনকে উন্নত করিতে হইলে মুরগীর খাদ্যের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হইবে। অতীতকালে ৫—১০ টি মুরগীর দল তাহাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রামের আশ পাশ হইতে সংগ্রহ করিত। অবশ্য বৎসরের কোন কোন সময়ে তাহারা নিজেদের শরীর বজায় ও ডিম উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যের সংস্থান করিতে পারিত না। গ্রামবাসীরা প্রায়ই নালিশ করিতেন যে তাঁহাদের মুরগীরা শুষ্ক ও গ্রীষ্ম ঋতুতে ডিম দেয় না। তাহার প্রধান কারণ, ডিম উৎপাদনের উপযোগী ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য মুরগী ঐ ঋতুতে সংগ্রহ করিতে পারিত না। ঐ ঋতুতে প্রায়ই কোন টাটকা সবুজ খাদ্য পাওয়া যায় না, খাইবার জন্য কীটপতঙ্গও বেশী পাওয়া যায় না। এমন কি প্রয়োজনীয় পরিমাণ জলের অনেক সময় অভাব দেখা দেয়।

গ্রামের মুরগীর পালগুলিকে আরও বড় করা উচিত এবং প্রত্যেক দলে ১০ হইতে ৫০টি বা ততোধিক মুরগী রাখা উচিত। উন্নততর পরিচর্যা ও খাদ্য প্রদানের ফলে মুরগীর বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত দ্রুত হইবে এবং ডিম উৎপাদনও বাড়িবে। ফলে আয়ও তদনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে।

মুরগীকে দৈনিক প্রয়োজনীয় পরিমাণ সুষম খাদ্য দিলেই মুরগী পালনে সর্বোচ্চ লাভ করা যায়। মুরগীর প্রয়োজনীয় পরিমাণ অপেক্ষা কম খাদ্য দিলে মুরগী পালনে আয়ও হ্রাস পায়। বুদ্ধিমান মুরগীপালক চেষ্টা করেন যাহাতে মুরগী

যত বেশী সম্ভব খাদ্য গ্রহণ করে, কারণ, তিনি জানেন যে মুরগীর সুষম খাদ্য সীমিত করা 'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো' নীতির সমান।

মুরগীকে খাওয়ানো বিজ্ঞান বিশেষ

গত একশ বৎসরে মুরগীকে খাওয়ানোয় যে অগ্রগতি হইয়াছে, আমাদের দেশে আগামী দশ বৎসরে ঐ পরিমাণ অগ্রগতি হওয়া দরকার। কারণ, আজও অনেকক্ষেত্রে মুরগীকে সারাদিন তাহার খাদ্যের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, কেবল রাত্রে সামান্য পরিমাণ শস্য বা ভূষি খাইতে দেওয়া হয়। পরিমিত পরিমাণে সুষম খাদ্য দিলে যে আয় বাড়ে, সে সম্পর্কে গ্রামে আজও বিশেষ চিন্তা করা হয় না।

এদেশের উপযোগী সুষম খাদ্য মিশ্রণ আজ আমাদের হাঁস-মুরগী সম্পর্কে গবেষণা কর্মীদের গবেষণার বিষয়। তাঁহারা এমন খাদ্য মিশ্রণের সন্ধানে আছেন যাহাতে ব্যয় খুব কম হয় কিন্তু মুরগীর দ্রুত বৃদ্ধি হয় এবং ডিম উৎপাদনও সর্বোচ্চ হয়। গ্রামের মুরগীদের সারাদিন অতি সামান্য খাদ্যের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ানো অপেক্ষা ইহা অনেক ভাল। মুরগী যাহাতে প্রতিদিন বা একদিন অন্তর ডিম প্রসব করিতে পারে তদনুযায়ী খাদ্য না দেওয়ার কারণ কি থাকিতে পারে? যে সকল ঋতুতে গ্রামে টাটকা সবুজ খাদ্য, কীটপতঙ্গ ও শস্যের প্রাচুর্য থাকে মুরগী ডিম ভালই দেয়; কিন্তু বৎসরের কয়েক মাসেই মাত্র এরূপ ডিম পাওয়া যায়। কিন্তু যথাযথভাবে পরিচর্যা ও খাদ্য প্রদান করিলে উন্নত জাতের মুরগী বৎসরের প্রায় সকল সময়ই ডিম প্রসব করিয়া থাকে।

মুরগীর পুষ্টি দ্রুত একটি বিজ্ঞানে পরিণত হইতে চলিয়াছে; কারণ গবেষকগণ কর্তৃক তৈরী ছক হইতে জানা যায়, সর্বোচ্চ উৎপাদন পাইতে হইলে কোন কোন পোষক পদার্থ কত পরিমাণে সরবরাহ করা আবশ্যক এবং সে পরিমাণ পোষক পদার্থ কত পরিমাণ কোন খাদ্য হইতে পাওয়া যাইবে। বিভিন্ন দ্রব্য চূর্ণ ও মিশ্রিত করিয়া **সুষম খাদ্য** প্রস্তুত করা যায়। খাদ্যের কোন অংশ অপচয় না করিয়া দেহের সকল ক্রিয়া যথাযথভাবে সুসম্পন্ন করিতে যে সকল পোষক পদার্থ আবশ্যক, খাদ্যে ঐ সকল পোষক পদার্থ থাকিলে তাহাকে **সুষম খাদ্য** বলা যায়।

কোন খাদ্যে যদি কেবল খনিজ পদার্থ থাকে তবে তাহাতে দেহের ক্ষয়প্রাপ্ত

কোষসমষ্টি পুনর্গঠন করিবার জন্য কোন প্রোটিন থাকে না, শক্তি সরবরাহ করিবার জন্য কোন কার্বোহাইড্রেট থাকে না এবং দেহের বিভিন্ন প্রক্রিয়া চালু রাখিবার জন্য কোন ভিটামিন থাকে না। খাদ্যে যদি খনিজ পদার্থ ব্যতীত অন্যান্য সকল পদার্থ থাকে তবে তাহাতে হাড়ের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ এবং ডিম গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালশিয়াম (calcium) থাকে না। সঠিক অনুপাতে সকল পোষক পদার্থ সরবরাহ করিলে তবেই মুরগী পালনে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়। মুরগী পালকদের ব্যবহারের জন্য ঐ প্রয়োজনীয় তথ্য কেবল মুরগীর খাদ্য সম্পর্কে গবেষকগণই সরবরাহ করিতে পারেন।

সম্পূর্ণ ডিম গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ পদার্থ, খনিজ পদার্থ ও সকল ভিটামিন উপস্থিত থাকিলে তবেই মুরগী ডিম প্রসব করিবে। মনে রাখিতে হইবে যে ডিম শাবক উৎপাদনের প্রাকৃতিক মাধ্যম। ডিমের ভিতরে সুদীর্ঘ ২১ দিন ধরিয়া যে শাবক বৃদ্ধি পায় তাহার প্রয়োজনীয় খাদ্য ডিম সরবরাহ করে। এই তিন সপ্তাহ পরে ডিম হইতে শাবক নির্গত হয়। ডিমের খোলস ভাঙ্গিয়া বাহির হইতে শাবকের প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয়। ডিম হইতে বাহির হইবার পরে শাবককে তাহার নিজের জীবিকা অর্জনের জন্য তৈরী থাকিতে হয় (৬৮ নং চিত্র)। অপরিহার্য সকল পোষক পদার্থ ডিম সরবরাহ করিতে না পারিলে, ডিম হইতে শাবক নির্গত হইবে না।

কেবল কোন এক প্রকার খাদ্য খাওয়াইলে ডিম উৎপাদনে কিরূপ ফল হইবে তাহার তুলনামূলক আলোচনা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, মুরগীকে কেবল গম খাওয়ানো হইল। তাহা হইতে প্রতি তিনদিনে একটি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় পরিমাণ প্রোটিন পাওয়া যাইবে ; প্রতি বার দিনে একটি ডিম উৎপাদনের প্রয়োজনীয় পরিমাণ ক্যালশিয়ম পাওয়া যাইবে এবং প্রতিদিনে তিনটি ডিম উৎপাদনের প্রয়োজনীয় পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট পাওয়া যাইবে।

যদি কেবল ১০০ পাউণ্ড ভুট্টা খাওয়ানো হয়, তবে মুরগী ২২৫টি ডিমের কুসুম তৈয়ারী করিতে পারিবে ; কিন্তু মাত্র ১৩৪টি ডিমের সাদা অংশ তৈয়ারী করিতে সক্ষম হইবে। যদি কেবল ১০০ পাউণ্ড মাংসের শুষ্ক গুঁড়া খাওয়ানো হয় তবে তাহা হইতে ১০৬টি ডিমের কুসুমের প্রয়োজনীয়
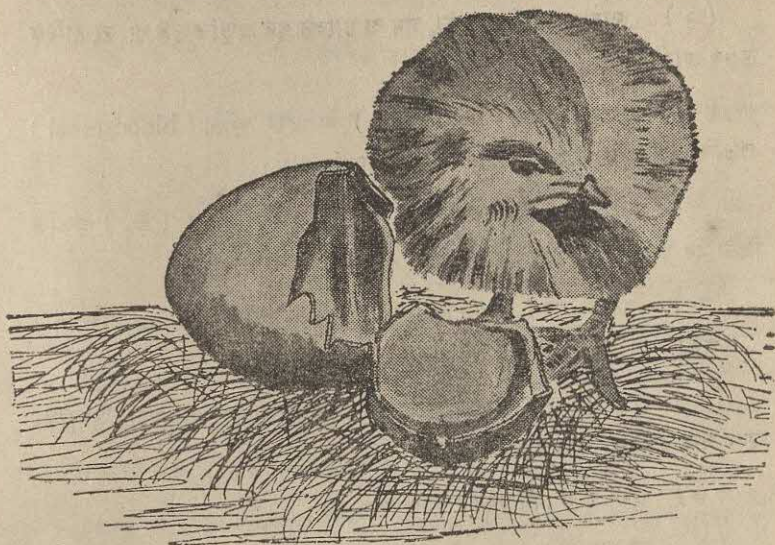
চিত্র নং ৬৮। ২১ দিন ধরিয়া ডিম শাবককে প্রয়োজনীয় খাদ্য যোগায়। খোলস হইতে নির্গত হইবার পরেই, শাবক নিজের খাদ্য নিজে খুঁটিয়া খাইবার শক্তি ধরে।

[NAIDU হইতে পুনরঙ্কিত]

পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট কিন্তু ১১০০টি ডিমের সাদা অংশের প্রয়োজনীয় প্রোটিন পাওয়া যাইবে। কেবল গম বা ভুট্টা খাওয়াইলে কার্বোহাইড্রেটের অপচয় হইবে, এবং কেবল মাংসের গুঁড়া খাওয়াইলে প্রোটিনের অপচয় হইবে। বিভিন্ন পোষক পদার্থের মধ্যে সমতা থাকা প্রয়োজন; তাহা হইলে ডিম উৎপাদন ও দেহের বৃদ্ধির জন্য খাদ্য যথাযথভাবে ব্যবহৃত হইবে।

সুষম খাদ্য তৈয়ারী করিবার পূর্বে বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের মূল্য বিবেচনা করিতে হইবে। যেমন, দক্ষিণ ভারতে ট্যাপিওকার বর্জ্য অংশ এবং কোপড়া (নারিকেলের খইল) সস্তা; কাজেই ঐ অঞ্চলে চাউলের কুঁড়া ও চীনা-বাদামের স্থলে মুরগীর খাদ্যে ঐ সকল দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত করা যায়। উত্তর ভারতে গম ও ঝোলাগুড় এবং মধ্য ভারতে জোয়ার ও চীনাবাদামের খইল অপেক্ষাকৃত সস্তা ও সহজে পাওয়া যায়।

সাধারণভাবে বলা যায়, মুরগীর সুষম খাদ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত:

(১) জোয়ার, রাগি, ভুট্টা, গম বা চালের খুদ প্রভৃতি দুই বা ততোধিক তণ্ডুল জাতীয় শস্য ;

(২) মাংসের গুঁড়া (fish meal) বা রক্ত গুঁড়া (blood meal) প্রভৃতি এক বা একাধিক প্রাণীজ প্রোটিন জাতীয় খাদ্য ;

(৩) এ্যা, ডি$_{৩}$, রিবোফ্ল্যাবিন (বি$_{২}$) riboflavin (B_2) প্রভৃতি ভিটামিন অতিরিক্ত ভিটামিন যোগাইবার উপযোগী কোন খাদ্য ;

(৪) পেনিসিলিন (penicillin) বা অরিওমাইসিন (aureomycin) প্রভৃতি যে কোন বীজঘ্ন (antibiotic) ঔষধ ;

(৫) কয়েকটি দ্রব্য মিশাইয়া খাদ্য তৈয়ারী অপেক্ষা বহু দ্রব্য মিশাইয়া সুষম খাদ্য তৈয়ারী করা বাঞ্ছনীয় ;

(৬) সুষম খাদ্য যেন মুরগীর পক্ষে স্বাদু হয় ;

(৭) ময়দার ন্যায় সূক্ষ্ম গুঁড়া অপেক্ষা মুরগীর খাদ্য একটু বড় আকারের গুঁড়া হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মুরগীকে খাওয়ানো শিল্প বিশেষ

গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে মুরগীর সুষম খাদ্য তৈয়ারী বিজ্ঞানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। মুরগীকে খাওয়ানোরও রীতি আছে। ইহা একটি শিল্প (art) বিশেষ। মুরগীর সর্বোচ্চ বৃদ্ধি ও মুরগী হইতে সর্বোচ্চ উৎপাদন পাইতে হইলে মুরগীকে সর্বোচ্চ পরিমাণ খাদ্য খাওয়াইবার জন্য যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয় সেগুলি শিল্প বিশেষ।

দেখা গিয়াছে যে সর্বোত্তম মুরগীটি সর্বাপেক্ষা বেশী খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে সাধারণ মুরগীকেও যদি বেশী খাদ্য গ্রহণ করানো যায়, তবে তাহাদের পালন আরও লাভজনক হইবে।

খাওয়ানোর পদ্ধতি (**Feeding Practices**)

কৃত্রিম আলোর ব্যবহার, খাদ্যচূর্ণ (mash) ও আধভাঙ্গা শস্যের যথাযথ মিশ্রণ এবং খাদ্য মিশ্রণ তৈরী প্রভৃতি খাওয়ানোর পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।

কৃত্রিম আলো

শীতকালের ছোট দিনগুলিতে ভোরবেলা ও সন্ধ্যাবেলা কৃত্রিম আলো ব্যবহার করিলে মুরগী বেশী খাদ্য গ্রহণ করে এবং ডিমও বেশী দেয়। অপর কথায় বলা যায়, আলোক হেতু উদ্দীপনা, অধিক খাদ্য ও জল গ্রহণের ফলে ডিমের উৎপাদন কমপক্ষে শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে যে, শীতকালে ডিমের উৎপাদন বাড়াইতে হইলে ১৩ বা ১৪ ঘন্টাব্যাপী দীর্ঘ দিনের দরকার। এজন্য বিজলী বাতি (২০ হইতে ১০০টি মুরগীর জন্য ২৫ ওয়াটের ২টি বাতি), পেট্রোল লণ্ঠন বা হারিকেন লণ্ঠন ব্যবহার করা যাইতে পারে। আলো খাদ্য ও জলের নিকটে রাখা দরকার যাহাতে মুরগী খাদ্য ও পানীয় জল দেখিতে পায়।

মহারাষ্ট্র রাজ্যের নাগপুরে দুইজন মুরগীপালক শীতকালে সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ৮টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত আলো জ্বালাইয়া রাখেন। ফলে ঐ সময়ে শতকরা ৭০ ভাগ ডিম উৎপাদিত হয়। অন্যান্য মুরগীপালক ঐ সময়ে শতকরা মাত্র ১০ হইতে ২৫ ভাগ ডিম পাইয়া থাকেন। শতকরা ৩০ ভাগের কম ডিম উৎপন্ন হইলে বুঝিতে হইবে মুরগীরা যথাযথ উৎপাদন করিতেছে না। (শতকরা ৭০ ভাগ ডিম উৎপাদনের অর্থ ১০০ টি মুরগী হইতে দৈনিক ৭০ টি ডিম উৎপাদন)।

ভোরবেলা ৪টা ৩০ মিনিট হইতে দিনের আলো না ফোটা পর্যন্ত এবং সন্ধ্যাবেলা সূর্যাস্ত হইতে ৮টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত আলো জ্বালানো উচিত। ঠিক কোন সময়ে আলো জ্বালাইতে হইবে তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। নাগপুরেই অপর একজন মুরগীপালক শীতকালে সারা রাত ক্ষীণ আলো জ্বালাইয়া শতকরা ৬০ ভাগের বেশী ডিম পাইয়াছেন। প্রত্যেক রাত্রে ঠিক একই সময়ে আলো জ্বালানো দরকার। এবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রতিদিন ঠিক একই সময়ে যদি আলো জ্বালা না হয়, তবে এই আলো জ্বালানোর কোন উপকার হইবে না। কোন এক বা দুই রাত্রে আলো না জ্বালাইলে পরের দিন অবশ্যই ডিম উৎপাদন হ্রাস পাইবে। অনিয়মিতভাবে আলো ব্যবহার করিলে মুরগী ডিম উৎপাদন বন্ধও করিয়া দিতে পারে, আংশিকভাবে তাহার পালক খসিয়া পড়িতে পারে এবং এক নাগাড়ে দুই বা ততোধিক মাস ডিম প্রসব বন্ধ করিয়া দিতে পারে। নিয়মিতভাবে আলো জ্বালাইলে তবেই সুফল আশা করা যায়।

মুরগীকে অধিক উৎপাদনে উৎসাহিত করিবার অপর পদ্ধতি হইল দুপুরবেলা

ভিজা খাদ্যচূর্ণ প্রদান করা। শুষ্ক খাদ্যচূর্ণে জল মাখিয়া যে আর্দ্র ঢেলা তৈরী হয় মুরগী তাহা পছন্দ করে। মুরগী ২০ মিনিটে যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে, কেবল ঐ পরিমাণ খাদ্যই প্রদান করা সঙ্গত। খাদ্যপাত্রে আর্দ্র খাদ্যচূর্ণ রাখিতে হইবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে সকল মুরগী একসঙ্গে খাইবার জন্য যেন যথেষ্ট জায়গা থাকে।

খাদ্যচূর্ণ ও আধভাঙ্গা শস্যের মিশ্রণ

সাধারণভাবে বলিতে গেলে, মুরগীর সম্মুখে সারাদিন খাদ্যচূর্ণ রাখিয়া দিয়া অভিজ্ঞ মুরগীপালক মুরগীকে অধিক খাওয়াইতে পারেন। আধঘন্টার মধ্যে মুরগী যে পরিমাণ দানাশস্যের মিশ্রণ খাইতে পারিবে তাহা সন্ধ্যা হইবার একঘন্টা পূর্বে সম্পূর্ণরূপে খাওয়াইতে হইবে। ভুট্টা, জোয়ার, চাউলের খুদ, বাজরা বা রাগি, গম, ধান প্রভৃতির মধ্যে ন্যূনপক্ষে দুইটি খাওয়ানো ভাল। দেখিতে হইবে কোনটি দামে সস্তা।

অভিজ্ঞ মুরগীপালক খাদ্যপাত্রে সারাদিন খাদ্য রাখিয়া দেন এবং মাঝে মধ্যে যখনই ডিম সংগ্রহ করিতে যান, তখন অবশিষ্ট খাদ্য ঘাঁটিয়া দেন এবং প্রয়োজন-বোধে আরও খাদ্য যোগ করেন। অপরাহ্নে মুরগী টাটকা সবুজ খাদ্য পছন্দ করে। মুরগীকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে অবশ্যই সবুজ খাদ্য দেওয়া উচিত। তবে ঐ খাদ্য দামে পোষায় কিনা তাহা বিবেচনা করিতে হইবে।

খাদ্য মিশ্রণ তৈরী

উপাদানগুলি সস্তা কিনা, সুলভ কিনা এবং সুষম কিনা-খাদ্য মিশ্রণ তৈরীতে এই বিষয়গুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মহারাষ্ট্র রাজ্যের নাগপুর পশুচিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে 'গ্রামের মুরগীর খাদ্যের' সহিত মানুষের অখাদ্য দ্রব্য হইতে তৈরী 'উপজাত মুরগীর খাদ্যের' তুলনা করিয়া গবেষণা করা হয়। দেখা যায় যে, চার সপ্তাহের মধ্যে 'উপজাত খাদ্য' খাইয়া মুরগীর ওজন, গ্রামের খাদ্য খাওয়া মুরগী অপেক্ষা পৌনে তিনগুণ (২·৭৫ গুণ) বৃদ্ধি পাইয়াছে। উভয় খাদ্য তৈরীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ১নং তালিকায় প্রদত্ত হইল।

১নং তালিকা

আমাদের দেশে মুরগীর গ্রামের সাধারণ খাদ্য ও উপজাত-খাদ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্যের পরিমাণ

বিভিন্ন দ্রব্য	গ্রামের সাধারণ খাদ্য (পাউণ্ডে)	অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট উপজাত-খাদ্য (পাউণ্ডে)
ভুট্টা, জোয়ার বা গম	১৫	—
গমের ভূষি	৪০	৬
ছোল চুনি	১৫	—
চাউলের কুঁড়া	১০	—
চাউল ছাঁটাই উপজাত	—	২০
ঝোলা গুড়	—	২০
চীনাবাদামের খইল	১৯	৩০
মৎস্য চূর্ণ	—	৩
যকৃৎ চূর্ণ	—	৩
রক্ত (রৌদ্রে শুষ্ক)	—	৪
পেনিসিলিন (penicillin) ছত্রাকদেহের বর্জ্য অংশ	—	৫
সবুজ খাদ্য (ছায়াতে শুকানো)	—	৬
খনিজ পদার্থের মিশ্রণ	১	৩
সাংশ্লেষিক (synthetic) ভিটামিন		
অ্যা (A)	—	০·৭ গ্রাম
বি$_২$ (B_2) (riboflabin)	—	০·১৮ ,,
ডি$_৩$ (D_3)	—	০·২২ ,,
মোট ওজন (পাউণ্ড)	১০০	১০০

খনিজ পদার্থের মিশ্রণ নিম্নলিখিত পদার্থসমূহ ওজনের অনুপাতে মিশাইয়া তৈরী করা হয় :

৪০ ভাগ চূর্ণ উৎকৃষ্ট চুনাপাথর বা শুক্তির খোলস
৪০ ভাগ বাষ্পে সিদ্ধ হাড় চূর্ণ
১৯ ভাগ আইওডাইজড (iodized) লবণ
১ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ সালফেট (manganese sulphate)

স্বাস্থ্য বজায়

স্বাস্থ্য খারাপ থাকিলে মুরগী হইতে কখনও সর্বোচ্চ উৎপাদন আশা করা যায় না। অসুস্থ মুরগী ব্যয়বহুল খাদ্য খাইয়া থাকে কিন্তু শ্লথ বৃদ্ধি এবং স্বল্প ডিম উৎপাদনের জন্য ইহাদের পালন লাভজনক হয় না। অপুষ্টি এবং বিভিন্ন রোগই দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণ। সুষম খাদ্য না খাওয়াইলেই মুরগী অপুষ্টিতে ভুগে। বিভিন্ন বহিঃস্থ পরজীবী মাইট (mite) উকুন, ও টিক (tick), অন্তঃস্থ পরজীবী (বিভিন্ন প্রকার কৃমি) ইত্যাদি কীট এবং ভাইরাস (virus), ছত্রাক (fungi) এবং প্রোটোজোয়া (protozoa) প্রভৃতির আক্রমণে মুরগী রুগ্ন হইয়া পড়ে। ইঁদুরও মুরগীর ক্ষতি করে। নিম্নে এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইতেছে।

অপুষ্টি

সুষম খাদ্য না খাওয়াইলে অপুষ্টিজনিত রোগের সৃষ্টি হয়। সুষম খাদ্য খাওয়াইলে এই রোগ এড়ানো যায়। অবশ্য খাদ্য সকল সময় পশুর নিকটে রাখিয়া দিতে হইবে। কিন্তু মুরগীর তৈরী সুষম খাদ্য এখনও আমাদের দেশে সুলভ নয়। নিকটস্থ মুরগী উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট হইতে খাদ্য মিশ্রণ তৈরীর সূত্র জানিয়া লইয়া স্থানীয় সুলভ উপাদানের সাহায্যে খাদ্য তৈরী করিয়া লওয়াই হইবে উপযুক্ত পন্থা।

অপুষ্টিজনিত রোগের ফলে বহু মুরগীপালক সাফল্য অর্জন করিতে পারেন না। আবার অনেকে মুরগীকে পেট ভরিয়া খাইতে দেন না। কোনরূপে জীবন ধারণ করিবার পক্ষে এই খাদ্য যথেষ্ট হইতে পারে, কিন্তু দেহের বৃদ্ধি বা ডিম উৎপাদন করিবার জন্য ঐ পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়। মুরগীকে কম খাওয়ানো কখনও লাভজনক হয় না।

বহিঃস্থ পরজীবী

আমাদের দেশে মুরগীর প্রধান পরজীবী কীট হইল উকুন, মাইট ও টিক। প্রাপ্তবয়স্ক মুরগী হইতে এই সকল পরজীবী শাবকে ছড়াইয়া পড়ে। যদি আক্রান্ত মুরগীর সাহায্যে ডিম ফুটানো ও শাবক পালন করা হয়, তবে অবশ্যই

এবং অতি সহজে শাবক আক্রান্ত হয়। আধুনিককালে কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটানো ও মুরগী পালন যে অনেকে পছন্দ করেন ইহা তাহার একটি কারণ। যদি উকুনে আক্রান্ত মুরগী দ্বারা একান্তই ডিম ফুটাইতে হয়, তবে এক সপ্তাহ অন্তর অন্তর ঔষধ প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়।

উকুন—সাধারণভাবে বলিতে গেলে মুরগীর দেহে সকল সময়েই উকুন দেখা যায়; কিন্তু আক্রমণ বেশী হইলে শাবকের গৃহেও উকুন দেখা যাইতে পারে। উকুন মুরগীর চামড়ায় বাসা বাঁধে, ফলে মুরগী অস্থির হইয়া পড়ে। আক্রমণ বেশী হইলে মুরগীর ওজন হ্রাস পায় এবং ডিম প্রসব একেবারেই বন্ধ করিয়া দিতে পারে। আক্রান্ত মুরগীর চিকিৎসায় ডি-ডি-টি, গ্যামেক্সেন এবং ম্যালাথিয়ন (malathion) প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। প্রস্তুতকারকদের নির্দেশ অনুসারে এই সকল ঔষধ ব্যবহার করা উচিত।

মাইট ও টিক (mites and ticks)—মাইট ও টিক-উভয়ের স্বভাব প্রায় একই প্রকার। এজন্য এ দুইটি একসঙ্গে আলোচিত হইতেছে। নানা শ্রেণীর মাইট দেখা যায় এবং উকুনের বিরুদ্ধে যে সকল ঔষধ ব্যবহার করিবার কথা বলা হইয়াছে ঐ সকল ঔষধই ব্যবহার করিতে হইবে। মাইট ও টিক রক্তপায়ী কীট এবং ইহাদের উপদ্রবে মুরগী উত্তেজিত হইয়া পড়ে। সাধারণ আক্রমণে শাবকের দেহের বৃদ্ধি রহিত হইয়া যায় এবং মুরগী ডিম প্রসব বন্ধ করিয়া দেয়। আক্রমণ বেশী হইলে এবং যথা সময়ে কীট দমনের কোন ব্যবস্থা না করিলে মুরগী মারা যাইতে পারে। মাইট ও টিক মুরগীর দেখা যাইতে পারে, তবে সাধারণত ইহারা দিনের বেলায় মুরগীকে ছাড়িয়া যায় এবং রাত্রি-বেলা পুনরায় আক্রমণ করে। মুরগীর গায়ে যখন থাকে না, তখন ইহারা গর্ত ও ফাটলের ভিতর লুকাইয়া থাকে। কাজেই মাইট ও টিক দমন উকুন দমন অপেক্ষা কঠিন, কারণ এক্ষেত্রে মুরগী এবং সমস্ত বাসগৃহ কীট মুক্ত করিতে হইবে।

অন্তঃস্থ পরজীবী

বহিঃস্থ পরজীবীর ন্যায় অন্তঃস্থ পরজীবীও আমাদের দেশের মুরগীকে প্রায়ই আক্রমণ করে। মুরগীর অন্তঃস্থ পরজীবী হইল বিভিন্ন শ্রেণীর কৃমি এবং ইহারা অন্ত্রে বাস করে। গেপওয়র্ম (gapeworm) নামক একপ্রকার কৃমি

শ্বাসনালীতে দেখা যায়। অধিকাংশ অন্তঃস্থ কৃমি প্রাপ্তবয়স্ক মুরগী অপেক্ষা শাবককেই বেশী আক্রমণ করে। অন্যান্য অন্তঃস্থ পরজীবীদের মধ্যে বৃহৎ গোল কৃমি (large round worm) সিকাল ওয়র্ম (cecal worm), ফিতা কৃমি (tape worm), গিজার্ড ওয়র্ম (gizard worm) ও সূত্র কৃমি (thread worm)এর নাম করা যায়।

বৃহৎ গোল কৃমি—মুরগীতে এই প্রকার কৃমিই বেশী দেখা যায়। প্রাপ্তবয়স্ক কৃমি মুরগীর অন্ত্রে ডিম প্রসব করে। এই ডিম মলের সহিত নির্গত হইয়া মেঝেতে সংক্রামিত হয়।

সিকাল ওয়র্ম—ইহারা সিকাতে (ceca) অবস্থান করে। ইহারা সংখ্যায় অনেক হইলেও মুরগীর বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে না।

উপরোক্ত উভয় প্রকার কৃমির চিকিৎসা একপ্রকার। এই কৃমি দমনে Pheuothiazine ও piperazine compound বিশেষ কার্যকরী। কিন্তু চিকিৎসা সত্ত্বেও মুরগীগুলিকে সরাইয়া মেঝে পরিষ্কার না করিলে মুরগী মেঝে হইতে ডিমগুলি খুঁটিয়া খাইবে এবং পুনরায় আক্রান্ত হইবে। প্রাপ্তবয়স্ক মুরগী হইতে এই কৃমি সহজেই পরবর্তী শাবকের দলকে আক্রমণ করিতে পারে।

ফিতা কৃমি—ফিতা কৃমি নানা প্রকার থাকিলেও তাহাদের আচরণ মোটামুটি একই প্রকার। ইহাদের অনেক মাধ্যমিক স্বাগতিক (intermediate host) আছে; যেমন মাছি, শামুক, বীট্‌ল (beetle) প্রভৃতি। মুরগীর মলে ফিতা কৃমির যে ডিম থাকে তাহা এই স্বাগতিকরা খায়। এই স্বাগতিকের দেহে কৃমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার পর মুরগী ঐ সকল কীট বা শামুক খাইলে মুরগী আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

ফিতা কৃমির দমনের জন্য সন্তোষজনক কোন ঔষধ নাই। ফিতা কৃমিকে আক্রমণ করিতে না দেওয়াই হইল উৎকৃষ্ট পন্থা। মুরগীর বাসস্থানের চারি পার্শ্বস্থ জায়গা কীটমুক্ত করিয়া এবং শাবককে প্রাপ্তবয়স্ক মুরগী হইতে পৃথক স্থানে পালন করিয়া এ প্রকার কৃমির আক্রমণ হইতে শাবককে রক্ষা করা যায়।

গিজার্ড ওয়র্ম ও ফিতা কৃমি—গিজার্ড ওয়র্ম ও ফিতা কৃমি সম্পর্কে এক সঙ্গে আলোচনা করা যাইতে পারে; কারণ অধিক সংখ্যায় উপস্থিত থাকিলে ইহারা মুরগীর যথেষ্ট ক্ষতি করিতে পারে। উভয় প্রকার কৃমিরই সাধারণত মাধ্যমিক স্বাগতিক থাকে। ইহাদের দমনের জন্য সন্তোষজনক কোন ঔষধ

নাই। শাবককে প্রাপ্তবয়স্ক মুরগীর সংস্পর্শে আসিতে না দেওয়াই হইল এই কৃমির আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার একমাত্র উপায়।

প্রোটোজোয়া জনিত রোগ (Protozoam diseases)

প্রোটোজোয়া নামক একপ্রকার এককোষী জীবাণু মুরগীর নানাপ্রকার রোগ সৃষ্টি করে। এই সকল রোগের মধ্যে কক্‌সিডিওসিস (Coccidiosis), ব্ল্যাক হেড (Black head) ও স্পিরোকিটোসিস (Spirochaetosis) প্রভৃতি প্রধান। এই সকল রোগে বহু মুরগী মারা যায়।

কক্‌সিডিওসিস—কক্‌সিডিওসিস আমাদের দেশে মুরগীর প্রধান রোগ-গুলির মধ্যে অন্যতম। রোগাক্রমণের তিনদিনের মধ্যে যথাযথ যত্ন ও ঔষধ প্রয়োগে মুরগীকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করা যায়। আক্রান্ত মুরগীর মলের সহিত কক্‌সিডিয়া (coccidia) বাহির হইয়া আসে। ২৪ হইতে ৪৮ ঘন্টা পরে অনুকূল অবস্থায় ইহারা অন্য মুরগীতে সংক্রামিত করিতে পারে এবং সংক্রামিত খাদ্য বা জল গ্রহণ করিলে ইহারা মুরগীর দেহে প্রবেশ করে।

প্রায় আট প্রকার কক্‌সিডিয়া মুরগীকে আক্রমণ করে। অন্যান্য প্রাণী বা পাখীকে যে সকল কক্‌সিডিয়া আক্রমণ করে, তাহারা মুরগীতে সংক্রামিত হয় না বা মুরগীর কক্‌সিডিয়া অন্য প্রাণীর ক্ষতি করিতে পারে না।

Sulfaguinoxaline, sulfamezathine ও nitrofurazone হইল কক্‌সিডিওসিস সারানোর উত্তম ঔষধ। প্রস্তুতকারকদের নির্দেশমত ঐ সকল ঔষধ ব্যবহার করা উচিত।

স্পিরোকিটোসিস—আমাদের দেশে মুরগীর স্পিরোকিটোসিস রোগ প্রায়ই দেখা যায়। মুরগীর পরজীবী কীট টিক (tick) এই রোগ রুগ্ন হইতে সুস্থ পাখীতে ছড়ায়। ইহারা রুগ্ন মুরগীর দেহের রক্ত শোষণ করিবার পর সুস্থ মুরগীর সংস্পর্শে আসিলে রোগ ছড়াইয়া পড়ে। সকল বয়সের মুরগীই আক্রান্ত হইতে পারে। টিক দমনার্থে মুরগীর বাসস্থানের চতুর্দিকে কীটনাশক ঔষধ ছড়ানোই এই রোগ দমনের উপায়। জ্বর, বিশৃঙ্খল পালক, আংশিক পক্ষাঘাত ও উদরাময় হইল এই রোগের লক্ষণ।

দেহের প্রতি পাউণ্ড ওজন প্রতি ৪০০ ইউনিট পেনিসিলিন ইনজেকশন বা আর্সেনিকাল ঔষধের ব্যবহার হইল এই রোগের চিকিৎসা। এই রোগ হইলে

একমাত্র পাসকরা পশুচিকিৎসককেই ডাকা উচিত। এই রোগের প্রতিষেধক টিকা সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের ইজতনগরের ভারতীয় পশুচিকিৎসা গবেষণা মন্দির কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ভাইরাসঘটিত রোগ (Virus diseases)

আমাদের দেশে মুরগীর ভাইরাসঘটিত যে সকল রোগ হয় সেগুলির মধ্যে রাণীক্ষেত (Ranikhet), এভিয়ান লিওকোসিস কমপ্লেক্স (Avian Leukosis Complex) ও মুরগী বসন্ত (Foul pox) এ তিনটি রোগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

রাণীক্ষেত রোগ—রাণীক্ষেত রোগের প্রধান লক্ষণগুলি হইল : একসঙ্গে বহু মুরগী আক্রান্ত হয়, সকল বয়সের মুরগী আক্রান্ত হয় (হাঁস ও রাজহাঁসে এই রোগ হয় না) এবং শ্বাসকষ্টের সঙ্গে স্নায়ু দৌর্বল্য দেখা দেয় এবং বহু মুরগী মারা যায়। কেবল এ রোগের টীকা দিলেই ইহা দমন করা সম্ভব হয়।

এভিয়ান লিওকোসিস কমপ্লেক্স—পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বৃহৎ মুরগী পালন কেন্দ্রে এই রোগ দেখা যায়। এই রোগ নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে এবং দেহের যে কোন অংশ আক্রান্ত হইতে পারে।

এই রোগের কোন চিকিৎসা বা টিকা নাই। এই রোগের লক্ষণযুক্ত মুরগীর ডিম হইতে শাবক উৎপাদন এবং লক্ষণযুক্ত পাখী হইতে পৃথকভাবে শাবকদের পালন করিলে এই রোগের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়।

মুরগী বসন্ত—আমাদের দেশে এ রোগ প্রায়ই দেখা যায়। ইহার আক্রমণে মাথায় মামড়ি পড়ে (formation of scale) অনেক সময় মুখে দূষিত ক্ষতের সৃষ্টি হয় ; ইহাতে শ্বাসনালী আংশিকভাবে বন্ধ হইয়া যাইবার ফলে মৃত্যু ঘটিতে পারে। এরোগে সকল বয়সের পাখী আক্রান্ত হইতে পারে। এ রোগের চিকিৎসা হইল ৬ হইতে ৮ সপ্তাহ বয়স্ক শাবককে টিকা দেওয়া। টিকা দেওয়ার পদ্ধতি পশুচিকিৎসকের নিকট হইতে শিখিয়া লওয়া যায়।

অন্যান্য রোগ ও ইঁদুর

পুলোরাম রোগ (pullorum disease), মুরগী টাইফয়েড (fowl typhoid), মুরগী কলেরা (fowl cholera) ও ক্ষয়রোগে (tuber-

culosis) আমাদের দেশে বহুসংখ্যক মুরগী মারা যায়, কিন্তু এই অধ্যায়ে আলোচনা করিবার মত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করা হইল না।

প্রজননঘটিত গোলযোগের ফলেও বহু মুরগী মারা যায়, কিন্তু ইহা দমন করিবার জন্য কার্যকরী কোন ঔষধ নাই।

আমাদের দেশে ইঁদুর মুরগীর নানাভাবে ক্ষতি করে। ইহারা মুরগীর খাদ্য খাইয়া ফেলে, শাবক মারিয়া ফেলে এবং কোন কোন রোগ ছড়াইতে সাহায্য করে। লোহার ফাঁদ ও ইঁদুর মারা বিষ ব্যবহার ও তাহাদের লুকাইবার স্থান ধ্বংস করিয়া ইঁদুর দমন করা যায়। পেট্রোল চালিত মটরের পোড়া গ্যাস ইঁদুরের গর্তে ঢুকাইয়া ইঁদুর মারা যাইতে পারে। ইঁদুর মারিতে আরও পরামর্শের জন্য আপনার নিকটস্থ সংস্থা উন্নয়ন আধিকারিকের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন।

বিপণন (Marketing)

আমাদের দেশে মুরগী ও ডিম বিক্রয় করা কোন সমস্যাই নয়। তবে অনেক সময় গ্রীষ্মকালে ডিমের চাহিদা হ্রাস পায়। কিন্তু দেশে ক্রমশঃ যখন মুরগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে ও বিজ্ঞানসম্মত ডিম পালন পদ্ধতি প্রচলিত হইবে তখন ন্যায়সঙ্গত দামে মুরগীর মাংস ও ডিম বিক্রয় করিতে যথেষ্ট প্রচেষ্টার প্রয়োজন হইবে।

অন্যান্য জিনিসের ন্যায় মুরগীর মাংস ও ডিমের বিক্রয় ও বিক্রয়মূল্যের ক্ষেত্রেও অর্থবিদ্যার সরবরাহ ও চাহিদার নিয়ম খাটে। বর্তমানে মুরগীর মাংস ও ডিমের উৎপাদন বড় বড় শহরের চাহিদা মিটাইতে পারে না। কিন্তু মুরগীর উৎপাদন বৃদ্ধি হইলে এমন এক সময় আসিবে যখন সরবরাহ চাহিদাকে ছাড়াইয়া যাইবে। তখন মুরগীর মাংস ও ডিম বিক্রয় করিবার জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টার প্রয়োজন হইবে।

যে সকল দেশে মুরগীর সংখ্যা বেশী, সে সকল দেশে বিপণন ব্যবস্থা সফল করিবার উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতি গঠিত হয়। নোংরা ডিম অপেক্ষা পরিষ্কার ডিম ও মাংস সুন্দর প্যাকেটে বাজারে উপস্থিত করিলে সহজেই বিক্রয় হইয়া যায়।

উৎকৃষ্ট ডিম (Quality eggs)

মনুষ্যদেহের রক্ত, মাংস পেশী ও হাড় গঠনে ডিম একটি অতি পুষ্টিকর খাদ্য। উচ্চ পুষ্টিকারিতা, নানাভাবে রান্না করিবার সুযোগ, সুগন্ধ ও সহজ প্রাপ্যতার জন্য ডিম অদ্বিতীয় মনুষ্য খাদ্য বলা যায়। ইহাকে অন্যভাবেও অনবদ্য বলা যায়, কারণ ডিমে ভেজাল চলে না বা রোগবীজাণু সংক্রামিত হইতে পারে না।

ডিম হইল স্বাভাবিক দেহরক্ষাকারী খাদ্য এবং প্রতিদিন ডিম খাওয়া উচিত। ডিমের প্রোটিন একটি সম্পূর্ণ প্রোটিন। দেহের কলা গঠন ও ক্ষয়পূরণে অপরিহার্য সকল অ্যামাইনো এসিড ডিম সরবরাহ করিতে পারে। ডিমে ভিটামিন এ, বি-কমপ্লেক্স ও ডি আছে। সুস্থ দেহ বজায় ও দেহ গঠনে অপরিহার্য আইরণ, ফসফোরস ও ক্যালশিয়ম প্রভৃতি খনিজ পদার্থও ডিমে পাওয়া যায়।

বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে হইলে ডিমের উৎকর্ষ বজায় রাখা দরকার। ক্রেতা টাটকা ডিম ও বাসি ডিমের পার্থক্য সহজেই বুঝিতে পারে। বাজারে না পাঠানো পর্যন্ত ডিমের উৎকর্ষ বজায় রাখিবার জন্য মুরগীপালক নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করিতে পারেন ;

১। ডিম প্রসব করিবার পর যতশীঘ্র সম্ভব বিক্রয় করা উচিত। কারণ টাটকা ডিমই সর্বোৎকৃষ্ট।

২। ডিমের উৎকর্ষ বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ডিম প্রসবের পর হইতে বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত পরিষ্কার, আর্দ্র ও ঠাণ্ডা জায়গায় ডিম রাখা বাঞ্ছনীয় ;

৩। ডিম আলোর সামনে ধরিয়া যেগুলি নিকৃষ্ট বলিয়া মনে হইবে, সে-গুলিকে বর্জন করা উচিত (চিত্র নং ৬৯ ও ৭০) ;

৪। বর্ণ ও আকার অনুসারে ডিম শ্রেণীবিভক্ত করিয়া ডিম বিক্রয় করা দরকার।

পরিষ্কার, ঠাণ্ডা ও আর্দ্র স্থানে রাখিলে ডিম একমাস বা ততোধিককাল উৎকৃষ্ট থাকে। গ্রামে মাটির পাত্র (চিত্র নং ৭১) পরিষ্কার বালিতে রাখিয়া পরিষ্কার জলদ্বারা ভিজানো কাপড় দিয়া মুখ আবৃত করিয়া ডিম রাখা যায়। কাপড় ও বালি আর্দ্র রাখিলে ডিমও ঠাণ্ডা, পরিষ্কার ও টাটকা থাকিবে।

অনেক বৃহৎ মুরগী পালন কেন্দ্রে কাঠের তাক ব্যবহার করা হয়। এই তাক ৪ ফুট উঁচু এবং দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৩ ফুট করা হয় এবং ইহাতে অনেকগুলি তাক থাকে। ইহার চারিদিক চট দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হয়। তাকের উপরে একটি বড় পাত্রে জল রাখিয়া চটের এক প্রান্ত তাহাতে ডুবাইয়া রাখিলে চট সকল সময় আর্দ্র থাকে এবং অল্প আয়াসে ডিম ঠাণ্ডা ও আর্দ্র রাখা যায়।
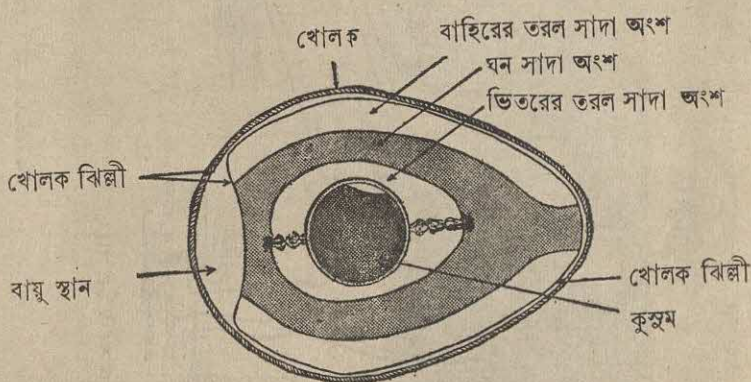
চিত্র নং ৬৯। টাটকা ডিমের দীর্ঘচ্ছেদ। ডিম অপেক্ষাকৃত পুরাতন হইলে ইহার কিছু জলীয় পদার্থ ক্ষয় হয় এবং ভিতরে বায়ুর জায়গার পরিমাণ বাড়িতে থাকে। এজন্যই পুরাতন ডিম জলে ভাসে। [NAIDU হইতে পুনরঙ্কিত]

টিনের পাত্রে বা কাঠের বাক্সে ডিমের দুই তৃতীয়াংশ আকারের একটি ফুটা করিয়া, তাহাতে একটি উজ্জল আলো রাখিয়া, ঐ ছিদ্রের উপর ডিম ধরিয়া ডিমের উৎকর্ষ নির্ণয় করা যায়। এই উপায়ে ডিমের অভ্যন্তরে রক্তের দাগ বা অন্যান্য ত্রুটি ধরা যায়। এ সকল নিকৃষ্ট ডিম স্বল্প দামে বিক্রয় করা যায়। উৎকৃষ্ট ডিমের সহিত একত্র মিশাইয়া বিক্রয় করিলে, উৎকৃষ্ট ডিমের ক্রেতা ঐ মুরগীর পালকের ডিম আর কোনদিন ক্রয় করিবে না। অবশ্য রক্তের দাগসহ ডিম ক্ষতিকারক নয়, কিন্তু শহরের শৌখিন ক্রেতা ঐ প্রকার ডিম পছন্দ করে না।

আকার ও বর্ণ অনুসারে শ্রেণীবিভক্ত করিলে ঐ ডিম ক্রেতা পছন্দ করে। টাটকা, একই আকারের উৎকৃষ্ট ডিম ক্রেতা বেশী দামে ক্রয় করিতে রাজী থাকে। খোলা বাজারে সকল ডিম মিশাইয়া কম দামে বিক্রয় অপেক্ষা ডিম শ্রেণীবিভক্ত করিয়া বিক্রয় করিলে, শ্রেণীবিভাগ করিতে সামান্য খরচ হইলেও মোট আয় বৃদ্ধি পায়।
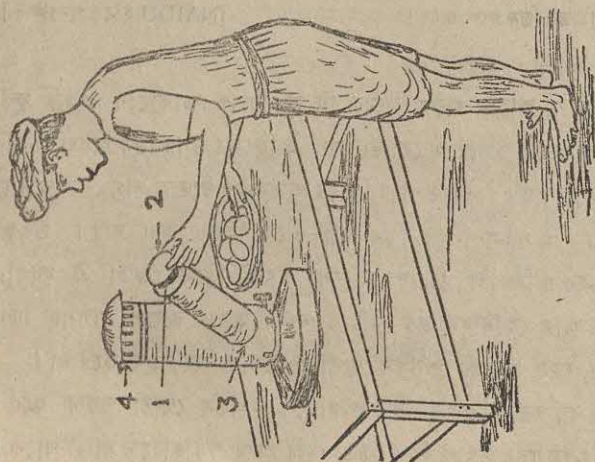
চিত্র নং ৭০। উজ্জ্বল আলোর নিকটে ধরিয়া এবং ডিমের ভিতর তাকাইয়া ডিম বাছাই করা যায়।

বামে : কেরোসিন তেল প্রজ্বলিত আলো।

ডাইনে : একটি বাক্সের ভিতর প্রজ্বলিত বৈদ্যুতিক আলো।
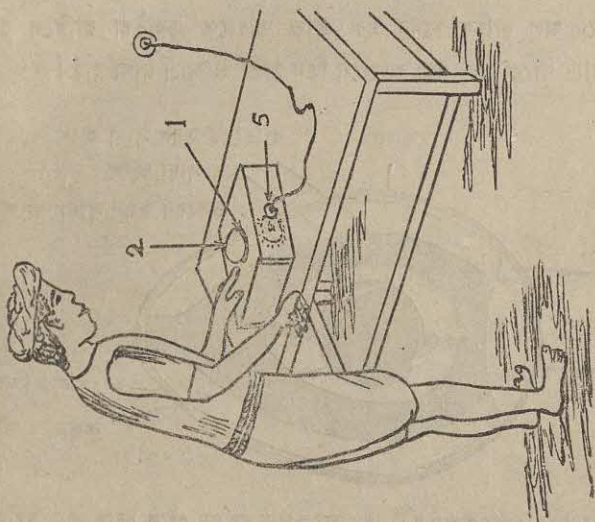
[N. MOOR মহাশয়ের সৌজন্যে]
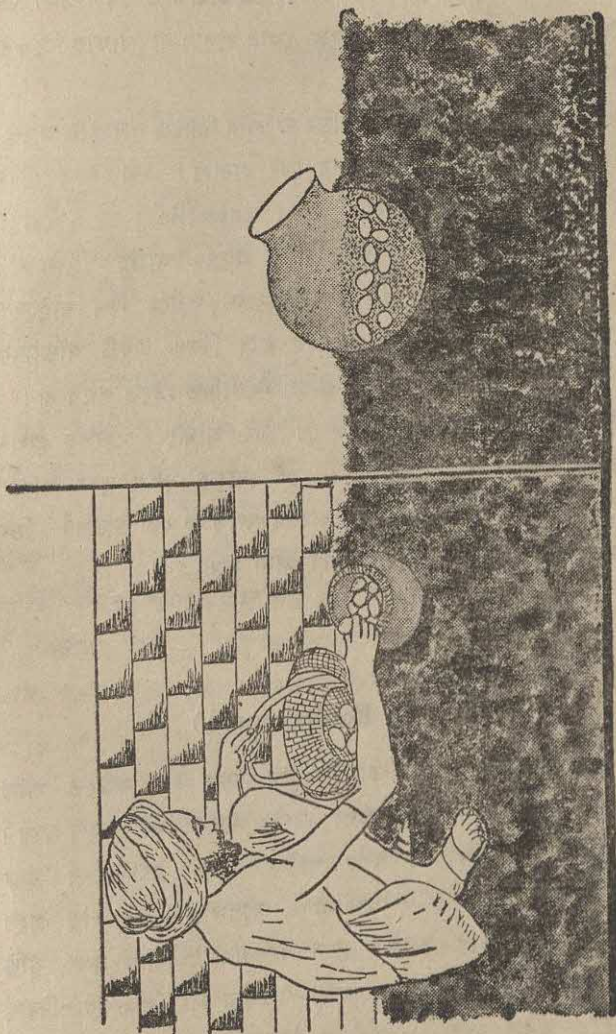
চিত্র নং ৭১। মাটির পাত্রে ভিজা বালির ভিতরে ডিম রাখিয়া এবং পাত্রটি ভিজা বালির ভিতর পুঁতিয়া ডিম যথাসম্ভব তাজা রাখিতেছেন।
বামে : কৃষক মাটির পাত্রে রাখিতেছেন। ডাইনে : ভিজা বালির ভিতরে পোঁতা ডিম দেখানো হইতেছে।
[NAIDU হইতে পুনরঙ্কিত]

শহরের বাজারের নিকটবর্তী স্থানে মুরগী পালনের সুবিধা এই যে, প্রতিদিন বা ক্রেতাদের অনুরোধমত খুচরা দরে মুরগীর মাংস বা ডিম বিক্রয় করা যায়। মুরগীপালন কেন্দ্র হইতে সরাসরি ক্রয় করিয়া ক্রেতারাও উৎকৃষ্ট তাজা ডিম পাইতে পারে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে কোন দালাল না থাকায় বিক্রেতা অধিক উপার্জন করিতে পারেন।

আমাদের অনেক নিরামিষাশী ব্যক্তির ডিম খাওয়ার বিরুদ্ধে কুসংস্কার আছে। ডিমে প্রাণের অস্তিত্ব আছে বলিয়াই তাঁহারা ডিম খান না। দল হইতে মোরগ সরাইয়া নিলে যে ডিম উৎপন্ন হইবে তাহা অনুর্বর (infertile)। দলে মোরগ না থাকিলে মুরগী যে ডিম প্রসব করে তাহাতে প্রাণের অস্তিত্ব থাকে না। নিরামিষাশী ব্যক্তিগণ যেমন দুধ পান করেন, সেরূপ অনুর্বর ডিম খাইতেও তাঁহাদের আপত্তি হওয়ার কথা নয়। দুধের ন্যায় ডিমও একটি স্বাভাবিক সম্পূর্ণ খাদ্য। ডিমে ভেজাল চলে না ব্যাকটিরিয়া সংক্রামিত হইতে পারে না।

পুষ্টিতত্ত্বের গবেষণায় লক্ষ্য করা গিয়াছে যে ডিম আমাদের দেশের প্রধান খাদ্য ভাতের একটি আদর্শ পরিপূরক খাদ্য। দুধ যেহেতু সকল সময় পাওয়া যায় না, সেহেতু ডিম আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। ডিম নানাভাবে রান্না করা যায়, ফলে খাদ্যে বৈচিত্র্য আনা সম্ভব হয়।

মুরগীর মাংস (**Poultry meal**)

মুরগীর মাংস উৎকৃষ্ট খাদ্য। ইহা প্রোটিনে সমৃদ্ধ এবং খাইতে অতি সুস্বাদু। অনেকে অন্যান্য মাংস অপেক্ষা মুরগীর মাংস বেশী পছন্দ করে। অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণী অপেক্ষা প্রতি পাউণ্ড মাংস উৎপাদনের জন্য মাংসের জন্য পালিত মুরগী (broiler) অপেক্ষাকৃত কম খাদ্য গ্রহণ করে। এজন্যই অনেক দেশে মুরগীর মাংস খাওয়ার পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমেরিকায় মাথাপিছু বাৎসরিক মুরগীর মাংস খাওয়ার পরিমাণ ৫ পাউণ্ড হইতে বর্ধিত হইয়া ৩০ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। অপেক্ষাকৃত কম খাদ্যে মাংস উৎপাদিত হওয়ায় ইহার মূল্যও অপেক্ষাকৃত কম, ফলে অধিক সংখ্যক ব্যক্তি এই মাংস খাইতে পারেন। আরও কম ব্যয়ে উৎপাদন ও যথাযথ বিপণনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে আগামী কয়েক বৎসরের

মধ্যেই আমাদের দেশে মুরগীর মাংস ও ডিম খাওয়ার পরিমাণ আরও বাড়িয়া যাইবে।

সংক্ষিপ্তসার

এদেশে গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে যে সুষম খাদ্য খাওয়াইলে শাবকের বৃদ্ধির হার প্রায় দ্বিগুণ হয়। মানুষের ব্যয়সাধ্য খাদ্য যেমন তণ্ডুল জাতীয় শস্য ছাড়াই, বর্জ্য পদার্থ ও খাদ্য উপজাত হইতে মুরগীর সুষম খাদ্য মিশ্রণ তৈয়ারী সম্ভব হইয়াছে। বৎসরের প্রত্যেক দিন পেট ভরিয়া মুরগীকে সুষম খাদ্য খাইতে না দিলে মুরগী পালনে লোকসান হইতে পারে।

শিকারী প্রাণীর হাতে মুরগীর শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ মারা যাইতে পারে। মুরগীকে আবদ্ধ রাখিয়া এবং সুষম খাদ্য খাওয়াইয়া এই ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। রাণীক্ষেত রোগহেতু প্রতি বৎসর বহু মুরগী মারা যায়, কিন্তু নিয়মিত টিকা দিলে এই রোগ দমন করা যায়। বিভিন্ন রোগ হেতু মুরগীর মৃত্যুহার কিভাবে হ্রাস করা যায়, সে সম্পর্কে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

অভিজ্ঞ মুরগী পালকগণ কখনও শাবককে প্রাপ্তবয়স্ক মুরগীর সহিত একত্র পালন করেন না। একত্র পালন করিলে প্রাপ্তবয়স্ক মুরগী হইতে নানাপ্রকার রোগ ও পরজীবী কীট শাবকে সংক্রামিত হয়। অপ্রয়োজনীয় মোরগ ও যে সকল মুরগী কম ডিম দেয়, তাহাদের বাছাই করিয়া বিক্রয় করিয়া দেওয়া উচিত। বৎসরের সকল সময়ে নানা বয়সের শাবক পালন অপেক্ষা একবার বা দুইবার প্রয়োজনীয় শাবক পালন করাই বাঞ্ছনীয়।

বর্তমানে দেশে মুরগীর মাংস ও ডিমের উৎপাদন চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত নয়, ফলে নির্দিষ্ট বিপণন সংস্থা এখনও গড়িয়া উঠে নাই। মুরগী পালন ব্যবসা আরও বৃদ্ধি পাইলে, মাংস ও ডিমের দাম এবং বিপণনের সুবিধা কি আছে তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। বর্তমানে শহরে মুরগীর মাংস ও ডিমের যে দাম পাওয়া যায়, তাহাতে ন্যায়সংগত লাভ হওয়া উচিত। আকর্ষণীয়রূপে কিরূপে মুরগীর মাংস ও ডিম ক্রেতাদের সম্মুখে উপস্থিত করা যায় সে সম্পর্কে চিন্তা করিতে হইবে।

একই আকারের তাজা, পরিষ্কার, আলোকের, সম্মুখে পরীক্ষিত, বড় ডিম এবং যথাযথভাবে ছাল ছাড়ানো এবং আকর্ষণীয় প্যাকেটে মাংসল পাখী নিয়মিত সরবরাহ করা হইলে, বড় বড় শহরের শৌখিন ক্রেতাগণ বেশী দাম দিতে রাজী।

প্রশ্ন

(১) মুরগী পালন করিতে কোন দ্রব্যে ব্যয় সর্বাপেক্ষা বেশী হয়?

(২) কোন কোন খাদ্য কি অনুপাতে মিশাইয়া তুমি একটি উত্তম মুরগীর খাদ্য মিশ্রণ তৈরী করিতে চাও তাহা লেখ।

(৩) মুরগীর খাদ্যে কোন কোন ভিটামিনের সাধারণত অভাব ঘটিতে পারে?

(৪) মুরগীর ভাইরাস ঘটিত দুইটি রোগের নাম কর এবং তাহাদের দমন করা সম্পর্কে যাহা জান লেখ।

(৫) ডিম প্রসবের পর হইতে বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত ডিমের উৎকর্ষ বজায় রাখিবার জন্য গ্রামের মুরগী পালককে কি করিতে হইবে?

সহায়ক পুস্তক

Benjamin, E. W., H. C. Pierce and W. D. Termohlen, *Marketing Poultry Products*, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1959

Biester, H. E., and L. H. Schwarte, '*Diseases of Poultry*' Iowa State University Press, Ames, Iowa, U.S.A., 1952

Bose, S., '*The Indian Poultry Gazette*', Poultry Research Division, Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar, U.P.

Dr. Salisbury's Laboratories, '*Poultry Health Chart*' Charles City, Iowa, U.S.A.

Ewing, W. R., '*Handbook of Poultry Nutrition*', W. R. Ewing, South Pasadena, California, U.S.A. 1947

Heuser, Gustave F., *Feeding Poultry*, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1955

Morrison, F. B., '*Feeds and Feeding*' abridged Edition, Morrison Publishing Co., Ithaca, New York, 1958

Randhawa, M. S., *Agriculture and Animal Husbandry in India*, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, 1958

Animal Diseases, *The Yearbook of Agriculture*, 1956, United States Department of Agriculture, Washington, D. C., 1957

পরিশিষ্ট

পরিবর্তন তালিকা*

দৈর্ঘ্য . দৈর্ঘ্যের একক

বৃটিশ একক	মেট্রিক একক	
১২ ইঞ্চি = ১ ফুট	১০ মিলিমিটার (মি.মি.)	= ১ সেণ্টিমিটার (সে.মি.)
৩ ফুট = ১ গজ	১০ সেণ্টিমিটার	= ১ ডেসিমিটার
২২০ গজ = ১ ফার্লং	১০ ডেসিমিটার	= ১ মিটার
৮ ফার্লং = ১ মাইল		(১ মি. = ১০০ সে.মি. = ১০০০ মি.মি.)
	১০ মিটার	= ১ ডেকামিটার
	১০ ডেকামিটার	= ১ হেক্টোমিটার
	১০ হেক্টোমিটার	= ১ কিলোমিটার (কি.মি.)
		(১ কি.মি. = ১০০০ মি.)

পরিবর্তন তালিকা

১ ইঞ্চি	=	২৫.৪ মিলিমিটার
১ ফুট	=	৩০.৪৮ সেণ্টিমিটার
১ গজ	=	০.৯১৪৪ মিটার
১ মাইল	=	১.৬০৯৩৪৪ কিলোমিটার
১ সেণ্টিমিটার	=	০.৩৯৩৭০১ ইঞ্চি
১ মিটার	=	১.০৯৩৬১ গজ
১ কিলোমিটার	=	০.৬২১৩৭ মাইল

*Indian Standard Conversion Tables for Ordinary Use, IS : 1020—June, 1957. Indian Standards Institution, 19, University Road, Civil Lines, New Delhi : এই পুস্তক হইতে গৃহীত।

আয়তন

আয়তনের একক

বৃটিশ একক		মেট্রিক একক	
১৪৪ বর্গ ইঞ্চি	=১ বর্গ ফুট	১০০ বর্গ মিলিমিটার (বর্গ মি.মি) =	১ বর্গ সেন্টিমিটার (বর্গ সে মি.)
৯ বর্গ ফুট	=১ বর্গ গজ	১০০ বর্গ সেন্টিমিটার	=১ বর্গ ডেসিমিটার
৪৮৪০ বর্গ গজ	=১ একর	১০০ বর্গ ডেসিমিটার	=১ বর্গ মিটার (১ বর্গ মি. = ১০০০০ বর্গ সে.মি.)
৬৪০ একর	=১ বর্গ মাইল	১০০ বর্গ মিটার	=১ এয়ার (are) বা ১ বর্গ ডেকামিটার
		১০০ এয়ার	=১ হেক্টেয়ার বা ১ বর্গ হেক্টোমিটার
		১০০ হেক্টেয়ার	=১ বর্গ কিলোমিটার

পরিবর্তন তালিকা

১ বর্গ ইঞ্চি	=৬.৪৫১৬ বর্গ সেন্টিমিটার (সঠিক)
১ বর্গ ফুট	=৯.২৯০৩ বর্গ ডেসিমিটার
১ বর্গ গজ	=০.৮৩৬১৩ বর্গ মিটার
১ একর	=০.৪০৪৬৮৬ হেক্টেয়ার
১ বর্গ মাইল	=২.৫৮৯৯ বর্গ কিলোমিটার
১ বর্গ সেন্টিমিটার	=০.১৫৫০০০ বর্গ ইঞ্চি
১ বর্গ মিটার	=১.১৯৫৯৯ বর্গ গজ
১ হেক্টেয়ার	=২.৪৭১০৫ একর
১ বর্গ কিলোমিটার	=০.৩৮৬১০১ বর্গ মাইল

ওজন

ওজনের একক

বৃটিশ একক		মেট্রিক একক	
১৬ ড্রাম	= ১ আউন্স	১০ মিলিগ্রাম (মি. গ্রা.)	= ১ সেন্টিগ্রাম
১৬ আউন্স	= ১ পাউণ্ড	১০ সেন্টিগ্রাম	= ১ ডেসিগ্রাম
২৮ পাউণ্ড	= ১ কোয়ার্টার	১০ ডেসিগ্রাম	= ১ গ্রাম
			(১ গ্রা = ১০০০ মি. গ্রা.)
৪ কোয়ার্টার	= ১ হন্দর	১০ গ্রাম	= ১ ডেকাগ্রাম
২০ হন্দর	= ১ টন	১০ ডেকাগ্রাম	= ১ হেক্টোগ্রাম
		১০ হেক্টোগ্রাম	= ১ কিলোগ্রাম
			(১ কেজি = ১০০০ গ্রা)
ভারতীয় একক			
৮০ তোলা	= ১ সের	১০ কিলোগ্রাম	= ১ মাইরিওগ্রাম
৪০ সের	= ১ মণ	১০ মাইরিওগ্রাম	= ১ কুইন্টাল
		১০ কুইন্টাল	= ১ মেট্রিক টন
			(১ মে. টন = ১০০০ কেজি)

পরিবর্তন তালিকা

১ গ্রাম	= ০·০৩৫২৭৪০ আউন্স	= ০·০৮৫৭৩৫ তোলা
১ কিলোগ্রাম	= ২·২০৪৬২ পাউণ্ড	= ১·০৭১৬৯ সের
১ মেট্রিক টন	= ০·৯৮৪২০ টন	= ২৬·৭৯২৩ মণ

১ আউন্স	= ২৮·৩৪৯৫ গ্রাম	১ তোলা	= ১১·৬৬৩৮ গ্রাম
১ পাউণ্ড	= ০·৪৫৩৫৯২৪ কিলোগ্রাম	১ সের	= ০·৯৩৩১০ কিলোগ্রাম
১ টন	= ১·০১৬০৫ মেট্রিক টন	১ মণ	= ০·৩৭৩২৪২ কুইন্টাল

৯ পাউণ্ড = ৩৫০ তোলা (সঠিক)

পরিমাণ	পরিমাণের একক		
বৃটিশ একক		মেট্রিক একক	
৪ জিল্ (gill)	— ১ পাঁইট	১০ মিলিলিটার (মি.লি)	— ১ সেন্টিলিটার
২ পাঁইট	— ১ কোয়র্ট (quart)	১০ সেন্টিলিটার	— ১ ডেসিলিটার
		১০ ডেসিলিটার	— ১ লিটার
৪ কোয়র্ট	— ১ গ্যালন (ইম্পিরিয়েল)		—১০০০ মি লি.
		১০ লিটার	— ১ ডেকালিটার
		১০ ডেকালিটার	— ১ হেক্টোলিটার
		১০ হেক্টোলিটার	— ১ কিলোলিটার

পরিবর্তন তালিকা

১ পাঁইট	— ০'৫৬৮২৪ লিটার
১ কোয়র্ট	— ১'১৩৬৪৯ লিটার
১ গ্যালন (ইম্পিরিয়েল)	— ৪'৫৪৫৯৬ লিটার
১ লিটার	— ১'৭৫৯৮০ পাঁইট
১ লিটার	— ৮'৮৭৯৯০ কোয়র্ট
১ লিটার	— ০'২১৯৯৭৬ গ্যালন (ইম্পিরিয়েল)

মন্তব্য—বৃটিশ ইম্পিরিয়েল গ্যালন ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে স্বীকৃত গ্যালনও ভারতে ব্যবহৃত হয়। গ্যালন (যুক্তরাষ্ট্র) হইতে লিটার ও ইম্পিরিয়েল গ্যালনের পরিবর্তন তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

১ গ্যালন (যুক্তরাষ্ট্র)	— ৩'৭৮৫৩৩ লিটার
	— ০'৮৩২৬৮ গ্যালন (ইম্পিরিয়েল)

থার্মোমিটারের মাপ

ফারেনহাইট ডিগ্রি হইতে সেন্টিগ্রেড ডিগ্রিতে পরিবর্তন*

ফারেনহাইট	সেন্টিগ্রেড
১	— ১৭·২
২	— ১৬·৭
৩	— ১৬·১
৪	— ১৫·৬
৫	— ১৫·০
৬	— ১৪·৪
৭	— ১৩·৯
৮	— ১৩·৩
৯	— ১২·৮
১০	— ১২·২
২০	— ৬·৭
৩০	— ১·১
৪০	+ ৪·৪
৫০	+ ১০·০
৬০	+ ১৫·৬
৭০	+ ২১·১
৮০	+ ২৬·৭
৯০	+ ৩২·২
১০০	+ ৩৭·৮
২০০	+ ৯৩·৩
৩০০	+১৪৮·৯
৪০০	+২০৪·৪
৫০০	+২৬০·০

* ফারেনহাইট ডিগ্রি হইতে সেন্টিগ্রেড ডিগ্রিতে পরিবর্তন করিতে হইলে ফারেনহাইট ডিগ্রি হইতে ৩২ বাদ দিয়া $\frac{৫}{৯}$ দিয়া গুণ করিতে হইবে। উদাহরণ, °C = $\frac{৫}{৯}$ (°F − ৩২)। যখন F = ৫০, F − ৩২ = ১৮, $\frac{৫}{৯}$ × ১৮ = ১০°C

সেন্টিগ্রেড ডিগ্রি হইতে ফারেনহাইট ডিগ্রিতে পরিবর্তন *

সেন্টিগ্রেড	ফারেনহাইট
০	৩২·০
১	৩৩·৮
২	৩৫·৬
৩	৩৭·৪
৪	৩৯·২
৫	৪১·০
৬	৪২·৮
৭	৪৪·৬
৮	৪৬·৪
৯	৪৮·২
১০	৫০·০
২০	৬৮·০
৩০	৮৬·০
৪০	১০৪·০
৫০	১২২·০
৬০	১৪০·০
৭০	১৫৮·০
৮০	১৭৬·০
৯০	১৯৪·০
১০০	২১২·০
২০০	৩৯২·০
৩০০	৫৭২·০
৪০০	৭৫২·০
৫০০	৯৩২·০

* সেন্টিগ্রেড ডিগ্রি হইতে ফারেনহাইট ডিগ্রিতে পরিবর্তন করিতে হইলে সেন্টিগ্রেড ডিগ্রিকে $\frac{৯}{৫}$ দিয়া গুণ করিয়া ৩২ যোগ দিতে হইবে। উদাহরণ, $°F = \frac{৯}{৫}°C + ৩২$। যখন $C = ৫০$, $\frac{৯}{৫} \times ৫০ = ৯০ + ৩২ = ১২২·০°F$

মুরগীর সুষম খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী *

মুরগীর সুষম খাদ্যে ২০ শতাংশ প্রোটিন, প্রায় ৫ শতাংশ তন্তু, ১ শতাংশ ক্যালসিয়াম ০·৬ শতাংশ ফসফোরস, প্রতি পাউণ্ড খাদ্যে ২,৪০০ সক্রিয় একক ভিটামিন এ, ৪০০ সক্রিয় একক ভিটামিন ডি$_{৩}$ এবং ১·৭ সক্রিয় একক ভিটামিন বি$_{২}$ থাকা উচিত। †

ভিটামিন এ, ডি$_{৩}$ ও বি$_{২}$ সাংশ্লেষিত ভিটামিন হিসাবে পাওয়া যায়। একদিন হইতে আট সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত শাবকের খাদ্যচূর্ণ বা পানীয় জলে coccidiostal, প্রস্তুতকারকের নির্দেশ মত মিশানো দরকার। সাম্প্রতিক কালে মুরগীর বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করিবার জন্য মুরগীর প্রতি টন খাদ্য চূর্ণে ৫ হইতে ১০ গ্রাম Penicillin, Aureomycin বা Terramycin প্রভৃতি বীজঘ্ন। (antibiotic) মিশাইয়া দেওয়া হয়। প্রতি টন খাদ্যে ২০০ হইতে ৪০০ গ্রাম বীজঘ্ন। ব্যবহার করিলে কোন কোন রোগের প্রচণ্ডতা হ্রাস পায়। রাণীক্ষেত রোগের বিরুদ্ধে টিকা দেওয়ার দুই দিন পূর্বে ও তিন দিন পরে বীজঘ্ন দিলে, টিকার প্রতিক্রিয়ার প্রচণ্ডতা হ্রাস পায়।

ভিটামিন-এ ও ডি$_{৩}$ সরবরাহ করিার জন্য হাঙ্গরের যকৃতের তৈল খাইতে দেওয়া যায়। দামে সস্তা বলিয়া হাঙ্গরের যকৃতের তৈলের পরিবর্তে সংশ্লেষিত ভিটামিন সুপারিশ করা যাইতে পারে।

৪০ ভাগ বাষ্পে সিদ্ধ হাড় চূর্ণ, ৪০ ভাগ চুনাপাথর (৯০ শতাংশ ক্যাল-শিয়ম কার্বোনেট তুল্যাঙ্ক) বা শুক্তির খোলস, ১৯ ভাগ লবণ ও ১ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ সালফেট মিশাইয়া উৎকৃষ্ট কিন্তু সস্তা খনিজ পদার্থের মিশ্রণ তৈরী করা যায়। ১০০ পাউণ্ড খাদ্য চূর্ণে, ৩ পাউণ্ড খনিজ পদার্থের ঐ মিশ্রণ মিশানো

---

* *Nutrient Reguirements of Poultry*, Publication Number 827 National Academy of Sciences, National Research Council, Washington, D. C., U. S. A., 1960. হইতে গৃহীত।

† দ্রষ্টব্য : (১) শাবকের বয়স আট সপ্তাহ না হওয়া পর্যন্ত খাদ্যে ২০ শতাংশ প্রোটিন সুপারিশ করা হয়, তাহার পরে প্রোটিনের পরিমাণ ১৬ শতাংশ করা যায়। অবশ্য যেহেতু প্রোটিন খাদ্য, যথা চীনাবাদামের খইল প্রভৃতির দাম তণ্ডুল জাতীয় শস্য অপেক্ষা কম সকল বয়সের মুরগীর জন্য প্রোটিনের পরিমাণ ২০ শতাংশ রাখা যাইতে পারে।

(২) অধিক ডিম দেয় এরূপ মুরগীর খাদ্যে ক্যালশিয়মের পরিমাণ ১ হইতে ২·২৫ শতাংশ করা উচিত। এজন্য মুরগীর পছন্দমত চুনাপাথর বা শুক্তির খোলস খাইতে দেওয়া যায়

উচিত। ইহা ছাড়া সকল সময়ে মুরগী যাহাতে ইচ্ছামত চুনাপাথর চূর্ণ বা শুক্তির খোলস খাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা রাখা উচিত।

মুরগীর খাদ্যে প্রোটিনের শতকরা হার পরিশিষ্টের ১নং তালিকা অনুসারে হিসাব করা যায়। যেমন ধরা যাক, নিম্নোক্ত ১০০ পাউণ্ড খাদ্যচূর্ণ মিশাইতে ২৩ পাউণ্ড ভুট্টা, ১৫ পাউণ্ড গম, ২৫ পাউণ্ড চাউল ছাঁটাই-এর উপজাত, ২৫ পাউণ্ড চীনাবাদামের খইল, ৫ পাউণ্ড পেনিসিলিন ছত্রাক দেহের উপজাত, ৪ পাউণ্ড মৎস্যচূর্ণ ও ৩ পাউণ্ড খনিজ পদার্থের মিশ্রণ আবশ্যক। খাদ্যচূর্ণে প্রোটিনের গড় শতকরা ভাগ হিসাব করিতে হইলে প্রত্যেক খাদ্য দ্রব্যের প্রোটিনের হারের সহিত যত পাউণ্ড খাদ্য দ্রব্য মিশাইতে লাগিবে তত সংখ্যা চার গুণ করিতে হইবে। যথা :

খাদ্যদ্রব্য	১০০ পাউণ্ড খাদ্যচূর্ণে ব্যবহৃত পরিমাণ (পাউণ্ড)	প্রোটিনের শতকরা হার	প্রোটিনের মোট পরিমাণ
ভুট্টা, হলদে	২৩	৮·৯	২·০৫
গম, ভাঙ্গা	১৫	১২·০	১·৮০
চাল ছাঁটাই-এর উপজাত	২৫	১১·০	২·৭৫
চীনাবাদামের খইল	২৫	৪৩·০	১০·৭৫
পেনিসিলিন ছত্রাক দেহের উপজাত	৫	২৩·০	১·১৫
মৎস্যচূর্ণ	৪	৪৫·০	১ ৮০
খনিজ পদার্থের মিশ্রণ	৩	—	—
মোট ওজন	১০০ পাউণ্ড		২০·৩০

১০০ পাউণ্ড এই খাদ্য মিশ্রণে ২০·৩০ পাউণ্ড প্রোটিন আছে অর্থাৎ প্রোটিনের শতকরা ভাগ ২০·৩০। যেহেতু ২০ ভাগ প্রোটিনই প্রয়োজন, সেহেতু এই খাদ্য মিশ্রণ সন্তোষজনক মনে করা যাইতে পারে।

এই খাদ্য মিশ্রণের তন্তুর ভাগও অনুরূপভাবে হিসাব করা যায়ঃ

খাদ্যদ্রব্য	১০০ পাউণ্ড খাদ্যচূর্ণে ব্যবহৃত পরিমাণ (পাউণ্ড)	তন্তুর শতকরা হার	তন্তুর মোট পরিমাণ
ভুট্টা, হলদে	২৩	২·৫	০·৫৮
গম, ভাঙ্গা	১৫	৫	০·৭৫*
চাল ছাঁটাই এর উপজাত	২৫	৬	১·৫০
চীনাবাদামের খইল	২৫	৬	১·৫০
পেনিসিলিন ছত্রাক দেহের উপজাত	৫	৫	০·২৫
মৎস্য চূর্ণ	৪	১	০·০৪
খনিজ পদার্থের মিশ্রণ	৩	—	—
মোট ওজন	১০০		৪·৬২

১০০ পাউণ্ড এই খাদ্য মিশ্রণে ৪·৬২ পাউণ্ড তন্তু আছে বা তন্তুর গড় শতকরা ভাগ ৪·৬২। যেহেতু ৫ বা ৬ শতাংশ তন্তু আবশ্যক সেহেতু এই খাদ্য মিশ্রণকে তন্তুর ভাগ বিবেচনা করিয়া সন্তোষজনক বলা যায়।

খাদ্য মিশ্রণে প্রয়োজনীয় ১ শতাংশ ক্যালশিয়ম হাড় চূর্ণ এবং খনিজ পদার্থের মিশ্রণ তৈরীতে ব্যবহৃত চুনাপাথর বা শুক্তির খোলস হইতে পাওয়া যায়ঃ প্রয়োজনীয় ০·৬ শতাংশ ফসফোরস হাড় চূর্ণ হইতে পাওয়া যায়; প্রতি পাউণ্ড খাদ্য চূর্ণ প্রয়োজনীয় ২,৪০০ সক্রিয় একক ভিটামিন-এ সবুজ খাদ্য, হলদে ভুট্টা, হাঙ্গরের যকৃতের তৈল বা সংশ্লেষিত ভিটামিন-এ হইতে পাওয়া যায়; প্রতি পাউণ্ড খাদ্য মিশ্রণে প্রয়োজনীয় ৪০০ সক্রিয় একক ভিটামিন ডি$_৩$ হাঙ্গরের যকৃতের তৈল বা সাংশ্লেষিত ভিটামিন হইতে পাওয়া যায়, এবং প্রতি পাউণ্ড খাদ্য মিশ্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ১·৭ সক্রিয় একক ভিটামিন বি$_২$ ভুট্টা, গম, চাউল, চীনাবাদমের খইল, মৎস্য চূর্ণ সংশ্লেষিত ভিটামিন হইতে পাওয়া যায়।

মুরগী যত খাইতে পারে তত পরিমাণ সবুজ খাদ্য খাইতে দেওয়া উচিত।

প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্যের শক্তি-উৎপাদন ক্ষমতাও পরিশিষ্টের ১নং তালিকায় প্রদত্ত হইল, কারণ অনেক সময় এই তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া মুরগীর খাদ্য মিশ্রণ তৈয়ারী করা হয়।

---

* ভাঙ্গা গমে ভাল গম অপেক্ষা তন্তুর পরিমাণ বেশী থাকে বলিয়া পরিশিষ্টের ১নং তালিকায় দেখানো ২·৭ শতাংশের স্থলে ৫ শতাংশের ভিত্তিতে এই হিসাব করা হইয়াছে।

১নং তালিকা

আমাদের দেশে মুরগীর খাদ্য মিশ্রণে ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্যের গঠন*

	প্রোটিন (অশোধিত) (%)	প্রতি পাউণ্ডে ক্যালরির(calorie) পরিমাণ	তন্তু (%)	ক্যালশিয়ম (%)	ফসফোরস (%)	ভিটামিন বি২ (প্রতি পাউণ্ডে মিলিগ্রাম)
প্রাণীজ চর্বি	০	২,৯০০	০	০	০	০
যব	১২·০	৭৯০	৬·০	০·০৬	০·৩৫	০·৬
রক্ত চূর্ণ	৮০·০	১,০০০	১·০	০·৩	০·২৩	১·১
হাড় চূর্ণ	৪ ০	১০০	১·৪	৩০·৭	১৪ ১	০·৫
ভাঁটিখানার শুষ্ক ঈষ্ট (yeast)	৪৬·০	৪৭০	৩·৮	০·১৩	·১৩	১৭·৫
ঝোলা গুড়	৩ ০	৭১৫	০	০ ৫	০·০৫	১·০
লেবুর কোমল অংশ (শুষ্ক)	৬·৬	৪২০	১৪·০	২·০	০ ১	১·০
নারিকেল চূর্ণ	২০·০	৬০০	১২·০	০·২১	০ ৬০	০ ৬
তুলাবীজ চূর্ণ	৪১·০	৬৫০	১২·০	০·১৮	১·১৪	২·৪
ভাঁটিখানার শুষ্ক মাতগুড়	১০·০	৬০০	১·১	২ ৮	০·৪	৪·০
মাছ চূর্ণ	৪৫·০	৮৫০	১·০	৬·০	৩·৮	২·৮
সবুজ খাদ্য	১৫·০	—	১০·০	—	—	—
চীনাবাদামের খইল	৪৩ ০	৮৫০	৬·০	০·১৭	০·৬৫	১·১

জোয়ার	১১·৬	১,১০০	৬·০	০·০২	০·৩	০·৪
চুনাপাথর বা শুক্তির খোলস	০	০	০	৩৮·০	০	০
যকৃতের বর্জ্য অংশ	৬০·০০	৯০০	২·০	০·৫	১·০	১২·০
লুসার্ণ (lucerne) পত্রচূর্ণ (শুষ্ক)	২০·০	৩১০	১৮·০	১·৭	০·৩	৮·৪
লুসার্ণ চূর্ণ (রৌদ্রে শুকানো)	১৫·০	২৪০	৩০·০	১·৩	০·২	৫·২
ভুট্টার আঠাঅংশের চূর্ণ (gluten meal) (হলদে)	৪২·০	৮৩০	৩·৯	০·১৩	০·৪	০ ৭
ভুট্টা (হলদে)	৮·৯	১,১৪০	২·৫	০·০১	০ ২৫	০·৫
মাংস চূর্ণ	৫৫·০	৭৬০	২·৫	৮·০	৪·০	২ ৪
পেনিসিলিন ছত্রাক দেহের বর্জ্য অংশ	২৩·০	৬০০	৫·০	—	—	—
চাউলের কুড়া	১২·০	৭০০	১৫·০	০·১	১·৩৫	১·০
চাউল ছাঁটাই উপজাত .	১১·০	৯৩০	৬·০	০·০৪	১·৪	০·৮
চাউলের খুদ	৭·৩	১,১৪০	০·৪	০·০১	০·১	০·২
তিলের খইল	৪১·০	৭০০	৬·০	২·০	১·২৯	১·৭
সয়াবীন (soyabean) খইল	৪৩·০	৬৪০	৬·০	০·২৯	০·৬	১·৯
গম	১২·০	১,০২০	২·৭	০·০৫	০·৪	০·৫
গমের ভূষি	১৬·০	৪৭৫	৯·৯	০·১২	১·২৫	১·৪

* দ্রষ্টব্য : (—) দ্বারা উপাদানের পরিমাণ জানা নাই বুঝানো হইয়াছে। (0) দ্বারা উপাদান অতি সামান্য মাত্রায় বা একেবারেই নাই বুঝানো হইয়াছে। তালিকায় লিখিত বিভিন্ন দ্রব্যে ভিটামিন ডি$_{৩}$ খুবই অল্প পরিমাণে থাকে। হাঙ্গরের যকৃতের তৈল বা সাংশ্লেষিক (synthetic) ভিটামিন ডি$_{৩}$ খাইতে দিয়া ইহার অভাব মিটানো যায়।

বিভিন্ন গৃহপালিত পাখীর ডিমে তা দেওয়ার সময়কাল

গৃহপালিত পাখী	ডিমে তা দেওয়ার কাল
ক্যানেরি (Canary)	১৩ দিন
হাঁস (সাধারণ)	২৮ দিন
হাঁস (রাশিয়ার)	৩৪ হইতে ৩৫ দিন
রাজহাঁস (বৃহৎ প্রজাপতি)	৩৪ হইতে ৩৫ দিন
রাজহাঁস (ক্ষুদ্র প্রজাতি)	২৮ দিন
গিনি-ফাউল (Guinea-foul)	২৮ দিন
মুরগী	২১ দিন
তোতা পাখি	১৯ হইতে ২৫ দিন
ময়ূর	২৮ হইতে ৩০ দিন
ফেজ্যাণ্ট (Pheasant)	২৪ দিন
পারাবত	১৭ দিন
কোয়েল (Quail)	২৩ দিন
মরাল (Swan)	৪২ দিন
টার্কি (Turkey)	২৮ দিন

২নং তালিকা

ভারতের গৃহপালিত পশু ও হাঁস-মুরগীর সংখ্যা*

গৃহপালিত পশু ও হাঁস-মুরগী	মোট সংখ্যা (হাজারে)		
	১৯৫৬	১৯৬১	১৯৫৬ হইতে ১৯৬১ সালে শতকরা বৃদ্ধি (+) বা (–) হ্রাস
গরু	১৫৮,৬৫১	১৭৫,৬৭২	+১০·৭
মহিষ	৪৪,৯১৬	৫১,১৩৭	+১৩·৯
ছাগল	৫৫,৪০৫	৬০,৮১৩	+৯·৯
ভেড়া	৩৯,২৪৬	৪০,২৬৩	+২·৬
ঘোড়া ও টাট্টু ঘোড়া	১,৪৮৩	১,৩৫১	–৮·৯
অন্যান্য গৃহপালিত পশু	৬,৮০৩	৭,২৯১	+৭·২
মোট গৃহপালিত পশু	৩০৬,৫০৪	৩৩৬,৫২৭	+৯·৮
হাঁস-মুরগী	৯৪,৬৮৩	১১৬,৯১৪	+২৩·৫

* *All India Abstract Statement of Ninth Census of Livestock, Poultry, and Tractors*, Ministry of Food and Agriculture, New Delhi, 1962.

গৃহপালিত প্রাণীজীবন সম্পর্কিত তথ্য

প্রাণী	দেহের স্বাভাবিক তাপাঙ্ক	প্রতি মিনিটে নাড়ী স্পন্দন	প্রতি মিনিটে শ্বাস	গর্ভধারণ কাল	প্রথম শাবক প্রসবকালে বয়স	উত্তপ্ত থাকিবার কাল length of heat period	মাই ছাড়াইবার বয়স	আয়ু
গরু	১০১-১০২° ফা.	৪০-৬০-৯০	১০-৩০	২৮৩ দিন	১৫-৩০ মাস	১৬-২০ ঘণ্টা	৪-১৬ সপ্তাহ	২৩ বৎসর
ঘোড়া	১০০·৪° ফা.	২৮-৪২	৮-১৬	৩৩৬ দিন	৩ বৎসর	৫-৭ দিন	১২-১৬ সপ্তাহ	২০-৩৫ বৎসর
মহিষ	৯৮·৮° ফা. (গ্রীষ্মকালে ১০৪° ফা. পর্যন্ত)	৪০-৪৫	১৬	৩১৫-৩৩২ দিন	২½-৩ বৎসর	৩-৫ দিন	৫ মাস	২৫ বৎসর
ভেড়া	১০৩° ফা.	৬৮-৯০	২০-৩০	১৫০ দিন	১৮ মাস	২ দিন	৮-১৬ সপ্তাহ	১২ বৎসর
ছাগল	১০৩° ফা.	৫৮-৯০	২০-৩০	১৫০ দিন	১৮ মাস	২-৩ দিন	৬-১০ সপ্তাহ	১৫-২০ বৎসর
শূকর	১০২·২° ফা.	৬০-৯০	১০-২০	১১২-১১৪ দিন	৯ মাস	২-৩ দিন	৬-৯ সপ্তাহ	২০ বৎসর
উট	ভোরবেলা শীতকালে ৯৪-৯৮° ফা. গ্রীষ্মকালে ৯৫-৯৯° ফা. সন্ধ্যাবেলা শীতকালে ৯৮-১০১° ফা. গ্রীষ্মকালে ৯৯-১০১·৬° ফা.	৩২-৪৪	৫-১২	৩৭০-৩৯২ দিন	৩ বৎসর	৩-১০ দিন	১৫ মাস	৪৫ বৎসর
কুকুর	১০১·৩° ফা.	৬২-১২০	১৪-৩০	৬৩ দিন	১-২ বৎসর	৩ সপ্তাহ	৪-৬-৮ সপ্তাহ	১৫ বৎসর
বিড়াল	১০১·৫° ফা.	১১০-১৩০	২০-৩০	৬৩ দিন	১ বৎসর	১-৩ সপ্তাহ	৪-৬-৮ সপ্তাহ	১৫-২০ বৎসর
মুরগী	১০৫° ফা.	—	—	—	৫-৭ মাসে ডিম পাড়ে	—	—	৩-৭ বৎসর

গ্রন্থকার সূচী

বিষয় সূচী

গ্রন্থকারগণ

অধ্যাপক এল. এস. এস. কুমার (জন্ম ১৯০৩) লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এস-সি ও এম. এস-সি পাস করেন এবং ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজি হইতে ডিপ্লোমা ও এ. আর. সি. এস. ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি পুণা কৃষি কলেজে উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক ও কলেজের অধ্যক্ষ, বোম্বাই সরকারের অর্থনৈতিক উদ্ভিদতত্ত্ববিদ, ভারত সরকারের মুখ্য কৃষিবিদ্যা বিশারদ, কেরালা সরকারের ডীন ও কৃষি অতিরিক্ত অধিকর্তা, খাদ্য ও কৃষি সংস্থার পক্ষে থাইল্যাণ্ড সরকারের তৃণভূমি উন্নয়ন সম্পর্কে উপদেষ্টা এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামে কৃষি ও শিল্প উন্নয়নে রাষ্ট্রসংঘের সহিত যুক্ত ছিলেন। রকফেলার ফাউণ্ডেশনের পক্ষে পরিদর্শক বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি আমেরিকায় ছিলেন। ভারতের বিজ্ঞান একাডেমী ও জাতীয় বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট-এর তিনি একজন সভ্য। তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সমৃদ্ধ প্রবন্ধের লেখক হিসাবে সুপরিচিত।

লেঃ কঃ এ. সি. আগরওয়ালা (জন্ম ১৯০০) মহাশয়কে পশুচিকিৎসা সম্পর্কে একজন পথিকৃৎ লেখক হিসাবে গণ্য করা হয়। তিনি ১৯২১ সালে লণ্ডনের পশুচিকিৎসা কলেজে যোগদান করেন। তিনি স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও পশুপালনে রৌপ্য পদক পান এবং রয়েল সোসাইটি অব মেডিসিনের সভ্য হন। দেশে ফিরিয়া লাহোর পশুচিকিৎসা কলেজে যোগদান করেন। তিনি বৃটিশ দুগ্ধ বিশারদ ডঃ এন. সি. রাইট মহাশয়ের সেক্রেটারী পরামর্শদাতা ; পাঞ্জাব পশুচিকিৎসা কলেজের প্যাথোলজি ও ব্যাকটিরিও-লজির অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ ; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মেজর, পাঞ্জাব সরকারের পশুচিকিৎসা অধিকর্তা ও মৎস্যচাষ বিভাগের ওয়ার্ডেন, বিকানীর পশু-চিকিৎসা কলেজের অধ্যক্ষ, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে পশুচিকিৎসার ডীন, রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের পশুচিকিৎসা ও ফার্মাকো-থেরাপিউটিক্স্ এর ডীন এবং ভারতে বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষক ছিলেন। তিনি হিসার পশুচিকিৎসা বিদ্যালয় গঠন করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি লেঃ ক.

হ'ন এবং ১৯৫৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বহু মূল্যবান পুস্তকের গ্রন্থকার।

ডঃ **এইচ. আর. আরাকেরি** (জন্ম ১৯১৯) বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম শ্রেণীতে বি. এস-সি (এগ্রি) (অনার্স) পাস করেন এবং আমেরিকার মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এস. ও পি. এইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ধারওয়ার কৃষি কলেজের এগ্রোনমির অধ্যাপক, পুণা কৃষি কলেজের অধ্যাপক, মহারাষ্ট্র সরকারের ইক্ষু বিশারদ ও মহীশূর সরকারের কৃষি উপ-অধিকর্তা ছিলেন। তিনি বর্তমানে শেষোক্ত সরকারের কৃষি যুগ্ম-অধিকর্তা। তিনি বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লেখক এবং মারাঠী ভাষায় মৃত্তিকা বিষয়ক পুস্তকের গ্রন্থকার।

এম. জি. কামাথ (জন্ম ১৯১৬) মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন এবং কুর্গের সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের কৃষি-বিষয়ে শিক্ষক ছিলেন। তিনি মাদ্রাজের নিলেশ্বর কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে কৃষি প্রদর্শক ও পরে ক্ষেত্রপাল এবং বোম্বাই ক্রনিকল পত্রিকার সহিত যুক্ত ছিলেন। পরে তিনি বোম্বাই সরকারের ষ্টেট প্রহিবিশন বোর্ডের প্রচারবিদ্যা, প্রচার অধিকারে সম্পাদক, ভারত সরকারের খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ে তথ্য উৎপাদন বিশারদ ছিলেন। বর্তমানে তিনি শেষোক্ত সংস্থায় কৃষি তথ্যের অধিকর্তা পদে অধিষ্ঠিত। তিনি পয়েন্ট-৪ প্রোগ্রামে আমেরিকায় কৃষি তথ্য সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান আহরণ করেন। তিনি ইণ্ডিয়ান ফার্মিং ও ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের আরও বহু পত্রিকার সম্পাদক রূপে কাজ করিয়াছেন।

বনবিহারী চক্রবর্তী (জন্ম ১৯৩৫) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এস-সি, (এগ্রি) (১৯৫৫) ডিগ্রি লাভ করেন এবং পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগে কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক পদে নিবুক্ত হন। পরে তিনি উক্ত বিভাগে সার উন্নয়ন আধিকারিক, সহ প্রচার আধিকারিক, গবেষণা সহকারী, মহকুমা কৃষি আধিকারিক পদে কাজ করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত বিভাগেই বর্ধমান জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক পদে নিযুক্ত আছেন। বাংলা ভাষায় কৃষি বিষয়ক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের তিনি গ্রন্থকার।

ডঃ আর্ল. এন. মুর (জন্ম ১৯০৪) ওহিও রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পশুপালন বিষয়ে বি. এস-সি ও পশুচিকিৎসায় ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৩৪ সালে আমেরিকার কৃষি বিভাগের রোগ গবেষণাগারের অধীনে পশু ও পাখীর রোগ নির্ণয় শাখা স্থাপন ও পরিচালনা করেন, পশ্চিম ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৩৭) পশু ও পাখীর রোগ সম্পর্কে গবেষণা করেন, ডেলাওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯৪৪-৪৬) সহিত যুক্ত ছিলেন, কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা শাস্ত্রে অ্যাসোসিয়েট অধ্যাপক (১৯৪৬-৫১)। এবং পোল্ট্রি বিজ্ঞানের প্যাথলজি শাখার চেয়ারম্যান ছিলেন, ওহিও কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে পোল্ট্রি শাখার চেয়ারম্যান ছিলেন এবং ১৯৫৬ সালে তিনি ন্যাশনাল টার্কি ফেডারেশন রিসার্চ পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫৬-৬২ সালে কানসাস রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়—ইউ. এস. এ. আই. ডি.'র ভারত দলের হাঁস মুরগী পালন বিষয়ে উপদেষ্টা ছিলেন। বর্তমানে তিনি নূতন দিল্লীতে ফোর্ড ফাউণ্ডেশানের পশু পালন সম্পর্কে পরামর্শদাতা। তিনি হাঁস মুরগীর রোগ সম্পর্কে বহু মূল্যবান গবেষণামূলক প্রবন্ধের লেখক।

ডঃ রয়, এল, ডোনাহু (জন্ম ১৯০৮) মিচিগান রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এম, ডিগ্রি এবং কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ, ডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি আমেরিকার বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন এবং ১৯৫৬-৬০ সালে কানসাস রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়-ইউ, এস, এ, আই, ডি'র এগ্রোনমির অধ্যাপক ছিলেন। বর্তমানে তিনি নূতন দিল্লীতে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের মাটি ও ও সার বিষয়ে পরামর্শদাতা। তিনি উচ্চ প্রশংসিত বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও পুস্তকের গ্রন্থকার। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'The Range and Pasture Book,' 'Exploring Agriculture,' 'Soils —An Introduction to Soils and Plant Growth,' and 'Our Soil and their Management.'

———
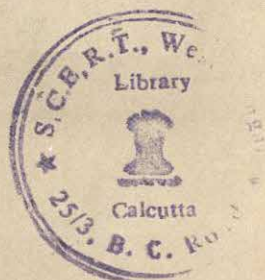
পঞ্চাশ পয়সা বাঁচান

এ-বইটি প'ড়ে যদি ভালো লেগে থাকে তাহ'লে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখে কার্ডটি আজই ডাকে ফেলে দিন (ডাকটিকিট লাগাবেননা যেন)। ফেরৎ ডাকেই আপনার কাছে একটি কুপন পাঠানো হবে। কুপনটি বইয়ের দোকানে দিলেই ৫০ পয়সা কম দামে যেকোনো একখানি বই কিনতে পারবেন।

আপনার নাম........................

ঠিকানা..........................

বয়স...........পেশা...............

এ-বইটি কেমন লেগেছে.........(ভালো)

..........(মন্দ নয়).......(খারাপ)

কোথা থেকে বইটি কিনেছেন

....

....

(বইয়ের দোকানের নাম আর ঠিকানা)